GOVERNMENT LIBRARY * Cooch Behar *

ARTHANITI AND ARTHAVYAVAHARA

OR

ELEMENTS OF POLITICAL ECONOMY

AND

Money-matters in Bengali

FOUNDED ON WHATELEY, MILL, FAWCETT AND OTHER STANDARD AUTHORITIES.

For the use of Normal and Vernacular schools Pathasalas and the General public.

BY

NRISINHA CHANDRA MUKHURJI, M.A.B.L,

Late offg. Professor Presidency Coll. Teacher Sanskrit Coll. and Member of the Board of Examiners Calcutta University. Pleader High Court.

Second Edition

CALCUTTA.

PRINTED AT THE NEW SCHOOL-BOOK PRESS.
1875.

অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার।

নর্ম্মাল, ও বাঙ্গালা স্কুল, পাঠশালা এবং

সাধারণের ব্যবহারার্থ

হাইকোর্টের উকীল

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

নিউস্কুলবুক প্রেসে মুদ্রিত।

সন ১২৮২ সাল।

GOVERNMENT LIBRARY

বিজ্ঞাপন

অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার প্রকাশিত হইল। ধন ও অর্থ কাহাকে কহে, ও কিরূপ নিয়মে ধনের উৎপত্তি, বিভূতি ও বিনিময় সাধিত হইয়া থাকে এই সমস্ত বিষয়ের বিচার করা অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। ধনোপার্জ্জন মনুষ্যজীবনের এক প্রধান উদ্দেশ্য। ধন ব্যতিরেকে, আমরা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিনা। সুতরাং কি রাজা কি প্রজা, কি জমিদার কি রাইয়ত, কি ভৃত্য কি ব্যবসায়ী, সংসারী ব্যক্তিমাত্রেরই এই শাস্ত্রের মূলসূত্র সকল বিশেষরূপে বিদিত হওয়া আবশ্যক। ফলতঃ অঙ্কশাস্ত্রে কিঞ্চিৎ অধিকার না থাকিলে যেরূপ সাংসারিক কার্য্যনির্ব্বাহ করা কঠিন হয়, সেইরূপ অর্থনীতিশাস্ত্রের নিয়ম সকল সম্যক্‌রূপে অবগত না হইলেও সংসার চালান বিলক্ষণ দুর্ঘট হইয়া উঠে সন্দেহ নাই। ইংলণ্ড প্রভৃতি তাবৎ ইউরোপীয় প্রদেশেই এই শাস্ত্রের বহুল প্রচার ও চর্চ্চা হইয়া থাকে। তথায় অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি বালকবালিকারা যেরূপ পাটীগণিত প্রভৃতি অত্যাবশ্যক বিষয় সকল পাঠ করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্থনীতির মূলসূত্র সকল ও তাহাদের অবশ্য পাঠ্য। কিছুদিন হইল আমাদের দেশে নর্ম্যাল বাঙ্গালা প্রভৃতি বিদ্যালয় সমূহেও ইহার পাঠনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সম্প্রতি বাঙ্গালা ও মাইনর ছাত্রবৃত্তির কোর্স মধ্যে অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাবে ইহার পাঠ ও পাঠনার বিলক্ষণ অসুবিধা হইয়া থাকে। আমি এই অসুবিধা নিবারণের উদ্দেশে হোয়েটলী, মিল, ফসেট, এ জাম স্মিথ, ও অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী ও ফরাসী গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ অবলম্বনপূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র পুস্তক-

খানি রচনা করিলাম। ইহা পুস্তকবিশেষের অনুবাদমাত্র নহে। উক্ত গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ পাঠ করিয়া অর্থনীতিশাস্ত্রের বিষয়ে আমার যেরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহাই বাঙ্গালা-ভাষায় প্রকটিত করিয়াছি। আমাদের দেশের পাঠার্থীদিগের পাঠোপযুক্ত করিবার নিমিত্ত ইহাকে সম্পূর্ণরূপে দেশীয় আকারে পরিণত করিতে হইয়াছে। এই জন্য সংস্কৃতভাষায় বার্ত্তাশাস্ত্রঘটিত যে সকল প্রবন্ধ আছে মধ্যে মধ্যে তৎসমুদয়ও পূর্তি করিতে হইয়াছে। ফলতঃ এই পুস্তকের সঙ্কলন-বিষয়ে আমি পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করি নাই। ইহার ভাষাও যতদূর সাধ্য সরল ও সাধারণের পাঠোপযোগী করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারিনা। এক্ষণে ইহাদ্বারা বাঙ্গালা বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রবৃন্দ ও সমাজের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার হইলেই আমার সমুদায় পরিশ্রম সফল হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই আমার পরমাত্মীয় কতিপয় মহাত্মা-দিগের নিকট আমি অর্থনীতিবিষয়ে বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াছি। পুস্তক পাঠোপযোগী হইবে কি না দেখিবার নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথম আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ গুরু কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ প্রগাঢ় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে দেখিতে দিয়াছিলাম। তিনি পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক ইহার আদ্যোপান্ত দেখিয়া আমাকে আশাতিরিক্ত উৎসাহ দেওয়াতেই আমি ইহা সাধারণের গোচর করিতে সাহসী হইয়াছি। এই জন্য আমি উঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এম, ডি, শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার সেন, সীল্‌স্ ফ্রী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ ঘোষ, সংস্কৃত কলেজের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব দে এম, এ, শ্রীযুক্ত বাবু

পূর্ণচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজকৃষ্ণ ঘোষাল, ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় ইঁহারাও পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে পাঠ করিয়া আমাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন। আমি ইঁহাদের নিকট ও ঋণী।

পুস্তকের আকার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হইলেও সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ইহার মূল্য আট আনা মাত্র নির্দ্ধারিত করিলাম। একণে অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার সাদরে পরিগৃহীত হয়, এই আমার প্রার্থনা।

১৫ই জানুয়ারি ১৮৭৪।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদর্শন, সোমপ্রকাশ, সহচর, এডুকেশন গেজেট, হিন্দুপেট্রিয়ট প্রভৃতি সর্ব্বপ্রধান পত্রগুলি ও সর্ব্বসাধারণ অর্থনীতির যেরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাতে উৎসাহিত হইয়া আমি ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিলাম। এবারে মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্ত্ত করিয়াছি। আর ভাষা অধিকতর পরিষ্কৃত করিবার জন্য ও সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছি। একণে ইহা দ্বারা পাঠার্থী দিগের উপকার দর্শিলেই আমার শ্রম সফল হইবে। ইতি।

বহুবাজার
২০শে জুলাই ১৮৭৫ } শ্রীনৃসিংহচন্দ্র শর্ম্মা।

সূচিপত্র।

No. 26.

অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উপক্রমণিকা—ধন ও অর্থ।

ধন আমাদের জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান সাধন। ধনোপার্জ্জন মনুষ্যজীবনের এক প্রধান উদ্দেশ্য। ধন ব্যতিরেকে জীবনযাত্রানির্ব্বাহের আবশ্যক সামগ্রী পাওয়া যায় না। আবশ্যক সামগ্রীর অভাবে মনুষ্য কখনই জীবন ধারণ করিতে পারে না। ফলতঃ জীবিকানির্ব্বাহের আবশ্যক প্রায় সমুদয় সামগ্রীই ধনের মধ্যে পরিগণিত। অতএব সুখে জীবনরক্ষা করিতে হইলে ধনের নিতান্ত আবশ্যকতা। সুতরাং কি কি নিয়ম অনুসারে ধনের উৎপত্তি, বিভক্তি বা বিভাগ, ও বিনিময় সাধিত হইয়া থাকে পণ্ডিতেরা তাহার নির্ণয় করিয়াছেন। যে শাস্ত্রে ঐ সকল নিয়মের বিচার ও ব্যবহার বিষয় লিখিত হয়, তাহার নাম ধনবিজ্ঞান বা অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার।

যে শাস্ত্রে ধনের উৎপত্তি, বিভক্তি, ও বিনিময় প্রভৃতি বিষয় বিবেচিত হয় তাহার নাম ধনবিজ্ঞান। কিন্তু ধন কাহাকে কহে? সচরাচর টাকা, পয়সা, কড়ি, এই সমুদয়কেই আমরা ধন বলিয়া থাকি। কিন্তু বস্তুতঃ কেবল ঐরূপ পদার্থই যে ধন, তাহা

নহে। যে সকল দ্রব্যের বিনিময়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে তৎসমুদয়ই ধন। চাউল, ধান, গম, কাপড়, সরিষা, প্রভৃতি তাবৎ প্রয়োজনীয় পদার্থই ধন, কারণ ইহাদিগের পরিবর্ত্তে অন্যান্য সকল প্রকার দ্রব্যই পাওয়া যায়। এরূপ অনেকানেক দ্রব্য আছে, যাহা আমাদের জীবনধারণের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু তাহাদের বিনিময়ে অন্য দ্রব্য পাওয়া যায় না; সুতরাং এরূপ দ্রব্যসমুদয়কে ধন বলা যাইতে পারে না। যেমন সূর্য্যের উত্তাপ, বহিস্থ বায়ু, ও নদীর জল। সূর্য্যের উত্তাপ, জল ও বায়ুর অভাবে আমরা কোনরূপেই জীবনধারণ করিতে পারি না যথার্থ বটে, কিন্তু উত্তাপ, বহিস্থ বায়ু, ও নদীর জল ইহাদের পরিবর্ত্তে সচরাচর অন্য কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায়না, সুতরাং ইহাদিগকে ধন বলা যাইতে পারে না। কিন্তু বড় বড় সহরে ভারীরা কলসী করিয়া জল বিক্রয় করিয়া থাকে, কোথাও বা জলের কল আছে, উহা দ্বারা সহরের সমুদয় অংশেই জল প্রেরিত হয়, এবং ঐ জলের পরিবর্ত্তে টেক্স অর্থাৎ কর লওয়া হইয়া থাকে, এরূপ স্থলে জলের বিনিময়ে অর্থ পাওয়া যাইতেছে। অতএব এখানে জলকে ধন বলিতে হইবেক। এইরূপ যদি কোন অবরুদ্ধ স্থানে বহির্বায়ুর সঞ্চার না থাকে, এবং কৌশলক্রমে তথায় উহা লইয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলে তথায় উহার পরিবর্ত্তে অর্থ পাওয়া যায়, সুতরাং তখন উহাকে ধন বলা যাইতে পারে। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, যে কোন দ্রব্যেরই স্বভাবসিদ্ধ এরূপ কোন গুণ নাই, যাহার প্রভাবে উহাকে ধন বলা যাইতে পারে। যে দ্রব্য যখন যে অবস্থায় অবস্থিত হইয়া আমাদের প্রয়োজনসাধন করে ও তখন উহার পরিবর্ত্তে অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া যায়, তখনই আমরা ঐ দ্রব্যকে ধন বলিয়া থাকি।

এক্ষণে রাণীগঞ্জের খনি হইতে প্রভূতপরিমাণে পাথরিয়া কয়লা উত্তোলিত হইয়া নানা স্থানে প্রেরিত হইতেছে, এবং উহার বিনিময়ে বিলক্ষণ অর্থপ্রাপ্তিও হইতেছে, সুতরাং এক্ষণে রাণীগঞ্জের পাথরিয়া কয়লা আমাদের প্রয়োজনে আসিয়া ধনরূপে পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু যৎকালে ঐ খনি আবিষ্কৃত হয় নাই, এবং পাথরিয়া কয়লা আমাদের কি কি প্রয়োজনে আইসে, আমরা তাহা জানিতাম না, তখন উহা ধনশ্রেণীভুক্ত ছিল না। আবার এরূপ হওয়াও অসম্ভব নহে যে, যে সকল পদার্থ বর্ত্তমান সময়ে আমাদের কোন প্রয়োজনে আসিতেছে না, তাহারাও ভবিষ্যতে অতিশয় প্রয়োজনীয় হইয়া ধনরূপে পরিগণিত হইতে পারিবে।

সচরাচর লোকে ধন ও অর্থ উভয়ই এক ও অভিন্ন পদার্থ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। যদি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা যায় যে অমুক ব্যক্তির কত ধন আছে, সে উত্তর করিবে যে, অমুকের প্রায় এক লক্ষ টাকা আছে। সকল প্রকার আয়, ব্যয়, লাভ, লোকসান প্রভৃতি অর্থাগম ও অর্থব্যয়ের তারতম্য অনুসারেই নির্ণীত হয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, যে এই সাধারণ সংস্কারটী অমূলক। অর্থের বিনিময়ে নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায় বলিয়াই অর্থের এত গৌরব। নতুবা যদি উহার বিনিময়ে কোন দ্রব্যই না পাওয়া যাইত, তাহা হইলে পথের ধূলা ও নদীর জলের ন্যায় তাম্র ও রৌপ্যখণ্ডের ও কোন মূল্য থাকিত না। ফলতঃ অর্থের স্বতঃসিদ্ধ কোন গুণ নাই। একথালি চাউল থাকিলে এক জন উহা সিদ্ধ করিয়া উদরপূরণ করিতে পারে, কিন্তু একটী টাকা থাকিলে কেবল উহাদ্বারাই উদরপূরণ হইতে পারে না। অর্থের যদি স্বতঃসিদ্ধ কোন গুণ নাই, তবে অর্থের এত প্রয়ো-

জন কেন ? কেনই বা লোকে অর্থের এত আদর করিয়া থাকে ? অর্থ কাহাকে বলা যাইতে পারে ? কোন্ পদার্থের কত মূল্য ইহা নিশ্চয় করিবার নিমিত্তই অর্থের ব্যবহার হইয়াছে, অর্থই দ্রব্যসমুদায়ের মূল্যনির্ণয় করিবার একমাত্র উপায়। যদি এক বস্তা চাউলের মূল্য এক টাকা বলিয়া পূর্ব্বে জানা থাকে, তাহা হইলে অন্য যে কোন দ্রব্যের মূল্য জানা যায়, তাহার সঙ্গে ঐ এক বস্তা চাউলের মূল্যের লাঘব গৌরব বিবেচনা করা যাইতে পারে, এবং এই প্রকারেই কোন্ দ্রব্যের কত মূল্য তাহা অতি সহজে নির্ণীত হইতে পারে। দ্রব্যের মূল্যনির্দ্ধারণ করাই যে অর্থব্যবহারের একমাত্র প্রয়োজন, এরূপ নহে, অর্থের ইহা অপেক্ষাও গুরুতর প্রয়োজন আছে। অর্থই বিনিময়ের সর্ব্বসাধারণ মধ্যবর্ত্তী। ফলতঃ যে দ্রব্যকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া এক প্রকার সামগ্রীর সহিত অন্যপ্রকার সামগ্রীর বিনিময় অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হইতে পারে তাহাকেই অর্থ কহে। মনে কর এক ব্যক্তির এক বস্তা চাউল আছে, সে ঐ চাউলের কিয়দংশ দিয়া এক সের তৈল লইল, এস্থলে চাউল ও তৈল এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী কিছুই নাই, সুতরাং এই উভয়ের এক টীও অর্থ নহে। কিন্তু যদি ঐ চাউলের পরিবর্ত্তে একটী টাকা লইয়া, আবার ঐ টাকাটীর পরিবর্ত্তে তৈল লওয়া যায়, তাহা হইলে টাকাকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া চাউলের সহিত তৈলের বিনিময় সম্পাদিত হইল, অতএব টাকাকে অর্থ বলা যায়।

অর্থ অতিশয় প্রয়োজনীয় পদার্থ। অর্থের ব্যবহার আছে বলিয়া যখন যে সামগ্রীর প্রয়োজন হয় অর্থ দ্বারা আমরা তৎক্ষণাৎ তাহা পাইতে পারি। যাহার এক বস্তা ধান আছে, সে প্রয়োজন হইলেই উহার কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া টাকা বা পয়সা পাইতে পারে, এবং ঐ টাকা বা পয়সাদ্বারা যাহা

ইচ্ছা হয় ক্রয় করিতে পারে। কিন্তু যদি অর্থের ব্যবহার প্রচলিত না থাকিত, তাহা হইলে আবশ্যক সামগ্রীর অভাবমোচন করিতে আমাদিগকে অনেক ক্লেশ ও অসুবিধা সহ্য করিতে হইত। মনে কর এক ব্যক্তির শীতবস্ত্রের প্রয়োজন হইল, সে নিজে চাষ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, এক্ষণে তাহাকে অনুসন্ধান করিতে হইবে, যে তৎকালে কোন বস্ত্রনির্ম্মাতার ধান বা কলায়ের প্রয়োজন হইয়াছে। যদি কাহারও প্রয়োজন হইয়া থাকে দেখিতে পায়, তবেই তাহাকে ধান বা কলায় দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে শীতের কাপড় লইতে পারে। কিন্তু যদি তৎকালে বস্ত্রনির্ম্মাতার ধান লইবার প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে ঐ হতভাগ্য কৃষকের আর শীতবস্ত্র পাওয়া হয় না। আবার এরূপ হইতে পারে, যে ঐ তন্তুবায়ের তখন ধান্যের প্রয়োজন না হইয়া কাপড় রাখিবার নিমিত্ত একটী সিন্দুকের প্রয়োজন হইয়াছে। সিন্দুক পাইলে সে শীতবস্ত্র দিতে পারে। কিন্তু কৃষকের সিন্দুক নাই। অগত্যা তাহাকে আবার অনুসন্ধান করিতে হইবে কোন সূত্রধরের ধান্যের প্রয়োজন হইয়াছে কি না? অনুসন্ধান করিয়া যদি দেখিতে পায় যে কোন সূত্রধরের ধান্যের প্রয়োজন হইয়াছে তাহা হইলেই তাহাকে ধান্য দিয়া ঐ ধান্যের বদলে সিন্দুক লইয়া, ঐ সিন্দুকের পরিবর্ত্তে আবার তন্তুবায়ের নিকট হইতে শীতবস্ত্র পাইতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যদি সূত্রধরের তৎকালে ধান্যের প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে ঐ দুর্ভাগ্য কৃষককে বিষম বিপদে পড়িতে হয়। হয় ত তাহাকে শীতনিবারণের নিমিত্ত স্বয়ং বস্ত্রবয়ন শিক্ষা করিতে হয়। ফলতঃ এরূপ অবস্থা হইলে মানুষ কখনই সুখে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয় না। সৃষ্টির প্রারম্ভে সকল সমাজেরই এইরূপ অবস্থা ছিল। ক্রমে

পশুচারণ, কৃষিকার্য্য, ব্যবসায়শিক্ষা প্রভৃতি প্রচলিত হয়। কালক্রমে বাণিজ্যের উন্নতির সহিত সমাজের ও উন্নতি হইতে আরম্ভ হয়। বাণিজ্যে সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু এরূপ অবস্থায় বাণিজ্য কি রূপে চলিতে পারে? অর্থের ব্যবহার প্রচলিত হওয়াতে এই সকল অসুবিধার নিবারণ হইয়াছে। অর্থের পরিবর্ত্তে সকল সামগ্রীই ইচ্ছামত পাওয়া যায়। অর্থ পাইলে তন্তুবায় বস্ত্র দিতে সম্মত হয়, ও সূত্রধর সিন্দুক দিতে সম্মত হয়। অর্থের পরিবর্ত্তে সকলপ্রকার ব্যবসায়ীরাই আপন আপন পরিশ্রমের দ্রব্য দিতে সম্মত হয়। তাহারা বুঝিতে পারে, যে অর্থ পাইলে তাহারা যখন যে দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে সহজেই ক্রয় করিতে পারিবে। যদি কোন দূরদেশে ধান, চাউল, গম প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য পাঠাইবার আবশ্যকতা হয়, তাহা হইলে উহা সাধন করিবার নিমিত্ত অনেক আয়াস ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়। হয়ত যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম স্বীকার করিয়াও অবশেষে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। কিন্তু অর্থের ব্যবহার প্রচলিত আছে বলিয়া ঐ কার্য্য অনায়াসেই সাধিত হইতে পারে। অভিপ্রেত স্থানে অর্থ পাঠাইলেই তথায় প্রয়োজনানুসারে সকল প্রকার দ্রব্যই ক্রয় করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ফলতঃ অর্থের ব্যবহার প্রচলিত না হইলে সমাজের যে কত দুরবস্থা হইত, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তাহা হইলে কোন সমাজই সভ্যতার সোপানে অধিরূঢ় না হইয়া চিরকাল আদিম কালের জঘন্য অসভ্যতাতেই কালযাপন করিত সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ধনোৎপত্তি।

ধনোৎপত্তির সাধন।—ভূমি

ধনমাত্রেরই উৎপাদনের নিমিত্ত মনুষ্যের পরিশ্রম আবশ্যক। পরিশ্রম ব্যতিরেকে কোন প্রকার সামগ্রীই উৎপন্ন হইতে পারে না। পৃথিবীতে এরূপ অনেক পদার্থ আছে, যাহা পাইলেই আমরা তৎক্ষণাৎ ব্যবহার করিতে পারি। আমরা পর্ব্বতের গুহায়, বা বৃক্ষকোটরে বাস করিতে পারি, বনজাত ফল, মূল, মধু প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারি, বৃক্ষের বল্কল আমাদের পরিধেয় হইতে পারে যথার্থ বটে, কিন্তু এই সকল দ্রব্য আহরণ করিতেও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। ভূগর্ভে পাথরিয়া কয়লা প্রস্তুত হইয়া আমাদের ব্যবহারার্থ নিহিত রহিয়াছে যথার্থ, কিন্তু উহা ভূগর্ভ হইতে উত্তোলন করিতে হইলে যথেষ্ট পরিশ্রমের আবশ্যকতা হয়। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, পরিশ্রমব্যতিরেকে কোন প্রকার আবশ্যক দ্রব্যই পাওয়া যাইতে পারে না। ফলতঃ পরিশ্রম না করিলে কেবল মনুষ্য কেন, জীবমাত্রই কখন প্রাণ ধারণ করিতে পারে না। অতএব পরিশ্রম জীবন ধারণের ও ধনোপার্জ্জনের এক প্রধান সাধন, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু কি অবলম্বন করিয়া পরিশ্রম করিতে হইবে? পরিশ্রম করিতে হইলে কোন পদার্থ তাহার বিষয়স্বরূপ হওয়া আবশ্যক। প্রকৃতিই আমাদের পরিশ্রমের

বিষয়। প্রকৃতির অনেক পদার্থ এরূপ আছে যে আমরা তৎসমুদয় পরিশ্রমপূর্ব্বক আহরণ করিয়াই ব্যবহার করিয়া থাকি। অথবা প্রকৃতির নানাবিধ পদার্থ একত্রিত করিয়া পরিশ্রমদ্বারা আমাদের আবশ্যকমত দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া লই। অতএব প্রাকৃতিক পদার্থ সকলই আমাদের পরি-শ্রমের আধার। এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ধনোৎ-পত্তির দুইটী প্রধান সাধন, পরিশ্রম ও তাহার বিষয়স্বরূপ প্রাকৃতিক পদার্থ। কিন্তু পরিশ্রম ও প্রাকৃতিক পদার্থ ভিন্ন অপর একটী ঐ উভয়ের ন্যায় সমান আবশ্যক সাধন আছে। সামান্যতঃ বিবেচনা করিলে বোধ হইবে বটে, যে প্রকৃতির পদার্থ সমুদায় লইয়া পরিশ্রম করিলে সকল প্রকার সামগ্রীই উৎপন্ন হইতে পারে, ইহার নিমিত্ত অপর কোন উপায়ের আবশ্যকতা নাই। কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে পরিশ্রমের আর একটী অত্যাবশ্যক সাধন আছে, যাহা না থাকিলে কোন রূপেই পরিশ্রম করা যাইতে পারে না, অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরিশ্রম করিবে তাহার আহার আবশ্যক। আহার ব্যতিরেকে উক্ত ব্যক্তি কি রূপে জীবন ধারণ করিতে পারিবে? পরিশ্রম করা ত দূরের কথা। এক্ষণে বুঝা গেল যে ধনোৎপাদনের অপর একটী সাধন শ্রমিকের আহার। কিন্তু উহা সংগ্রহ করিতেও শ্রমের প্রয়োজন। পূর্ব্বে যে পরিশ্রম করা হইয়াছে, ঐ পরি-শ্রমের ফলে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহার কিয়দংশ ব্যয় না করিয়া রাখিয়া দিতে হয়, কারণ উহাই আহার করিয়া বর্ত্তমান সময়ে শ্রম করা যাইতে পারে। এই রূপে ভবি-ষ্যতে শ্রমিকদিগের জীবনধারণের উপায়স্বরূপ যে ধন সঞ্চিত

রাখিতে হয়, উহাই ধনোৎপত্তির তৃতীয় সাধন। উহা ব্যতীত কখনই ধন উৎপন্ন হইতে পারে না। এই সঞ্চিত ধনকে মূলধন কহে। এই মূলধন আমাদের সঞ্চয়ের ফলস্বরূপ। এই রূপ সঞ্চিত মূলধনের অভাবে কোন কার্য্যই সহজে সম্পন্ন হইয়া উঠে না। মনে কর কৃষক চাষ করিতেছে, সে কিছু দিন দিন আপন চাষের ফলভোগ করিতে করিতে চাষ করিতে পারে না, যত দিন শস্য না পাকে ততদিন তাহাকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। চাষের নিমিত্ত যে লাঙ্গল প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে তাহারও আহার আবশ্যক, সে ও শস্য পাকিয়া উঠা পর্য্যন্ত আপন পরিশ্রমের বেতন লইবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে পারে না। কৃষিকার্য্যের ন্যায় অন্যান্য সকল কার্য্যেই ধনোৎপাদন করিতে হইলে বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ উভয়বিধ পরিশ্রমের সাহায্যার্থ কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করিয়া রাখা উচিত। এই সঞ্চিত ধনের নাম মূলধন। অতএব ধনোৎপত্তির প্রতি যেরূপ পরিশ্রম ও ভূমি এই দুইটী কারণ, সেইরূপ মূলধন ও একটী কারণ ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইল।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে প্রাকৃতিক পদার্থ, ধনোৎপাদনের অন্যতম কারণ, কিন্তু সমুদয় প্রাকৃতিক পদার্থই ভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পাথরিয়া কয়লা, ও শস্যাদি সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভূমি হইতে উৎপন্ন, সুতরাং এই সকল স্থলে ভূমি সাক্ষাৎসম্বন্ধে ধনোৎপাদনের কারণ, কোথাও কোথাও বা ভূমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ না হইয়া পরম্পরাসম্বন্ধে ধনোৎপাদনের কারণ হইয়া থাকে। আমরা গোদুগ্ধ পান করিয়া থাকি। মেষ ছাগ প্রভৃতির লোমে আমরা শাল বনাত প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকি,

এই মেষ ছাগ প্রভৃতি জন্তুগণ ভূমিজাত উদ্ভিজ্জাদি আহার করিয়া প্রাণধারণ করিয়া থাকে, সুতরাং এরূপ স্থলে ভূমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হইয়া পরম্পরাসম্বন্ধে ধনোৎপাদনের কারণ হইতেছে, এই হেতুক প্রাকৃতিক পদার্থকে ধনোৎপাদনের কারণ না ধরিয়া ভূমিকেই কারণ স্বরূপে গ্রহণ করা হইল। অতএব ধনোৎপত্তির প্রতি তিনটী কারণ, প্রথম ভূমি, দ্বিতীয় পরিশ্রম, ও তৃতীয় মূলধন।

ভূমি, শ্রম, ও মূলধন এই তিনটী ধনোৎপাদনের কারণ। এই কয়টী আবার পরস্পরসাপেক্ষ, ইহাদের একটীর অভাবে অপর দুইটীর দ্বারা ধনোৎপত্তি হইতে পারে না। তিনটীর সমবায় না হইলে কখনই ধনোৎপাদন হইতে পারে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ধনোৎপত্তি—পরিশ্রম।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে নির্ণীত হইয়াছে যে, পরিশ্রম ধনোৎপাদনের একটী প্রধান সাধন। বিনাপরিশ্রমে ধনের উৎপত্তি হইতে পারে না। এক্ষণে পরিশ্রমদ্বারা কিরূপে ধনোৎপাদন হয় তাহার নির্ণয় করা যাইতেছে। প্রাকৃতিক পদার্থ অবলম্বন করিয়া পরিশ্রম করিলে ঐ প্রাকৃতিক পদার্থ সকল আমাদের ব্যবহারের উপযোগী হয়। ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে প্রাকৃতিক পদার্থ সকলকে ব্যবহারোপযোগিতা প্রদান করাই, পরিশ্রমের কার্য্য। প্রকৃতির ভাণ্ডার অক্ষয়। ইহা হইতে আমাদের যখন যাহা আবশ্যক হয়, আমরা তাহাই পাইতে পারি। অনেক প্রাকৃতিক দ্রব্য আপনা হইতেই ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে যথার্থ, কিন্তু প্রায় অধিকাংশ

দ্রব্যই পরিশ্রম দ্বারা ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইতে হয়। প্রকৃতি আমাদিগের পরিশ্রমপ্রয়োগের বিষয়স্বরূপ অশেষ পদার্থ অনবরত যোগাইতেছেন. আমরা পরিশ্রম দ্বারা ঐ সকল পদার্থ আমাদের আবশ্যক দ্রব্যে পরিণত করিতেছি। বস্তুতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই প্রতিপন্ন হইবে, যে প্রকৃতি আমাদিগকে যে পরিশ্রমপ্রয়োগ করিবার পদার্থ যোগাইয়াই ক্ষান্ত হয়েন এরূপ নহে। আমরা প্রকৃতির নিকট ইহা অপেক্ষাও অধিকতর উপকার প্রাপ্ত হই। প্রাকৃতিক পদার্থের উপর পরিশ্রম প্রয়োগ করিয়া আমরা কি করিয়া থাকি, আমরা ঐ সকল পদার্থকে এরূপ অবস্থায় অবস্থিত করি যে, উহারা পরস্পর নিজ নিজ আন্তরিক শক্তি প্রকাশ করিয়া স্বয়ং কার্য্য করিতে থাকে। কৃষক ভূমিতে চাষ দিয়া বীজ বপন করে। ঐ বীজ জলে ভিজিয়া মৃত্তিকার সংযোগে অঙ্কুরিত হয় এবং পরিশেষে বৃক্ষস্বরূপে পরিণত হইয়া আমাদিগকে ফলপুষ্প প্রদান করিতে থাকে। আমরা কাষ্ঠে অগ্নি প্রদান করিয়া জ্বালাইয়া দিই, তাহার পর প্রকৃতির শক্তিপ্রভাবে ঐ অগ্নি আপনিই জ্বলিতে থাকে। ফলতঃ ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, যে প্রকৃতি আমাদিগের পরিশ্রমের ফলোৎপাদনবিষয়ে অসীম সাহায্য করিয়া থাকেন।

পরিশ্রম দুই প্রকার, কায়িক ও মানসিক। কোন দ্রব্য উৎপন্ন করিতে হইলে এই উভয় প্রকার পরিশ্রমেরই প্রয়োজন। কোন কার্য্যে অধিক কায়িক পরিশ্রমের আবশ্যকতা, আবার কোন কোন কার্য্যে অধিক মানসিক শ্রমের প্রয়োজন। ফলতঃ কায়িক ও মানসিক শ্রম একত্র সম্বদ্ধ না হইলে কোন কার্য্যই সাধিত হইতে পারে না।

কোন একটী বিশেষ পদার্থ আমাদের ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে বহুবিধ পরিশ্রমের প্রয়োজন হইয়া থাকে। সমবেত পরিশ্রম ব্যতিরেকে অধিকাংশ পদার্থই ব্যবহারোপযোগী হইতে পারে না। দেখ, আমাদের দেশ হইতে বালাম চাউল উৎপন্ন হইয়া দেশ বিদেশে নীত হইয়া বিক্রীত হইতেছে। মনে কর, এখান হইতে বালাম চাউল বিলাতে রপ্তানী হইতেছে। বিলাতের লোকেরা উহা ব্যবহার করিতেছে। এখন ভাবিয়া দেখ, ঐ চাউল বিলাতের লোকের ব্যবহারোপযোগী করিতে কত ও কত প্রকার পরিশ্রমের আবশ্যকতা হইতেছে। প্রথমে ঐ চাউলের বীজবপন করিতে কৃষকের পরিশ্রম লাগিয়াছে। তাহার পর কৃষক ঐ ভূমির উপর মই, বিদা প্রভৃতি দিয়া কতই পাট করিয়াছে। তাহার পর ধান পাকিয়া উঠিলে উহা কাটিয়াছে, আছাড় মারিয়া ও ঝাড়িয়া বিচালী হইতে ধান বাহির করিয়া লইয়াছে। তাহার পর ধানের মহাজনেরা ঐ ধান খরিদ করিয়া লইয়াছে। কত লোক উহা সিদ্ধ করিয়াছে। কত লোক উহা ঢেঁকিতে পাড় দিয়া চাউল প্রস্তুত করিয়াছে। তাহার পর আবার অপর মহাজনেরা উহা খরিদ করিয়া মজুর দ্বারা কিস্তি বোঝাই করিয়া কলিকাতায় আনাইয়াছে। হাউসওয়ালা অর্থাৎ ইয়ুরোপীয় ব্যবসায়ীরা আবার ঐ মহাজনদিগের নিকট উহা খরিদ করিয়া জাহাজ বোঝাই করিয়া বিলাতে পাঠাইয়াছে। তাহার পর বিলাতে পৌঁছিলে আবার কত লোক উহার নিমিত্ত পরিশ্রম প্রয়োগ করিয়াছে, তবে উহা বিলাতে ব্যবহারোপযোগী হইয়াছে। আবার মনে কর, ঐ ধান যে ভূমিতে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে লাঙ্গলদ্বারা চাষ দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং যে কর্ম্মকার ঐ

লাঙ্গল নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহার পরিশ্রম ও ধরিতে হইল। আবার এই লাঙ্গল গড়িতে কামারের যে যে যন্ত্রের প্রয়োজন হইয়াছে, সেই সেই যন্ত্র যাহারা নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাদের পরিশ্রম ও ধরা পড়িল। সুতরাং এইরূপে কোন বিশেষ দ্রব্য আমাদের ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে যে, কত লোকের কত প্রকার পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, তাহার হিসাব রাখা যায় না। এইরূপ হিসাব করিতে করিতে সৃষ্টির আদিম কাল পর্য্যন্ত যাইলেও বিশেষরূপে কিছুরই নিশ্চয় হইয়া উঠে না। এক্ষণে, উপরে যাহা কথিত হইল তদ্দ্বারা এই সিদ্ধান্ত হইতেছে, যে পরিশ্রম দুই প্রকারে প্রযুক্ত হইতে পারে। ১ম। সাক্ষাৎসম্বন্ধে, ২ য়। পরম্পরাসম্বন্ধে। সাক্ষাৎসম্বন্ধে যে পরিশ্রম প্রযুক্ত হয় তাহা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি। যেমন ফসল উৎপাদনকার্য্যে কৃষকের যে পরিশ্রম লাগে উহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রযুক্ত। যে লাঙ্গল গড়িয়াছে, কি যে লাঙ্গল গড়িবার উপযোগী যন্ত্র গড়িয়াছে, তাহাদিগের পরিশ্রম ধান্যোৎপাদনকার্য্যে পরম্পরাসম্বন্ধে প্রযুক্ত।

পরম্পরাসম্বন্ধে প্রযুক্ত পরিশ্রম সমুদায় পাঁচপ্রকার হইতে পারে। অতএব পণ্ডিতেরা ঐরূপ পরিশ্রমকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

১ ম। ভাবী পরিশ্রমের উপকরণসামগ্রী উৎপাদনের পরিশ্রম। ভূগর্ভে সুবর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু বিমিশ্রভাবে নিহিত আছে। ঐ বিমিশ্র ধাতু ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত হইলে উহার উপর পরিশ্রম করিয়া নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদিত হয়। এস্থলে যাহাদের পরিশ্রমে ঐ বিমিশ্র ধাতু ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত হইয়া অন্য লোকের পরিশ্রমের উপকরণস্বরূপ হয়, তাহাদের পরিশ্রম উপরিউক্ত প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত।

২য়। প্রাকৃতিক পদার্থসমুদয় আমাদের পরিশ্রমের উপকরণ। প্রাকৃতিক উপকরণগুলিকে ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে পরিশ্রম অপেক্ষা করে। কিন্তু অনেক স্থলে কেবল আমাদের হাতের পরিশ্রমে অভিপ্রেত কার্য্য সিদ্ধ হয় না। অনেক যন্ত্রতন্ত্রের সাহায্য অপেক্ষা করে. ঐ যন্ত্রতন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে যে শ্রমের আবশ্যকতা হয়, উহাই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। কাঠ কাটিতে হইলে কুঠারের প্রয়োজন। কাঠ হইতে কোন গড়ন করিতে হইলে করাত, বাটালী প্রভৃতি নানাবিধ যন্ত্রের আবশ্যকতা। সুতরাং, এই প্রকারে আমাদের কার্য্যোপযোগী যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে যে পরিশ্রম লাগে উহাকেই দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিশ্রম বলা যাইতে পারে।

৩য়। কার্য্যোপযোগী পরিশ্রম যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তাহার উপায়বিধান করিতে যে পরিশ্রম লাগে তাহাই তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত। প্রয়োজনোপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কারখানা-ঘর নির্ম্মাণ করিতে হয়, নতুবা আমাদিগের পরিশ্রমের ফল ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে। প্রস্তুত দ্রব্য যাহাতে চোরে না লইতে পারে, তজ্জন্য প্রহরী রাখিতে হয়, সৈন্য বা পুলিসের কর্ম্মচারীরা শান্তিরক্ষা করিয়া থাকে। এই সমস্ত পরিশ্রম ব্যতিরেকে আমরা কখনই পরিশ্রমের ফলভোগ করিতে সমর্থ হইতে পারি না। এই প্রকার পরিশ্রম সকলই তৃতীয়শ্রেণীর পরিশ্রম।

৪র্থ। মনে কর কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু যেস্থলে প্রস্তুত হইল সেইখানেই কিছু উহা ব্যবহৃত হইতে পারেনা। যাহাদের ব্যবহারার্থ উহা প্রস্তুত হইল, তাহারা স্থানান্তরে বাস করে। কাজেকাজেই ঐ প্রস্তুত সামগ্রী স্থান-

ন্তরে লইয়া যাইয়া যাহাদিগের প্রয়োজন তাহাদিগকে দিতে হয়। এই স্থানান্তরকরণরূপ কার্য্য সাধন করিতে যে পরিশ্রমের প্রয়োজন, তাহাকেই চতুর্থ শ্রেণীর পরিশ্রম বলিয়া গণনা করিতে হইবে। নৌকায় বা কলের গাড়িতে মালের আমদানী হয়,মুটিয়ারা মাল বহন করিয়া অভিপ্রেত স্থানে লইয়া যায়,অতএব এই প্রকার সকল পরিশ্রমই চতুর্থশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত।

৫ ম। প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করিতে মানুষের পরিশ্রমের আবশ্যকতা, ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু মানুষ কিছু একবারে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিতে পারে না। তাহাদিগকে ব্যাপক কাল খাইয়া পরিয়া ক্রমে কার্য্যোপযোগী হইতে হয়। শৈশবাবস্থায় বালকদিগের রক্ষার্থ, কত যত্ন, কত পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাদিগের পীড়া হইলে চিকিৎসা করিতে হয়, পরে তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হয়। এত করিয়া ক্রমে তাহারা কার্য্যক্ষম হইয়া উঠে। কার্য্যক্ষম হইয়া উঠিলেও মানুষের পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। তাহাদের ঘোরতর পীড়া হইতে পারে, পীড়া হইলে চিকিৎসা করিতে হয়। অধিক কি, মানুষকে কার্য্যক্ষম রাখিতে সমাজের বহুবিধ পরিশ্রম লাগিয়া থাকে। ঐ সমস্ত পরিশ্রম পঞ্চম শ্রেণীর মধ্যে ধর্ত্তব্য। চিকিৎসক শিক্ষক প্রভৃতির পরিশ্রম এই শ্রেনির অন্তর্নিবিষ্ট।

বিনা পরিশ্রমে ধন উৎপন্ন হইতে পারে না যথার্থ বটে, কিন্তু সকলপ্রকার পরিশ্রমই যে ধনের উৎপাদক ইহা কখনই বলা যাইতে পারেনা। এরূপ অনেক পরিশ্রম আছে যাহা সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় কোন প্রকারে ধনোৎপাদনের উপযোগী নহে।

অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে পরিশ্রম দুই প্রকার, উৎপাদক ও অনুৎপাদক। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে প্রাকৃতিক পদার্থসমুদায়কে ব্যবহারোপযোগিতা প্রদান করাই পরিশ্রমের কার্য্য। পরিশ্রম সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধে পদার্থ সকলকে ব্যবহারোপযোগিতা প্রদান করিয়া থাকে। আমরা যে সমুদয় পদার্থ ধন বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি তৎসমুদয়ই প্রাকৃতিক জড় পদার্থ। * মনুষ্য এই সকল প্রাকৃতিক পদার্থ স্বয়ং সৃজন করিতে অক্ষম, প্রকৃতিই তৎসমুদয় আমাদিগকে পরিশ্রমের উপকরণস্বরূপ প্রদান করিতেছেন। আমরা তৎসমুদয় একত্রিত করিয়া নূতন নূতন সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতেছি। মনুষ্যের পরিশ্রম ব্যতিরেকে প্রকৃতি স্বয়ং কখনই তত্তাবৎ সামগ্রী প্রস্তুত করিতে পারিতেন না। ইহা দ্বারা এই স্থির হইতেছে, যে, যে পরিশ্রম প্রাকৃতিক জড় পদার্থ সমুদায়কে সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধে স্থায়ী ও সারবিশিষ্ট ব্যবহারোপযোগিতা প্রদান করে, তাহাকেই উৎপাদক পরিশ্রম বলে, অর্থাৎ সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধে ধনের উৎপাদক শ্রমই উৎপাদক শ্রম। যে শ্রম সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধে ধনের উৎপাদক নহে তাহাই অনুৎপাদক শ্রম। কৃষক, শিল্পকর প্রভৃতির পরিশ্রম সাক্ষাৎসম্বন্ধে ধনের উৎপাদক। শিক্ষক, দালাল, হাউসওয়ালা প্রভৃতির শ্রম পরম্পরাসম্বন্ধে ধনের উৎপাদক, কারণ ইহাদের পরিশ্রমের সাহায্য ব্যতিরেকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রযুক্ত পরিশ্রম কখনই ফলোৎপাদন করিতে পারেনা। কিন্তু এস্থলে ইহাও

* শিল্পকরদিগের কৌশল ও নৈপুণ্যকে ও অর্থশাস্ত্রবেত্তারা ধন বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু কৌশল ও নৈপুণ্য জড় পদার্থ নহে। তবে কৌশল ব্যতিরেকে ঐ জড় পদার্থ সকল কখনই ধনরূপে পরিণত হইতে পারে না, ঐ জন্যই উহাদিগকে, ধন মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে।

বুঝিতে হইবে, যে এই সকল ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ পরিশ্রমের বেতনস্বরূপ, যাহা উপার্জ্জন করে তাহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে উৎপন্ন। বৃথা নিষ্ফল কার্য্যে প্রযুক্ত পরিশ্রমই অনুৎপাদক পরিশ্রম। নৃত্য গীত বাদ্যাদিতে যে পরিশ্রম করা যায় তাহা যদিও আনন্দজনক, কিন্তু ধনোৎপাদক নহে, অতএব তৎসমুদয় অনুৎপাদক ধনমধ্যে পরিগণিত। এই সকল শ্রম যে একবারে নিষিদ্ধ এরূপ বলা কাহারও উদ্দেশ্য নহে, প্রত্যুত এরূপ শ্রমের ও ব্যবহার আছে। কিন্তু এরূপ শ্রম দ্বারা ধনোৎপাদনবিষয়ে কোন সাহায্যই হয় না, অতএব এরূপ শ্রম অনুৎপাদক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

আবার এরূপ হওয়াও অসম্ভব নহে, যে উৎপাদক শ্রম হইতেও অনেক সময় ধনের উৎপত্তি হয় না। সেই সেই স্থলে ঐ পরিশ্রম অনুৎপাদক হইয়া পড়ে বলিতে হইবে। কলিকাতার দক্ষিণে মাতলানামক যে সহর আছে, ঐ সহরটী মাতলানামক নদীর তীরে অবস্থিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাণিজ্যকার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত কলিকাতার বন্দর ঐ মাতলাসহরে উঠাইয়া লইয়া যাইবার প্রস্তাব হইয়াছিল, ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ও হইয়া যায়। যদি উহা কার্য্যে পরিণত হইত, তাহা হইলে উহা হইতে প্রভূত অর্থের উৎপত্তি হইত সন্দেহ নাই, সুতরাং ঐ কার্য্যে প্রযুক্ত পরিশ্রম সমুদায়ই উৎপাদক পরিশ্রম বলিতে হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মাতলা সহর কোম্পানির উদ্যোগ নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ঐ কোম্পানির যাবতীয় উৎপাদক পরিশ্রম এক্ষণে অনুৎপাদক হইয়া পড়িয়াছে। উহাদ্বারা ধনোৎপাদন পক্ষে কিছুমাত্র সুবিধা হইল না।

যেরূপ পরিশ্রম উৎপাদক ও অনুৎপাদক, সেইরূপ উৎপন্ন

ধনের ব্যয় ও উৎপাদক ও অনুৎপাদক। যাহারা কখনই সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধে ধনোৎপাদনের সাহায্য করে না, এবম্বিধ লোকের অন্নবস্ত্র প্রভৃতির অভাবনিবারণার্থ যে ধনব্যয় হয়, তাহাকেই অনুৎপাদক ব্যয় বলা যায়। আবার যাহারা আপন পরিশ্রম মূলধন বা ভূমি প্রদান করিয়া ধনোৎপাদনের সহায়তা করে,তাহাদের তাবৎ ব্যয়ই যে উৎপাদক এরূপ কখনই নহে, কারণ তাহারাও আপন আপন বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশে যে সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে, সেই ব্যয়কে অবশ্যই অনুৎপাদক ব্যয় বলিতে হইবে। যে ব্যয় সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধে ধনের উৎপাদক, তাহাই উৎপাদক ব্যয়, আর যাহা তাহা নহে তাহাই অনুৎপাদক ব্যয়।

মিল ফসেট প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারেরা সমুদয় পরিশ্রম উৎপাদক ও অনুৎপাদক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যে পরিশ্রমদ্বারা সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধে ধনের উৎপত্তি হয়, তাহার নাম উৎপাদক পরিশ্রম, আর যদ্দ্বারা সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধে কোন প্রকারেই ধনোৎপত্তি হইতে পারে না, তাহারই নাম অনুৎপাদক পরিশ্রম। বৃথা আমোদ প্রমোদে যে পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় হয়,তাহাই অনুৎপাদক শ্রম ও ব্যয়ের উদাহরণ। কিন্তু এইরূপে শ্রেণীবিভাগ করা ততদূর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের মতে এরূপ কোন প্রকার পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ই হইতে পারেনা, যদ্দ্বারা সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় কোন প্রকারেই ধনোৎপাদন হয় না। ফলে নৃত্যগীতাদিতে যে পরিশ্রম ও ব্যয় হয় তাহাদ্বারাও পরম্পরাসম্বন্ধে ধনোৎপাদনের সাহায্য হইয়া থাকে। নৃত্যগীতাদি দ্বারা মন প্রফুল্ল হয়, ইহা কে না স্বীকার করিবে? অতএব আমরা এবিষয়ে মিল প্রভৃতির মতের পোষকতা করিতে পারিলাম না। অনেক অধুনাতন

পণ্ডিতেরাও এবিষয়ে আমাদের ন্যায় মত প্রকাশ করিয়াছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ধনোৎপত্তি—মূলধন।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, যেরূপ ভূমি ও পরিশ্রম ধনোৎপত্তির অবিনাভাবি কারণ, মূলধনও অবিকল তদ্রূপ। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই এই বিষয়ের যাথার্থ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। যাহারা ধনোৎপাদনের উদ্দেশে কোন বিশেষ বিষয়ে পরিশ্রম করিতেছে, তাহারা যাহা উৎপাদনার্থ পরিশ্রম করিতেছে, তাহাই খাইয়া পরিয়া কিছু জীবনধারণ করিতে পারেনা। সুতরাং ভাবি ধনোৎপাদনের নিমিত্ত পরিশ্রম করিবার সময় পূর্ব্বসঞ্চিত ধন না থাকিলে তাহারা কখনই কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না। যে কৃষিকার্য্য করে, সে তাহার নিজের বা তাহার মনিবের পূর্ব্বসঞ্চিত ধন ব্যবহারপূর্ব্বক কার্য্য করিয়াই নূতন ধনের উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। নতুবা যদি তাহাকে প্রতিদিন আহারের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত, তাহা হইলে সে কখনই ভবিষ্যতে ধনোৎপাদন করিবার নিমিত্ত পরিশ্রম করিতে পারিত না। যেমন কৃষিকার্য্যে, সকল প্রকার কার্য্যেই সেইরূপ। অতএব বর্ত্তমানে ব্যবহারার্থ পূর্ব্বসঞ্চিত ধনব্যতিরেকে কোন প্রকার ধনোৎপাদনার্থ পরিশ্রমই সফল হইতে পারে না। ইহাদ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে ধনোৎপাদনের সাহায্যার্থ যে পূর্ব্বসঞ্চিত ধনের আবশ্যকতা তাহাকেই মূলধন কহে।

যেরূপ অনেকে ভ্রমবশতঃ ধন ও অর্থ উভয়ই এক, ও অভিন্ন পদার্থ বলিয়া মনে করিয়া থাকে, সেইরূপ অনেকে আবার এরূপ মনে করে, যে মূলধন ও অর্থ এ উভয় ও এক পদার্থ। কিন্তু বাস্তবিক এটীও একটী বিষম ভ্রান্তি। অর্থের স্বতঃসিদ্ধ কোন গুণই নাই ইহা পূর্ব্বেই স্থির করা হইয়াছে। অর্থদ্বারা আবশ্যকসামগ্রী পাওয়া যায় ইহাই অর্থের ব্যবহার। অতএব কোন কার্য্যের মূলধন যদি অর্থ রূপে সঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে প্রথমে ঐ অর্থ কে উক্ত কার্য্যের উপযোগী সামগ্রীতে পরিণত করিতে হয়, নতুবা উহা কোনক্রমেই ব্যবহারে আসিতে পারে না। অনেকে এরূপ বলিয়া থাকে যে অমুক ধনীর এত টাকা মূলধন। ইহার অর্থ এই যে ধনোৎপাদনের সাহায্যার্থ উক্ত ধনীর যাহা কিছু আছে তাহার মূল্য এত টাকা। অর্থাৎ ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিলে সমুদায়ে অত টাকা হইতে পারে। মূলধনের মূল্যনির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্তই অমুকের এত টাকা মূলধন এইরূপ বলা গিয়া থাকে, নতুবা ওরূপ বলিবার উদ্দেশ্য কখনই এরূপ নহে যে টাকাই কেবল মূলধন অন্য কিছুই মূলধন নহে। ফলতঃ যে কোন দ্রব্য পরিশ্রমের সাহায্য করিবার নিমিত্ত সঞ্চিত, তাহাই মূলধন। তাহা শ্রমিকদিগের আহারসামগ্রী, ব্যবসায়ের যন্ত্রাদি, ও অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যই হইতে পারে।

মূলধন আমাদের উৎপাদক পরিশ্রমের নিয়ামক, অর্থাৎ দেশে যত মূলধন থাকে, পরিশ্রমও তাহার অনুরূপ হয়। যদি অধিক মূলধন থাকে পরিশ্রমও অধিক হইতে পারে, আর যদি মূলধন অল্প হয় পরিশ্রমও তদনুসারে অল্প হইয়া থাকে। মূলধনব্যতিরেকে পরিশ্রম কখনই ফলোৎপাদক হইতে পারে না। মূলধনদ্বারা পরিশ্রমের উপযোগী যত দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইতে

পারে, পরিশ্রমও তদনুসারে অল্প বা অধিক হইয়া থাকে। পরিশ্রমোপযোগী সামগ্রীসমূদয়ের সাহায্যে যত পরিশ্রম সফল হইতে পারে, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম কখনই সম্ভবে না, আর করিলেও সেই পরিশ্রম ফলোৎপাদক না হইয়া নিষ্ফল হয়। এক্ষণে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে মূলধনের তারতম্য অনুসারেই পরিশ্রমের ও তারতম্য হইয়া থাকে। অতএব সকলেরই নিজ নিজ মূলধন বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা উচিত, কারণ দেশের অধিবাসীদিগের নিজ নিজ মূলধন বৃদ্ধি হইলেই সমুদায় দেশেরও মূলধন বাড়িয়া উঠে। দেশের মূলধন যতই বাড়িবে, ততই উৎপাদক পরিশ্রমও বাড়িয়া উঠিবে, এবং শীঘ্রই সমুদয় দেশ ধনশালী হইতে সক্ষম হইবে।

মূলধনের যতদূর ক্ষমতা পরিশ্রম কখনই তাহার অধিক হইতে পারে না, তবে যতই মূলধন থাকিবে পরিশ্রম যে ততই হইবে এরূপ কখনই বলা যাইতে পারে না। কারণ এরূপ হওয়াও অসম্ভব নহে, যে অনেক সময় মূলধন অনিয়োজিত অবস্থাতেই থাকিতে পারে। ব্যবসায়ীর মাল বিক্রীত না হইয়া মজুত থাকিতে পারে, এরূপ স্থলে যত দিন বিক্রীত না হয়, ততদিন উহা অনিয়োজিত অবস্থাতেই থাকে। যদি কোন দেশে এত অধিক মূলধন থাকে, যে তথায় পরিশ্রম করিবার লোক তত নাই, সুতরাং সেই দেশের অনেক মূলধন অনেককাল কার্য্যোৎপাদন না করিয়া পতিত থাকিতে পারে, দেশের এরূপ অবস্থা ঘটিলে অন্যান্য দেশ হইতে পরিশ্রমার্থ লোকের আমদানী করিতে হয়।

কিন্তু মূলধন না থাকিলে ধনবৃদ্ধি হইতে পারে না যথার্থ বটে, কিন্তু মূলধন সংগ্রহ করিবার উপায় কি? কি উপায়ে আমরা ধনোৎপাদনের সাহায্যার্থ মূলধন সংগ্রহ করিতে পারি?

মূলধন সঞ্চয়ের ফলস্বরূপ। সঞ্চিত ধন না থাকিলে অন্য উপায়ে ধনোৎপাদন হইতে পারে না। যদি সকলেই স্ব স্ব উপার্জ্জনের ধন সমুদয়ই ব্যয় করিয়া ফেলিত, তাহা হইলে কোন প্রকারেই মূলধনের বৃদ্ধি হইতে পারিত না। মূলধনের বৃদ্ধি না হইলে দেশে ধন ও সভ্যতা জন্মিবার সম্ভাবনা থাকিত না, মনে কর এক স্থানে পাঁচ সাতটী পরিবার বাস করে। এই সকল পরিবারের লোকেরা নিজ নিজ পরিবার ভিন্ন অন্য কোন পরিবারকেই সাহায্য করে না। প্রত্যেকে আপন আপন পরিশ্রম দ্বারা যাহা উৎপন্ন হয়, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া দিনপাত করিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় পরিবারদিগকে একস্থানে বাস করিতে দেখিলে আপাততঃ মনে হইতে পারে বটে, যে উহাদের আবার মূলধনের আবশ্যকতা কি?উহারা কেনই ধন সঞ্চয় করিবে? উহারা প্রতিদিন পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করে উহাতেই তাহাদের নিজ নিজ পরিবারের ভরণ পোষণ পর্য্যাপ্তরূপে চলিতে পারে। আধুনিক পরস্পরসাপেক্ষ সমাজের ন্যায় উহাদের ত আর কাহাকেও সাহায্য করিতে হয় না। ইহার উত্তর এই,যে যদি উহারা নিজ পরিশ্রমের ধন সমুদয়ই ব্যয় করিয়া ফেলিত, কিছুই রাখিত না, তাহা হইলে উহাদের বাসস্থানে জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগী তাবৎ দ্রব্যই কালক্রমে উৎসন্ন হইয়া যাইত। সুতরাং তাহাদিগকে হয়ত চিরজীবন একস্থান হইতে অপর স্থান, আবার তথা হইতে স্থানান্তর, এইরূপ করিয়া কাল কাটাইতে হইত, নতুবা আহারাভাবে কালগ্রাসে পতিত হইতে হইত। অতএব একস্থানে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে হইলে কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করা নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা মানুষ কখনই প্রাণধারণ করিতে পারে না। যদি কেহ চাষ করিয়া খায়, তাহা হইলে তাহাকে অন্ততঃ ভবিষ্যতে চাষের

নিমিত্ত কিছু পরিমাণে বীজও সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়, নতুবা প্রতিবৎসর চাষ কিরূপে সম্ভবে? আবার অপরকে খাটাইয়া ধনবৃদ্ধির অভিপ্রায় থাকিলে আরও অধিক সঞ্চয় করিতে হয়, কারণ অন্যলোকে আহারাদি না পাইলে কেন তোমার জন্য খাটিতে যাইবে? এতাবতা বিলক্ষণ প্রতীতি হইল, যে পূর্ব্ব-সঞ্চিত ধনের সাহায্যব্যতীত কখনই ধনসম্পত্তি-বৃদ্ধি করা যাইতে পারে না। কিন্তু সঞ্চয় কাহাকে বলে? কৃপণ ব্যক্তিরা মনে করিয়া থাকে যে যত ধন উৎপন্ন হয়, তাহার অতি সামান্য কিঞ্চিৎ অংশ ব্যয়পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ প্রাণধারণ করিয়া অবশিষ্ট তাবৎ অংশই যত্নে নিরাপদে রাখাই সঞ্চয়। টাকা জমাইয়া লোহার সিন্দুকে রাখিলেই সঞ্চয় করা হইল। কিন্তু এরূপ সংস্কার নিতান্ত ভ্রমমূলক। ধনের যথার্থ ব্যবহার না করিয়া নিরর্থক জমাইয়া রাখিলে উহাদ্বারা কোন ফলোদয় হইতে পারে না। ফলতঃ আমাদের পরিশ্রমদ্বারা যত ধন উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে আবশ্যকমত অন্নবস্ত্রাদির নিমিত্ত খরচ করিয়া বাকি ধনোৎপাদনের সাহায্যার্থ সঞ্চয় করাকেই যথার্থ সঞ্চয় বলা উচিত। উপরে কথিত হইল যে ধনের যথার্থ ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু যথার্থ ব্যবহার কিরূপ তাহা বিশেষ-রূপে অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। ধনোৎপাদনকার্য্যে প্রয়োগ করাই ধনের যথার্থ ব্যবহার। যে সকল কার্য্যে ধনোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই তাহাতে ধনব্যয় করিলে উহা নিষ্ফল ও অনুৎপাদক হইয়া পড়ে। ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন যে ধনোৎপাদনের সাহায্যার্থ যে ধন নিয়োজিত হয়, তাহাও সমুদয় কোন না কোন প্রকারে ব্যয় হইয়া যায়। মূলধনের কিয়-দংশ ব্যবসায়ের উপযোগী যন্ত্রতন্ত্রাদি ক্রয় করিবার নিমিত্ত ব্যয় হইতে পারে, আবার এই সকল যন্ত্রতন্ত্র নিয়ত কার্য্যে

ব্যবহারদ্বারা কালক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিয়দংশ বা এরূপ দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার নিমিত্ত ব্যয় করিতে হয়, যে উহা অতি-শীঘ্রই লোপ পাইয়া যায়, যেমন বীজ প্রভৃতি। কতক অংশ বা শ্রমিকদিগের ভরণপোষণার্থ ব্যয়িত হয়। এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা গেল, যে মূলধনমাত্রেই কালক্রমে বিনষ্ট হইয়া থাকে। তবে মূলধন ব্যয় করিবার ফল কি? মূলধন নিজে ব্যয়িত হইয়া যায় যথার্থ বটে, কিন্তু উহা হইতে উহা অপেক্ষা অধিকতর ধনের উৎপত্তি হয়, সুতরাং মূলধন অন্যান্য আকারে বজায় থাকে, আর উহা হইতে লাভস্বরূপ অধিকতর ধন উৎপন্ন হয় বলিতে হইবে। এক্ষণে প্রতিপন্ন হইল যে মূলধন যদিও সঞ্চয়ের ফলস্বরূপ তথাপি ব্যয় না করিয়া নিরর্থক সঞ্চিত রাখিলে উহাদ্বারা কোন ফলোৎপাদন হইতে পারে না। ধনোৎপাদন-কার্য্যে বিনিয়োগপূর্ব্বক ব্যয় করাই মূলধনের প্রকৃত ব্যবহার। নতুবা লোহার সিন্দুকে পূরিয়া রাখা, বা বিলাসসামগ্রী ক্রয় করিতে ব্যয় করা, এই উভয়ই সমান; ইহার একটীও মূলধনের যুক্তিসিদ্ধ ব্যবহার নহে। ফলতঃ যে ধন দ্বারা ধনোৎপাদনের কোন রূপ সাহায্য হয় না, তাহাকে মূলধন বলা কখনই যুক্তি-সিদ্ধ নহে। যদ্দ্বারা ধনোৎপাদনপক্ষে বাস্তবিক সাহায্য হইয়া থাকে, তাহাই মূলধন, আর যাহাদ্বারা তাহা না হয়, তাহা প্রকৃত মূলধন নহে। তবে প্রকৃত ব্যবহার করিলে তাবৎ ধনই উৎপাদক হইয়া মূলধনের অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে।

অনেকে এরূপ মনে করিয়া থাকে, যে বিলাসী ব্যক্তিদিগের বিলাস-সামগ্রী-সমুদায় ক্রয় করিতে যে অর্থ ব্যয়িত হয়, তাহা দ্বারাও সমাজের অনেক উপকার হইয়া থাকে, কেননা সমাজের অনেক লোক ঐ বিলাসসামগ্রীসকল প্রস্তুত করিয়া যাহা লাভ হয় তদ্দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। যদি বিলাস-

সামগ্রীর প্রয়োজন না থাকিত, তাহা হইলে ঐসকল ব্যক্তিকে অন্নাভাবে কষ্ট পাইতে হইত। অনেকে সঞ্চয়ী বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে কৃপণ বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে, আর অমিতব্যয়ী অবিবেচকদিগকে যথার্থ দাতা বলিয়া ভূরি ভূরি প্রশংসা করে। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে, যে উল্লিখিত সংস্কারটী ভ্রান্তিমূলক, কারণ বিলাস-সামগ্রী-নির্ম্মাতারা উক্তরূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত আপনাদের পরিশ্রম ও মূলধন নিয়োজিত করিয়া থাকে যথার্থ বটে, কিন্তু তাহাদের পরিশ্রম ও মূলধনের ফলস্বরূপ যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তদ্দ্বারা সমাজের কিছুমাত্র উপকার হয় না। উহা কেবল ব্যক্তিবিশেষের বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিতেই নিয়োজিত হয়। আর বিলাসী ঐ সকল সামগ্রী ক্রয় করিতে যাহা ব্যয় করে, তৎসমুদয় বৃথা নষ্ট হইয়া যায়, উহাদ্বারা ধনোৎপাদনকার্য্যের কিছুমাত্র সাহায্য হয়না। ধনী উক্তরূপে অর্থব্যয় না করিয়া যদি কোন লাভজনক কার্য্যে উহা ব্যাপৃত করিত, তাহা হইলে সেই ধনের সাহায্যে অপরবিধ ধন উৎপন্ন হইত, ও দেশের মূলধনও কিঞ্চিদংশে বৃদ্ধি পাইত সন্দেহ নাই। আর বিলাসসামগ্রীবিক্রেতারাও বিলাসদ্রব্যের আবশ্যকতা না থাকিলে তৎসমুদয় প্রস্তুত করিতে অর্থ ও পরিশ্রম নিয়োগ না করিয়া অন্যান্য লাভজনক কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া আপনাদিগের ও সমাজের মূলধনবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইত। মনে কর এক ব্যক্তি পাটের কারবার করিয়া থাকে, সে একবার ৫০০ টাকার পাট বিক্রয় করিয়া উহা কোন লাভজনক বিষয়ে না লাগাইয়া, ৫০০ টাকা মূল্যে একটী অতি সুন্দর পোশাক খরিদ করিল। এস্থলে যদিও, যাহারা ঐরূপ পোশাক নির্ম্মাণ করিয়াছে, পাটের মহাজনের ৫০০ টাকা, তাহাদের পরিশ্রমের

বেতনস্বরূপ হইল, তথাপি বুঝিতে হইবে যে উহারা পরিশ্রম ও অর্থব্যয়পূর্ব্বক যে পোশাকটী প্রস্তুত করিয়াছে, তাহা দ্বারা ধনোৎপাদনের পক্ষে কিছু সাহায্য হইল কি না, কিছুই নহে। উহাদ্বারা বিলাসী মহাজনের বিলাসবাসনা চরিতার্থ হওয়া ব্যতীত কোন কার্য্যই হইলনা। কি বিলাসী মহাজন, কি ঐ বিলাসসামগ্রীনির্ম্মাতা, কি সমাজ, কেহই ঐ ৫০০ টাকার উপকার পাইল না। পক্ষান্তরে, যদি ঐ পাটের মহাজন পোশাকে ঐ ৫০০ টাকা অপব্যয় না করিয়া উহাদ্বারা একটী পাটের গাঁইটকসা কল সংস্থাপন করিত, তাহা হইলে উহাদ্বারা ঐ মহাজনের নিজের ও অন্যান্য কত লোকের কত উপকার হইত, ও সমাজেরও ধনবৃদ্ধি হইতে পারিত। অতএব স্থির হইতেছে, যে বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিতে লোকে যত অর্থব্যয় করে, দেশের ধনভাগ ততই কমিয়া যায়, আর লাভজনক কার্য্যে যতই ধনব্যয় হইতে থাকে, দেশের ধনভাগ ততই বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। আবার মনে কর ঐ মহাজন ৫০০ টাকার পোশাক না খরিদ করিয়া, উহাদ্বারা একটী ক্রীড়াসরিৎ খনন করিবার নিমিত্ত লোক নিযুক্ত করিল, এস্থলে মহাজনের টাকাদ্বারা শ্রমজীবীদিগের মজুরী দেওয়া হইতেছে বটে, কিন্তু উহাদের পরিশ্রমদ্বারা কিছুই ফললাভ হইতেছে না, মহাজন যদি ঐরূপে অপব্যয় না করিয়া কোন লাভজনক ব্যবসায়ে উহার বিনিয়োগ করিত, তাহা হইলে উহা হইতে ধনোৎপাদনের সাহায্য হইত, মজুরদিগের ও অবস্থার উন্নতি হইত, এবং দেশের ধনভাগও বৃদ্ধি পাইতে পারিত।

এক্ষণে স্থির হইতেছে, যে, [১] যেস্থলে কেবল নিজের বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত লোকে অর্থব্যয় করে, তথায় অর্থদ্বারা সেই ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সুখ ভিন্ন আর কোন ফল

উৎপন্ন হয় না। (১) যেখানে অনুৎপাদক পরিশ্রমের সাধনার্থ অর্থব্যয় হয়, তথায় অনুৎপাদক শ্রমিকদিগের আহার যোগান ভিন্ন অর্থের আর কোন ফল নাই। এই দুইয়ের একটী স্থলেও ব্যয়িত অর্থদ্বারা ধনোৎপাদনের কিছুই সাহায্য হয় না। (৩) যে স্থলে মূলধন উৎপাদক পরিশ্রমের সাধনস্বরূপে ব্যয়িত হয়, তথায় উহাদ্বারা ব্যয়কর্ত্তার সুখস্বচ্ছন্দবৃদ্ধি, ঐ অর্থের দ্বারা অপর অর্থের উৎপাদন, এবং শ্রমজীবীদিগেরও অবস্থার উন্নতি হইয়া থাকে। অতএব এইরূপে ব্যয় করাই যে অর্থের উপযুক্ত ব্যবহার তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যে ধন যে প্রকারের হউক না কেন, যাহাদ্বারা ধনোৎপাদনবিষয়ে কোন না কোন রূপ সাহায্য হইয়া থাকে, তৎসমুদয়কেই মূলধন কহে। ইহাদ্বারা এই বুঝিতে হইবে, যে শ্রমিকদিগের ভরণপোষণার্থ যে ধন ব্যয়িত হয়, তাহাই যে কেবল মূলধনশব্দের অভিধেয় এরূপ নহে, ধনোৎপাদনার্থ যে সমস্ত যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয়, যে কারখানায় ঐ যন্ত্রাদি স্থাপিত হয়, তৎসমুদয়ও মূলধন। অর্থাৎ প্রাকৃতিক ও মানুষের পরিশ্রমোৎপন্ন যাবতীয় দ্রব্য ধনোৎপাদনের সাহায্যার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে তৎসমুদয়ই মূলধন। এক্ষণে প্রতিপন্ন হইতেছে, যে মূলধন দ্বিবিধ। কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে যে মূলধনের প্রয়োজন হয়, তাহার কিয়দংশ এরূপ থাকে, যে একবারমাত্র ব্যবহার হইবার পর উহার আর সেরূপ অবস্থা থাকে না, উহা আর সেইরূপে ব্যবহৃত হইয়া সেই পদার্থের প্রস্তুতীকরণবিষয়ে ফলোপধায়ক হয়না। মনে কর একজন মহাজন পাথর বা ঝোমড়া পোড়াইয়া চুণ প্রস্তুত করিতেছে। এস্থলে পাতর বা ঝোমড়া পোড়াইতে যত কাষ্ঠ বা কয়লা লাগিবে তৎসমুদয় একবার মাত্র ব্যবহৃত

হইতেছে, একবার ব্যবহারের পর ঐ কাষ্ঠাদির আর তাদৃশ অবস্থা থাকিতেছেনা, সুতরাং সে অবস্থায় তৎসমুদয় কি প্রকারে আর ঐ ব্যবসায়ের মূলধন হইতে পারে? কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে যাবতীয় উপকরণসামগ্রী লাগে তৎসমুদয়ই এইরূপ। শ্রমিকদিগের আহারাদিনির্ব্বাহার্থ যাহা ব্যয়িত হয় ও যাহা তাহাদিগের বেতনস্বরূপে প্রদত্ত হয়, তত্তাবৎ ও এই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। এই শ্রেণীর অন্তর্গত মূলধন অন্যান্য আকারে পরিণত হইয়া অন্যান্য কার্য্যের মূলধনরূপে ব্যবহৃত হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু উহারা যেরূপে একবার যে ব্যবসায়ের মূলধনস্বরূপে ব্যবহৃত হইল, সেইরূপে আর কখনই সেই ব্যবসায়ের মূলধনস্বরূপে ব্যবহৃত হইতে পারেনা। সুতরাং ব্যবসায়ীকে, তাহার পরিশ্রম ও মূলধনদ্বারা যে সামগ্রী উৎপন্ন হইল, তাহা বিক্রয় করিয়া নিরন্তর ঐ প্রকার মূলধনের সরবরাহ করিতে হয়। এই শ্রেণীর মূলধনকে পৌনঃপুনিক বা ঘূর্ণমান মূলধন কহে। পৌনঃপুনিক মূলধন একবারমাত্র ব্যবহৃত হইয়াই বিনষ্ট হইয়া যায় বটে, কিন্তু ইহার ফল ও সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হয়। কৃষিজীবীরা আপন আপন পরিশ্রম ও মূলধনের ফল অবিলম্বেই পাইয়া থাকে। কারণ তাহাদিগের পরিশ্রম ও মূলধনের ফলস্বরূপ শস্যাদি শীঘ্রই উৎপন্ন হয়, ও শ্রমিকেরা তাহার ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু যে সকল পদার্থ মূলধনরূপে বারম্বার ব্যবহৃত হইয়াও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়না, বহুকাল পর্য্যন্ত একভাবে ব্যবহৃত হইয়া কার্য্য করিতে থাকে, তৎসমুদয়কে স্থাবর বা স্থিরতর মূলধন কহে। স্থাবর মূলধন বহুবার ব্যবহৃত হইয়াও বিনষ্ট হয় না। সমানভাবে ফলোৎপাদন করিতে থাকে, কেবল মধ্যে মধ্যে ইহাদিগকে কিছু কিছু মেরামত করিতে হয়। কৃষ-

কের লাঙ্গল, তন্তুবায়ের মাকু, কামারের হাতুড়ি, ও কলঘরের ষ্টীম এনজিন প্রভৃতি সমুদয় এই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। পৌনঃপুনিক ও স্থাবর মূলধনের পরস্পর প্রভেদ এই যে পৌনঃপুনিক মূলধন একবার মাত্র ব্যবহারের পরই বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উহার ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ ঐ মূলধনের মূল্য এবং ঐ মূল্যের উপর কিঞ্চিৎ লাভ ব্যয় করিবার পর অবিলম্বেই উৎপন্ন হয়, সুতরাং শ্রমিকেরা উহাদ্বারা আপন আপন পরিশ্রমের ফল শীঘ্রই ব্যবহার করিতে পারে, ফলতঃ উহা দ্বারাই তাহাদের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। কিন্তু স্থাবর মূলধনের মূল্য কোন স্থলেই শীঘ্র উৎপন্ন হয় না। উহা দ্বারা বহুকাল কার্য্য চলিতে থাকে। বহুকাল কার্য্য চলিলে পরিশেষে প্রভূত লাভ হইতে থাকে, ও দেশের মূলধন ও বহুলাংশ পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তবে উহাদ্বারা শীঘ্র শীঘ্র যাহা লাভ হয়, তদ্দ্বারা কেবল মেরামতের খরচটা মাত্র চলিয়া যায়।

ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যে যদি হঠাৎ কোন পৌনঃপুনিক মূলধনকে স্থাবর মূলধনে পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে শ্রমিকদিগকে কিছুকালের জন্য বড়ই অসুবিধা সহ্য করিতে হয়। মনে কর আমাদের রেলওয়ে কোম্পানি যে মূলধন ব্যয় করিয়া রেলওয়ে প্রস্তুত করিয়াছেন, রেল প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে তত্তাবৎ মূলধন কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত ছিল। সুতরাং সেই সুমহৎ কৃষিকার্য্য চালাইতে যত শ্রমজীবী নিযুক্ত থাকিত, তাহারা পরিশ্রম করিবার পর অল্পকালের মধ্যেই নিজ নিজ পরিশ্রমের ফলভোগ করিতে পাইয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত। কিন্তু যখন রেলওয়ে কোম্পানি ঐ মূলধন উক্তরূপে না খাটাইয়া রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন কোম্পানির কৃষিকার্য্যে যেসকল লোক পরিশ্রম করিত তাহারা

সকলেই পূর্ব্বের ন্যায় শীঘ্র শীঘ্র আপন আপন শ্রমের ফল-ভোগ করিতে পাইল না, কারণ কলের দ্বারা কার্য্য চালাইলে বহু লোকের কার্য্য অল্প লোকে চালাইতে পারে, সুতরাং তাহাদিগকে অন্যান্য উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইল, ফলতঃ কিছুকাল তাহাদিগকে বিলক্ষণ কষ্টে পড়িতে হইল। কিন্তু কালসহকারে যেমন রেলওয়েকার্য্যের বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তাহাদিগেরও অবস্থার উন্নতি হইতে আরম্ভ হইল, এবং এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে রেলওয়ে-কার্য্যে পূর্ব্বের কৃষিকার্য্যে যত লোক পরিশ্রম করিত, তাহা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের প্রয়োজন হইল, এবং শ্রমি-কেরা সুখের অবস্থায় উত্তীর্ণ হইল। ক্রমশঃ রেলকোম্পানির বিলক্ষণ লাভ হইতে লাগিল ও মূলধনও পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি লাভ করিয়া দেশের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পৌনঃপুনিক মূলধন স্থাবররূপে পরিণত করিতে হইলে যদিও আপাততঃ দেশের কতক অসু-বিধা হয়, কিন্তু পরিশেষে উহাদ্বারা দেশের ও জনসমাজের বিলক্ষণ উপকার হইয়া থাকে।

মূলধন নানাবিধ প্রকারে ব্যবহৃত হইতে পারে। কেহ কৃষি-কার্য্যে আপন মূলধন বিনিয়োজিত করে, কেহ নিজ মূলধনদ্বারা মুদ্রাযন্ত্রসংস্থাপন করে, কেহ বা কর্জ্জ দিয়া উহার সুদ হইতে মূলধনের বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ফলতঃ যে কোন প্রকারে ধনোৎপাদনকার্য্যের সাহায্য হইলেই মূলধনের প্রকৃত ব্যবহার হইল। পূর্ব্বে অনেকের এইরূপ সংস্কার ছিল, যে টাকা ধার দিয়া সুদ খাওয়া অন্যায় ও যুক্তিবিগর্হিত কার্য্য, কারণ এরূপ করিলে অধমর্ণদিগের প্রতি অত্যাচার করা হয়। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, এই

সংস্কারটী নিতান্ত অসঙ্গত। টাকা ধার দিয়া সুদ লইলে খাতকের প্রতি কি অত্যাচার হয়? কিছুই নহে। কর্জ্জ দিবার অর্থ কি? আমার অর্থ আমি অন্যকে ব্যবহার করিতে দিলাম, সে উহা ব্যবহার করিয়া উপকারলাভ করিল, এবং আমার অর্থ ব্যবহার করিয়া তাহার লাভ হইল বলিয়া ঐ লাভের কিয়দংশ সুদস্বরূপে আমাকে দিল। ইহাদ্বারা উভয়েরই উপকার হইল, আমারও কিছু সুদলাভ হইল, আর অধমর্ণেরও বিলক্ষণ উপকার হইল। অতএব ধার দেওয়া কিসে ন্যায়সঙ্গত নহে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ধনোৎপত্তি।

সাধনত্রয়ের উৎপাদিকা শক্তি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নির্ণীত হইয়াছে, যে ধনোৎপত্তির সমুদায়ে তিনটী সাধন, ভূমি, পরিশ্রম ও মূলধন। এক্ষণে এই তিনটীর মধ্যে কোন্‌টীর কিরূপ উৎপাদিকাশক্তি ও কিরূপ উপায়দ্বারা ঐ শক্তির বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, এই সমস্ত বিষয় সম্যক্‌রূপে বিবেচিত হইতেছে। ভূমি পরিশ্রম ও মূলধন এই তিনটীর সমবেত কার্য্যদ্বারাই ধন উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেবল ভূমি, কেবল পরিশ্রম, বা কেবল মূলধন, কোন কার্য্যেরই নহে, আবার ইহাদের একটীর অভাবে অপর দুইটী দ্বারাও ধনোৎপাদন হইতে পারে না। ইহাদ্বারা এই স্থির হইতেছে, যে ধনোৎপাদন কার্য্যে ইহাদের প্রত্যেকের স্বাভাবিক শক্তি আছে বটে, কিন্তু ইহাদের পরস্পর সাহায্যদ্বারাই ঐ উৎপাদিকা শক্তি উদ্ভূত হয়। আবার এই তিনটীরই উৎপাদিকা শক্তি দেশ

কাল পাত্র প্রভৃতি নানা কারণে ভিন্ন ভিন্ন। আমাদের দেশের ভূমি বিলাত প্রভৃতি উত্তরদেশের ভূমি অপেক্ষা অধিক উর্ব্বরা, সুতরাং এদেশে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিশ্রমে অধিকতর ফশল উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে সকল প্রদেশ সমতল তথায় ফশল উৎপাদন করিতে যেরূপ শ্রম ও ধনব্যয়ের আবশ্যকতা হয়, প্রস্তরময় প্রদেশে তদপেক্ষা অনেক অধিক শ্রম ও ধনব্যয়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এইরূপ হইবার কারণ এই যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভূমির উর্ব্বরতাগুণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। যে স্থানে ভূমির উর্ব্বরতাগুণ অপেক্ষাকৃত অধিক তথায় উৎপাদনকার্য্যে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিশ্রম ও ব্যয় লাগে। আবার যে স্থানে ভূমির উর্ব্বরত্ব অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অল্প, তথায় অপেক্ষাকৃত অধিক শ্রম ও মূলধনের আবশ্যকতা হয়।

কালভেদেও ভূমিপ্রভৃতির উৎপাদিকা শক্তির তারতম্য হইয়া থাকে। যে সকল প্রদেশ কিছুকাল পূর্ব্বে অনুৎপাদক মরুভূমি বা অরণ্যময় ছিল, তৎসমুদয় কালক্রমে বিলক্ষণ উর্ব্বরা হইয়া প্রভূত ফশল উৎপাদন করিতেছে। সুন্দরবন কিছুদিন পূর্ব্বে ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভয়ানক আরণ্য জন্তুদিগের আবাসভূমি ছিল, কিন্তু এক্ষণে ঐ সকল প্রদেশে আবাদ হইয়া বিলক্ষণ লাভ হইতেছে। কোন কোন দেশের লোক অন্যান্য দেশের লোক অপেক্ষা অধিক শ্রম ও কার্য্য করিতে পারে। কথিত আছে ইংলণ্ডের একজন কৃষক একলা যে কার্য্য করিতে সক্ষম, রুসিয়াদেশীয় তিন জন দাস একত্র পরিশ্রম করিলে সেই কার্য্য সমাধা করিতে পারে। মূলধনের পক্ষেও ঠিক ঐরূপ। বিশেষ কৌশল ও নৈপুণ্যের সহিত মূলধন প্রয়োগ করিতে পারিলে যে কার্য্য অনায়াসেই সম্পাদিত হয়, কৌশলব্যতিরেকে অসংখ্য লোক একত্র করিয়াও কোন কালেই সেই কার্য্য সমাধা

করিতে পারা যায় না। একণে ষ্টীম এনজিন, বা ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফদ্বারা যে সকল কার্য্য সহজে ও অল্পকালে নির্ব্বাহিত হইতেছে, ষ্টীম এনজিন প্রভৃতির সৃষ্টি না হইলে ঐ সকল কখনই সম্পাদিত হইতে পারিত না। একণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, যে দেশ, কাল, পাত্র, জলবায়ু, কৌশল প্রভৃতি নানাবিধ কারণের সহযোগে পূর্ব্বোক্ত সাধনত্রয়ের উৎপাদিকা শক্তির তারতম্য হইয়া থাকে।

ভূমির উৎপাদিকা শক্তির যে যে কারণে ইতর বিশেষ হয়, তন্মধ্যে প্রাকৃতিক সৌকর্য্য ও তাহার বিপর্য্যয় এই দুইটাই সর্ব্বপ্রধান। কোন কোন প্রদেশের ভূমি স্বাভাবিক নিয়মে অন্যান্য স্থানের ভূমি অপেক্ষা অধিকতর উর্ব্বরা হইয়াছে। অতএব একপ স্থলে অল্পায়াসে ও অল্পব্যয়ে প্রভূত ধন উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভূমি উর্ব্বরা হইলেই যে ধনোৎপাদনের সুবিধা হইল, একপ বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ অনেক স্থানের ভূমি এত উর্ব্বরা যে তথায় অপর্য্যাপ্তপরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু ঐ উৎপন্ন দ্রব্য দেশবিদেশে লইয়া বিক্রয় করিবার কোন উপায় নাই, এবং তত্রত্য অধিবাসীদিগের সংখ্যাও এত অধিক নহে, যে তৎসমুদয় তাহাদের মধ্যেই নিঃশেষিত হইতে পারে, সুতরাং তথাকার অনেক উৎপন্ন দ্রব্য ধনোৎপাদনপক্ষে কোন সাহায্য না করিয়া নিষ্ফল পড়িয়া থাকে। আবার যদিও ঐ সমস্ত দ্রব্যজাত বহুব্যয় ও পরিশ্রমপূর্ব্বক বিদেশে লইয়া যাওয়া যায়, তাহাতেও বিশেষ লাভ হয় না, কারণ ঐরূপে একদেশ হইতে অন্যদেশ লইয়া যাইতে এত ব্যয় পড়িয়া যায়, যে পরিশেষে হিসাব করিলে কিছুই লাভ দাঁড়ায় না। উত্তর আমেরিকার মিসিসিপি নদীর নিকটস্থ ভূমিসমুদয় এমত উর্ব্বরা যে, তথায় অপর্য্যাপ্তপরিমাণে

শস্য উৎপন্ন হয়, কিন্তু এই শস্যের অধিকাংশ ইউরোপের অধিবাসীদিগের ব্যবহারার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। ইহাতে এত খরচ হইয়া যায়, যে হিসাবের সময় অতি সামান্য লাভ হয়। অতএব দেশের এরূপ অবস্থা হইলে তথায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পাওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ভূমির উর্ব্বরতাগুণের তারতম্য অনুসারে পরিশ্রমের উৎপাদিকা শক্তির তারতম্য হইতে দেখা যায়। যে ভূমি অধিক উর্ব্বরা তথায় অল্প পরিশ্রমেই কার্য্য হয়, আর যে স্থানের ভূমি অল্প উর্ব্বরা তথায় অধিক পরিশ্রমের আবশ্যকতা হয়, এবং এই প্রকারে শ্রমের শক্তিরও ইতরবিশেষ হইয়া পড়ে। শ্রমজীবীদিগের বা শ্রমের তত্ত্বাবধায়কদিগের আকৃতি প্রকৃতি, বুদ্ধিবৃত্তি, ও শিক্ষার ইতরবিশেষ অনুসারে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হয়। যাহারা অপেক্ষাকৃত সবলশরীর, কষ্টসহ, বুদ্ধিমান, ও সুশিক্ষিত, তাহারা তাহাদের অপেক্ষা হীনবল, ও হীনবুদ্ধি লোকদিগের অপেক্ষা অধিকতর উৎপাদক পরিশ্রম করিতে সক্ষম। বঙ্গদেশের কৃষকেরা উৎকলের কৃষকদিগের অপেক্ষা অনেক অংশে কার্য্যদক্ষ। কোন কার্য্যে মূলধন ব্যয় করিলে তাহার ফলস্বরূপ যাহা উৎপন্ন হয়, সেই উৎপন্ন দ্রব্যের সহিত উহার যে সম্বন্ধ, তাহাই মূলধনের উৎপাদিকাশক্তির নিয়ামক। অর্থাৎ যদি ১ টাকা মূলধন হইতে ২ টাকা উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে এই বুঝিতে হইবে, যে এস্থলে মূলধন আপনার দ্বিগুণ উৎপন্ন করিতেছে। যেরূপ ভূমি ও পরিশ্রমের উৎপাদিকাশক্তি দেশকালপাত্রভেদে ভিন্নপ্রকার হইয়া থাকে, মূলধনের বিষয়েও ঠিক সেই রূপ। উর্ব্বরা ভূমিতে উপযুক্ত পরিশ্রম করিলে মূলধনের উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু এতদ্ভিন্ন আর একটী কারণেও মূলধনের উৎপাদিকা

শক্তির তারতম্য হইয়া থাকে। যন্ত্রব্যবহার দ্বারা কার্য্যসাধন করিতে পারিলে অল্প পরিশ্রমে অধিক কার্য্য সাধিত হয়। কপি-কল খাটাইয়া কাট তুলিলে কত লোকের কার্য্য কয়েক জন মাত্র লোকের দ্বারা সাধিত হয়। ষ্টীম এন্‌জিন দ্বারা কত অল্প সময়ে ও কত অল্পব্যয়ে প্রভূত ধন উৎপন্ন হইতেছে, ইহা সকলেই বুঝিয়াছেন। ফলতঃ যন্ত্রাদি ব্যবহার প্রভৃতি যে কোন উপায়ে যতই পরিশ্রমের লাঘব করিতে পারা যায়, ততই অল্প-ব্যয়ে অধিক কার্য্য সাধিত হয় ও বিলক্ষণ লাভ হইতে পারে। কিন্তু যদি যন্ত্রাদিব্যবহারদ্বারা কার্য্য না করিয়া কেবল মানুষের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করা যায়, তাহা হইলে সকল কার্য্যেই বহু পরিশ্রম ও ব্যয় হয়, কিন্তু তাদৃশ লাভ দেখা যায় না। এইরূপেই মূলধনের উৎপাদিকা শক্তির তারতম্য হইয়া থাকে।

কি কি কারণে ভূমি, পরিশ্রম, ও মূলধনের উৎপাদিকা শক্তির তারতম্য হইয়া থাকে, তাহা উপরিভাগে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এক্ষণে কিরূপে ইহাদিগের উৎপাদিকাশক্তি প্রভৃতির বৃদ্ধিদ্বারা অধিকতর ধন উৎপন্ন করা যাইতে পারে তাহার উপায় নির্ণীত হইতেছে। ভূমি ঈশ্বরদত্ত, ইহার হ্রাসবৃদ্ধি কিছুই নাই, কিন্তু পরিশ্রম ও মূলধন উভয়ই বাড়াইবার উপায় আছে, অতএব কি উপায়েই বা এই উভয়ের বৃদ্ধি হইতে পারে তাহাও বিবেচিত হইতেছে।

যদিও ভূমির বৃদ্ধি করা যায় না, কিন্তু অনায়াসেই কৃষি-কার্য্যের বিস্তৃতি করা যাইতে পারে। সকল দেশের সকল ভূমিতেই যে চাষ হইয়াছে এরূপ কখনই বলা যায় না। অতএব ভূমি হইতে অধিক ধনোৎপাদন করিবার প্রয়োজন হইলে পতিত ভূমি সকল আবাদ করা উচিত। যে স্থলে আবাদকরা ভূমির উর্ব্বরতাগুণ বৃদ্ধি করা চলে, তথায় পতিত ভূমিতে

আবাদ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে উহাদিগের উর্ব্বরতাগুণ বাড়াইবার চেষ্টা পাওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু যে দেশের ভূমি এত উর্ব্বরা যে তাহার উর্ব্বরত্ব আর বাড়িতে পারে না, তথায় অধিক উৎপাদন করিবার আবশ্যকতা হইলে পতিত ভূমি আবাদ করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এইরূপে কৃষিকার্য্যের বিস্তার করাকেই লোকে ভূমির বৃদ্ধি বলে। জমিতে সার দিলে উহার ফলোৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হয়। সকল দেশেই এই উদ্দেশে জমির উপর মেষের পাল রাখিয়া দেয়, উহাদের মলমূত্রদ্বারা ভূমির উৎপাদিকাশক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের অন্তর্গত নরফকশায়ার নামক স্থানের ভূমি পূর্ব্বে কিছুমাত্র উর্ব্বরা ছিল না, কিন্তু এক্ষণে এই উপায়দ্বারা বিলক্ষণ উর্ব্বরা হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে এরূপ জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে ভূমির উর্ব্বরতাগুণ কিরূপ? তাহার উত্তর এই যে, কোন ভূমি অপর ভূমির অপেক্ষা স্বভাবগুণে অধিক উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু যে স্থানে ঐ ভূমি হইতে উৎপন্ন শস্যাদির ব্যবহার হইবেক, তথায় উহা লইয়া যাইতে অনেক বউনিখরচ পড়িতে পারে। আবার ঐ স্থানের নিকটস্থ ভূমি যদিও অপেক্ষাকৃত অল্পোৎপাদক, কিন্তু উহার ফশল লইয়া যাইতে তাদৃশ বউনিখরচ পড়ে না, সুতরাং এরূপ স্থলে দূরস্থ অধিকোৎপাদক ভূমি অপেক্ষা নিকটস্থ অল্পোৎপাদক ভূমি অধিক কার্য্য করিতেছে বলিতে হইবে। এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে দুই খণ্ড ভূমির মধ্যে যেখানির উৎপন্ন দ্রব্যাদি ব্যবহারোপযোগী করিতে অধিকতর ব্যয় ও পরিশ্রমের আবশ্যকতা হয়, তাহাকেই অল্প উর্ব্বরা, ও যেখানির অপেক্ষাকৃত অল্প শ্রম ও ব্যয় লাগে সেই খানিকেই অধিক উর্ব্বরা বলিতে হইবে। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে যন্ত্রব্যবহারাদি যে কোন উপায়ে ভূমির কৃষি ও উৎপন্ন দ্রব্যবহনাদি-

কার্য্যের ব্যয়সাধন করা যাইতে পারে, তন্তাবৎ হইতেই ভূমির উৎপাদিকাশক্তির বৃদ্ধি হয়।

কোন দেশে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইলেই তথায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে আহারসামগ্রীরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। কাজেকাজেই এরূপ হইলে তথাকার অধিবাসীদিগকে তত্রত্য পতিত ভূমি সকল আবাদ করিতে হয়। কিন্তু ঐ সকল ভূমি অপেক্ষাকৃত অল্প উর্ব্বরা হওয়াতে উহাতে আবাদ করিতে অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় হয়। সুতরাং ঐসকল ব্যয়নির্ব্বাহপূর্ব্বক লাভ করিবার জন্য আপনা আপনিই তথায় আহারসামগ্রীর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক মূল্যবৃদ্ধি হইয়া উঠে, এবং এইরূপেই এরূপ অবস্থাতেও অধিবাসীদিগের জীবনরক্ষা ও ধনবৃদ্ধি হইয়া থাকে। যদি অজন্মা বা হাজাশুকা প্রভৃতি কারণে কোন দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষের উপক্রম বুঝিয়াই তথাকার মহাজনেরা মাল ধরিয়া রাখে, এবং যখন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তখন ধান্যাদির দর অনেক চড়াইয়া দিয়া বিক্রয় করিতে থাকে, দর চড়িতেই লোকে জীবনধারণোপযোগী আহারদ্রব্য যথাকথঞ্চিৎ ক্রয় করিয়া জীবনরক্ষা করিয়া থাকে। ব্যবসাদারেরা এরূপ না করিলে হয়ত দেশশুদ্ধ লোক অন্নাভাবে কালগ্রাসে পতিত হইত।

পরিশ্রমের উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিবার উপায় উহার সমবায় অর্থাৎ বহুলোকের একত্র পরিশ্রম। যে কার্য্যটী দুই জনে অতিকষ্টে সাধন করিতে পারে, যদি চারি জন লোকে উক্তকার্য্য-সাধনার্থ একত্র পরিশ্রম করে, তাহা হইলে অল্লায়াসেই ঐ কার্য্যটী সম্পাদিত হয়। অনেক কার্য্য এরূপ আছে যাহা বহুলোকের যুগপৎ পরিশ্রম ব্যতিরেকে কখনই সাধিত হইতে পারেনা। মনে কর একটী বৃহৎ বোঝা কোন উচ্চস্থানে

তুলিতে হইবে। দুই এক জন লোকে এইরূপ কার্য্য কখনই সাধন করিতে পারেনা। কিন্তু অনেক লোক একত্র পরিশ্রম করিলে উহা অনায়াসে ও অবিলম্বেই নির্ব্বাহিত হয়। একজন লোকের পরিশ্রমের উক্ত কার্য্য সাধনবিষয়ে কিছুমাত্র উৎপাদকতা নাই। কিন্তু বহুলোকের পরিশ্রমের সমবায় হওয়াতে উহা অনায়াসেই সাধিত হইতেছে। শ্রমের সমবায় উহার উৎপাদিকাশক্তির বৃদ্ধি করে বলিয়াই অনেকজনে একত্র পরিশ্রম করাতে ঐরূপ কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে, নতুবা উহা কখনই সাধিত হইতে পারিত না।

পরিশ্রমের সমবায় দুই প্রকার। বিশুদ্ধ-সমবায়, ও সমবায়-সঙ্কর বা মিশ্র-সমবায়। বহুলোকে একটী কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত যে একত্র পরিশ্রম করে তাহাকেই বিশুদ্ধ সমবায় কহে। অনেক কার্য্য এরূপ আছে যে বহুলোকের একত্র পরিশ্রম করা ব্যতীত উহা কখনই সাধিত হইতে পারেনা। পূর্ব্বে যে দৃষ্টান্তটী উল্লিখিত হইয়াছে উহাই এই বিশুদ্ধ সমবায়ের উদাহরণস্থল। ইহার অন্যান্য অসংখ্য উদাহরণ প্রতিদিন আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, অতএব ইহা কিরূপ আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি। ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ে ব্যাপৃত ব্যক্তিরা যে অন্যান্যের সাহায্য করিয়া থাকে তাহারই নাম সমবায়-সঙ্কর। আমরা যে বিলাতী কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকি উহা আপাততঃ অতি সামান্য পরিশ্রমের ফল বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে অসংখ্য ভিন্ন-ভিন্ন-ব্যবসায়ী লোকের পরস্পর সাহায্যও পরিশ্রমে উহা প্রস্তুত হইয়া আমাদের ব্যবহারার্থ উপস্থিত হইয়াছে। তুলা ও পাট এই দুইটী দ্রব্যে বিলাতী কাপড় প্রস্তুত হয়। অতএব

সর্ব্বপ্রথম যাহারা তুলা ও পাটের চাষ করিয়াছে তাহাদের পরিশ্রম। পরে যাহারা কার্পাস ও পাট গাছ হইতে তুলা ও পাট বাহির করিয়াছে তাহাদের পরিশ্রম। পরে যাহারা এদেশ হইতে উহা লইয়া যাইবার সুবিধার নিমিত্ত গাইট করিয়াছে তাহাদের শ্রম। তৎপরে যাহারা জাহাজে করিয়া উক্ত দ্রব্যাদি আমাদের দেশ হইতে বিলাতে লইয়া গিয়াছে তাহাদের শ্রম। তাহার পর মাঞ্চেষ্টরবাসী তাঁতীদের শ্রম। তাহার পর আবার প্রস্তুত কাপড় জাহাজে করিয়া আমাদের দেশে আনিবার শ্রম। এত লোকের পরস্পর সাহায্য ও পরিশ্রমে আমরা বিলাতী কাপড় ব্যবহার করিতে পাইতেছি। পূর্ব্বে যাহাদের নাম উল্লিখিত হইল, উহারা সকলেই উক্তকার্য্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিশ্রম করিয়াছে, কিন্তু এতদ্ভিন্ন কামার, জাহাজনির্ম্মাতা প্রভৃতি নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী লোকও ঐ কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্ত পরম্পরাসম্বন্ধে পরিশ্রম করিয়াছে। অতএব কতলোকের সাহায্যে যে আমরা বিলাতীকাপড় ব্যবহার করিতে পাইতেছি তাহার সংখ্যা করা যায়না। অল্প লোকের পরিশ্রমে কখনই উক্ত কার্য্য সাধিত হইতে পারিত না। এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা গেল সমবায়সঙ্করদ্বারা শ্রম কতদূর কার্য্যকর হইয়া উঠে। সঙ্কর-সমবায়কে কেহ কেহ শ্রমবিভাগ বলিয়া থাকেন। ইহার অর্থ এই, কোন একটী কার্য্য করিতে যে পরিশ্রম লাগে, এক জন বা অল্পলোকে উহা না করিয়া অনেক লোকের মধ্যে উহার বিভাগ করিয়া লইলে সহজেই ঐ কার্য্যটী সাধিত হইয়া থাকে। যাহারা আল্পিন গড়িয়া থাকে তাহারা বহুলোকে একত্র শ্রম করে। কেহ তার প্রস্তুত করে, কেহ তার কাটিয়া থাকে, কেহ ঐ আল্পিনের অগ্রভাগ ঘষিয়া সূচি-নির্ম্মাণ করে, কেহ আল্পিনের মাথাটী বসাইয়া দেয়। এই রূপে

দশ জন লোক একত্র পরিশ্রম করিয়া প্রতিদিন ৫০,০০০ আল্পিন প্রস্তুত করিয়া থাকে, কিন্তু যদি ওরূপ না করিয়া উহারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র হইয়া কাজ করিত তাহা হইলে প্রত্যেকে ১০টী মাত্র পিন প্রস্তুত করিতে পারিত। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে এইরূপ শ্রমবিভাগদ্বারা প্রত্যেকের উৎপাদিকা শক্তির ২০০ গুণ বৃদ্ধি হইতেছে। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ শ্রম-সমবায়ের কি অসীম প্রভাব!

তিনটী কারণে সমবায়সঙ্করদ্বারা শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হয়। ১ম।—ইহাদ্বারা প্রত্যেক কারিকরের স্ব স্ব কার্য্যসাধন-বিষয়ে নৈপুণ্য ও দক্ষতার বৃদ্ধি হয়। নিরন্তর একরূপ কার্য্য করিলে উহাতে নৈপুণ্যবৃদ্ধি হওয়াই স্বভাবের ধর্ম্ম। আল্পিনের কারখানায় যে তার প্রস্তুত করে, সে আর কোন কার্য্যই করে না, সুতরাং দিন দিন ঐ কার্য্যে তাহার নৈপুণ্যবৃদ্ধি হইতে থাকে। আল্পিন গঠনের ন্যায় সকল কার্য্যেই এইরূপ।

২য়। যদি অনেক লোক পরস্পর সাহায্য না করিয়া সকলে স্বতন্ত্র হইয়া কার্য্য করিত, তাহা হইলে এক ব্যক্তিকে কার্য্যের এক অংশ ত্যাগ করিয়া অপর অংশে হাত দিবার পূর্ব্বে কিছু সময় বৃথা অতিবাহিত করিতে হইত। মনে কর একজন নিজেই তার প্রস্তুত করিতেছে, উহা কাটিতেছে, আল্পিনের মাথা প্রস্তুত করিতেছে, ও উহার অগ্রভাগ সুচাগ্রবৎ করিতেছে। মনে কর ঐ ব্যক্তির তার প্রস্তুত হইল, এক্ষণে উহাকে তার কাটিতে হইবেক, কিন্তু তার কাটা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সে কিছু বিশ্রাম করিয়া লইল, সুতরাং ঐ সময়টী বৃথা নষ্ট হইল। কিন্তু শ্রমবিভাগ দ্বারা এই অনিষ্টটী নিবারিত হইতে পারে।

৩য়। সমবেত পরিশ্রম দ্বারা স্ব স্ব কার্য্যে প্রত্যেকের নৈপুণ্যবৃদ্ধি হয়, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এইরূপে নৈপুণ্যবৃদ্ধি হইলে উহারা কালক্রমে আপন আপন কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হয়। যন্ত্রাদি নির্ম্মিত হইলে তাহাদিগের পরিশ্রমের আরও লাঘব হইয়া উৎপাদিকাশক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পরিশ্রমের সমবায় সমাজবন্ধনের মূলস্বরূপ। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যান্য সকলকেই সাহায্য করিতেছে। কেহ আহারসামগ্রী প্রস্তুত করিতেছে, কেহ আহার পাইয়া উহার পরিবর্ত্তে বস্ত্র নির্ম্মাণ করিতেছে, কেহ বা শ্রমিকদিগের স্বাস্থ্য-রক্ষা করিতেছে, এইরূপে সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই কোন না কোন প্রকারে অপর সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত পরিশ্রম করিয়া থাকে। এরূপ না হইলে কখনও সমাজবন্ধন ও সমাজের উন্নতি হইতে পারিত না, সুতরাং মানবজাতিকে চিরকাল আদিম অসভ্যতাতে কষ্টে কালযাপন করিতে হইত সন্দেহ নাই।

সমবেত পরিশ্রমের সুবিধার নিমিত্ত দেশ বিদেশে যাহাতে অনায়াসে যাতায়াত করা যায়, তাহার উপায় বিধান করা উচিত, নতুবা ইহাদ্বারা বিশেষ উপকার হইতে পারেনা। ইংরাজী ১৮৬০ শালে বঙ্গদেশ হইতে উত্তরপশ্চিম প্রদেশে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা ছিল না, তখন অতদূর কলের গাড়ি হয় নাই, সুতরাং ঐ সময়ে উত্তরপশ্চিম প্রদেশে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তাহার নিবারণার্থ বঙ্গদেশ কোন সাহায্য করিতে পারেনাই। কিন্তু অল্পকাল পূর্ব্বে ফ্রান্সদেশে যে দুর্ভিক্ষ হয় তাহার নিবারণার্থ আমরাও সাহায্য করিয়াছিলাম।

লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইলেই দেশের পরিশ্রমেরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পরিশ্রম বাড়িলেই ধনোৎপাদনের ও বৃদ্ধি হয়। বৃদ্ধিই প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে তাবৎ পদার্থ নিয়তই বৃদ্ধির উন্মুখ। মনুষ্যজাতিরও সন্তানসন্ততি হইয়া নিয়তই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যদি কোন ব্যাঘাত না হয় তাহা হইলে সকল দেশের লোকসংখ্যাই কুড়ি বৎসরের মধ্যে দ্বিগুণ হইতে পারে। ভূয়োদর্শনদ্বারা এই বিষয়টীর যাথার্থ্য

সপ্রমাণ হইয়াছে। যদি লোকসংখ্যা অব্যাহতরূপে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহা হইলে অবিরত ধনবৃদ্ধি হইয়া পৃথিবীতে এত ধন জমা হইয়া যায়, যে তাহার আর ইয়ত্তা হয়না, এবং এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে লোকসংখ্যা এত অধিক হইয়া উঠিতে পারে, যে পরিশেষে পৃথিবীতে তাহাদের আর পর্য্যাপ্ত স্থান হয় না।

কিন্তু নানাবিধ ব্যাঘাত উপস্থিত হয় বলিয়া কার্য্যে প্রায়ই এরূপ ঘটিয়া উঠে না। আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ ও তাহার আনুষঙ্গিক নানাবিধ পীড়া উপস্থিত হওয়াতে মধ্যে মধ্যে লোকসংখ্যার হ্রাস হইয়া থাকে। বাল্যবিবাহ ও লোকসংখ্যা কম হইবার অপর একটী কারণ। ইউরোপ-খণ্ডে পিতামাতার অযত্নে অনেক সন্তান শৈশবেই কালগ্রাসে পতিত হয়। ইংলণ্ডের ভদ্রলোকেরা উপার্জ্জনক্ষম না হইলে প্রায়ই বিবাহ করেন না, ও নরওয়ের লোকেরা উপার্জ্জনক্ষম না হইলে বিবাহ করিতে পায় না। এইরূপ নানা কারণে পৃথিবীতে যখনই লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হয়, তখনই আবার ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইলে দেশে পরিশ্রমেরও বৃদ্ধি হয়, ও শ্রমের বৃদ্ধিসহকারে ধনেরও বৃদ্ধি হইতে থাকে। অতএব সকল সভ্যসমাজেই তত্রত্য অধিবাসীরা উপযুক্ত আহারাদি পাইয়া যাহাতে সুস্থশরীরে কার্য্যক্ষম থাকিতে পারে এরূপ অনেক আইন নির্দ্ধিষ্ট হইয়া থাকে। লোকসংখ্যা ধনোৎপাদনের কারণ বলিয়া এস্থলে সংক্ষেপে উহার বিষয় বিবেচিত হইল। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠপরিচ্ছেদে বিস্তৃতরূপে ইহার পুনরুল্লেখ করা যাইবেক।

বাষ্পীয় যন্ত্র ব্যবহারাদি যে কোন উপায়ে পরিশ্রমের লাঘব করা যায়, তাহা হইতেই মূলধনের উৎপাদিকাশক্তির ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যন্ত্রাদির সাহায্যব্যতিরেকে যে কার্য্য সম্পাদন করিতে অনেক লোকের প্রয়োজন, যন্ত্রের সাহায্য পাইলে উহা অতি অল্পলোকেই নির্ব্বাহ করিতে পারে।

অতএব বুঝিতে হইবে, যে যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতীত যে মূলধনের দ্বারা যত কার্য্য হইত, যন্ত্রের ব্যবহার করিলে সেই মূলধনের দ্বারা তদপেক্ষা অধিক কার্য্য হইতে পারে। অতএব ইহাকে মূলধনের উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিবার উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে ক্ষতি নাই। আবার মূলধনের বৃদ্ধির সহিত উহার উৎপাদিকাশক্তিরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব কি উপায়ে মূলধনের বৃদ্ধি করা যাইতে পারে নিম্নে তাহার বিচার করা যাইতেছে।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে অধিকপরিমাণে ধনোৎপাদন করিতে হইলে মূলধনের বৃদ্ধি করিতে হয়। কিন্তু মূলধন কিরূপে বাড়ান যাইতে পারে? মূলধন সঞ্চয়ের ফলস্বরূপ, সুতরাং সঞ্চয়ের বৃদ্ধি করিতে পারিলেই মূলধনের বৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু কি উপায়ে আমরা অধিকতর সঞ্চয় করিতে পারি? সঞ্চয়ের দুইটী উদ্দেশ্য, ১ম।—ভবিষ্যতের ভাবনা; ২য়।—সঞ্চিতধনদ্বারা ধনবৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা। এই দুইয়ের অন্যতর অভিপ্রায়েই সঞ্চয় করিতে মানুষের প্রবৃত্তি জন্মে। তন্মধ্যে প্রথম অভিপ্রায়টী দ্বিতীয়টী অপেক্ষা অধিক প্রবল। মানুষের অবস্থা চিরকাল সমান যায় না। অবস্থা রথচক্রের ন্যায় নিরন্তর পরিবর্ত্তমান। যিনি অদ্য ধনী তিনি কালক্রমে দরিদ্র হইতে পারেন, আবার যিনি দরিদ্র তিনিও কালক্রমে বিলক্ষণ সম্পত্তিশালী হইতে পারেন। অতএব বুদ্ধিজীবী জীবমাত্রেই ভবিষ্যতের সুবিধার নিমিত্ত আপন আপন পরিশ্রমের ফল হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া থাকে। ফলতঃ এই দূরদর্শিতা আছে বলিয়াই মনুষ্য ইতর জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাহারা সঞ্চয় করে তাহারা যে ভবিষ্যতে নিজে ব্যবহার করিব বলিয়াই সঞ্চয় করিয়া থাকে এরূপ কখনই বলা যায়না,

কারণ পুত্রপৌত্রাদি সন্তান সন্ততিদিগের ব্যবহারার্থ সঞ্চয় করাও ভবিষ্যদ্ভাবনারই ফল। এরূপ করাও নিতান্ত কর্ত্তব্য, কারণ পৈতৃকধনের কিছুমাত্র সাহায্য না পাইলে লোকে কখনই শীঘ্র উন্নত হইতে পারে না।

মনুষ্যজাতির মধ্যেও সভ্যতার উন্নতিসহকারে ভবিষ্যচ্চিন্তার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অসভ্য বন্যজাতিরা ভুলিয়াও ভবিষ্যতের বিষয় ভাবে না। সুতরাং চিরকাল অতিকষ্টে পশুবৎ কাল কাটাইয়া থাকে। কিন্তু সভ্যসমাজস্থ যাবতীয় ব্যক্তিই ভবিষ্যতের অভাবনিরাকরণ ও লাভজনক বিষয়ে ব্যাপৃত করিয়া অধিকতর ধনোৎপাদন করিবার উদ্দেশে কিছু না কিছু সঞ্চয় করিয়া থাকে। সুতরাং সভ্যসমাজের অধিবাসীমাত্রেই অতি হীন অবস্থা হইতেও আপনাদিগকে উন্নত করিতে সমর্থ হয়।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মূলধন দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন দেশের মূলধন অধিক, কোন দেশের মূলধন অল্প। উপরে সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্তি জন্মাইবার যে দুইটী কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে দ্বিতীয়টীই দেশভেদে মূলধনগত এইরূপ তারতম্যের কারণ। যে দেশে মূলধন প্রয়োগ করিলে অধিক লাভ হইবার সম্ভাবনা, তথায় লোকের সঞ্চয় করিতে অধিক প্রবৃত্তি জন্মে, আর যেখানে ঐ সম্ভাবনা অল্প তথায় সঞ্চয়প্রবৃত্তিও তদনুসারে অল্প হইয়া থাকে। ইংলণ্ডদেশ পৃথিবীর অন্যান্য তাবৎ সভ্যসমাজ অপেক্ষা অধিক ধনশালী। ইহার কারণ এই যে ইংলণ্ডের অধিবাসীরা অন্যান্য স্থানের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা অধিক সঞ্চয় করিয়া থাকে। ইংলণ্ডের মূলধন এত অধিক যে রুসিয়া, তুরুষ্ক, ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি নানাদেশ ইংলণ্ডের নিকট ঋণী। এই কারণেই ইংলণ্ডের সহিত

অন্যান্য দেশের অবস্থাগত অনেক প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের যত মূলধন পৃথিবীর অন্য কোন দেশেরই তত মূলধন নাই। ভারতবর্ষ প্রভৃতি অনেক দেশের ভূমি ইংলণ্ডের ভূমি অপেক্ষা অনেক অধিক, কিন্তু মূলধনের অল্পতাপ্রযুক্ত এই সকল দেশে অধিকপরিমাণে ধনোৎপাদন হয়না। মূলধনের বৃদ্ধি হইলেই কালক্রমে ইহাদের ধনোৎপাদনেরও উন্নতি হইবে। ইংলণ্ডের মূলধন যদিও প্রভূত, কিন্তু ইহার ভূমি ভারতবর্ষের ভূমি অপেক্ষা অনেক অল্প, সুতরাং এখানে আহারসামগ্রী অপেক্ষাকৃত মহার্ঘ, অতএব আহারসামগ্রীর মূল্য কমাইতে পারিলেই ইংলণ্ডে আরও অধিকপরিমাণে ধনোৎপাদন হইতে পারিবে। আবার কোন কোন দেশ এরূপ আছে যে তথায় ভূমি ও মূলধন এই উভয়ের কিছুমাত্র অভাব নাই, কিন্তু পরিশ্রমের অল্পতাপ্রযুক্ত তথায় অধিক পরিমাণে ধনোৎপাদন হইতে পারে না। আমেরিকার নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহে মূলধন ও ভূমি যথেষ্ট আছে, কিন্তু তথাকার অধিবাসীরা এত অলস ও পরিশ্রম করিতে পরাঙ্মুখ, যে তথায় পূর্ব্বোক্ত দুইটী সাধনসত্ত্বেও তাদৃশ ধনোৎপাদন হয় না। সুতরাং এই সকল দ্বীপশ্রেণী যাঁহাদিগের অধিকার, তাঁহারা অন্যান্য দেশ হইতে মজুর লইয়া গিয়া তথায় উহাদিগকে খাটাইয়া ধনোৎপাদনের সুবিধা করিতেছেন। এক্ষণে বোধ হইতেছে, যে ধনোৎপাদনের যে তিনটী সাধন, তাহার মধ্যে যেটীর অভাব সেইটীরই বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা উচিত।

স্বত্বাধিকার আইনদ্বারা রক্ষিত করা মূলধনবর্দ্ধনের আর একটী উপায়। যে ব্যক্তির যে ধনে স্বত্ব, সে যাহাতে নিরাপদে উহা সম্ভোগ করিতে পারে সকল দেশেই এরূপ আইন থাকা কর্ত্তব্য। নতুবা লোকের সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না।

আমি পরিশ্রম করিয়া ধনোপার্জ্জন করিলাম, কিন্তু অপর এক জন তাহা বলপ্রকাশপূর্ব্বক কাড়িয়া লইল, আমি তাহার কিছুই প্রতীকার করিতে পারিলাম না, সুতরাং এরূপ অবস্থায় আমার ধনসঞ্চয় করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? মুসলমানদিগের অধিকারকালে আমাদের দেশের এইরূপ দুর্দ্দশা ছিল। ইংরাজদিগের রাজত্ব হওয়াতে আমরা নিরাপদে আপন আপন পরিশ্রমের ফলভোগ করিতে সক্ষম হইয়াছি। অতএব আমাদিগকে চিরকাল ইংলণ্ডের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিতে হইবে। সুখে ও স্বচ্ছন্দে জীবনধারণ করিতে যে ব্যয়ের আবশ্যকতা, তাহা নিজ নিজ আয় হইতে বাদ দিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হয় তাহাই লোকে সঞ্চয় করিয়া থাকে। সুতরাং সংসার চালাইতে যাহার যেরূপ ব্যয়, তাহার ন্যূনাধিক্য অনুসারে সঞ্চয়েরও ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। সকল দেশের পরিবার সমানরূপে সংঘটিত নহে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে স্ত্রী ও সন্তান লইয়া পরিবার। কিন্তু আমাদের দেশে ভাই, ভগিনী, পিতা, মাতা প্রভৃতি পরমাত্মীয়বর্গ এক সংসারে থাকে, হয় ত একজন ব্যক্তিকে উপার্জ্জন করিয়া উহাদিগের ভরণপোষণ করিতে হয়। অতএব আমাদের দেশের লোকেরা তত অধিক সঞ্চয় করিতে পারে না। কিন্তু ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে পরিবার চালাইতে তত অধিক ব্যয় পড়ে না, কাজেকাজেই সঞ্চয়ও অপেক্ষাকৃত, অধিকপরিমাণে হইয়া থাকে। এতাবতা আমাদের এরূপ বলা উদ্দেশ্য নহে, যে আমরা এরূপ পরিবারবন্ধনচ্ছেদনপূর্ব্বক ইংলণ্ডাদিদেশের ন্যায় পরিবারবন্ধনে প্রবৃত্ত হই। অনেকে এক সংসারে থাকার যদিও কিছু কিছু অসুবিধা আছে, কিন্তু পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে এরূপ পরিবারবন্ধনের সুবিধাও অসংখ্য, অতএব আমাদের মতে, এদেশে পরিবার-

বন্ধনের যেরূপ নিয়ম বহুকাল অবধি প্রচলিত আছে, তাহাই এদেশের পক্ষে মঙ্গলকর, ইহার পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা নাই।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, যে জীবিকানির্ব্বাহের আবশ্যকসামগ্রী সমুদয়ের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে সঞ্চয়েরও হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এরূপ দ্রব্য অনেক আছে যথার্থ বটে, যে উহার মূল্যবৃদ্ধি হইলে, লোকে উহার ব্যবহার কমাইয়া দেয়, অতএব এরূপ দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিদ্বারা সঞ্চয়ের ব্যাঘাত হয় না। মনে কর চিনির বাজার বড়ই গরম হইয়া উঠিল, পূর্ব্বে উহার যে দর ছিল তদপেক্ষা এক্ষণে চারি পাঁচ গুণ বাড়িয়া উঠিল, সুতরাং ব্যবহারোপযোগী চিনি খরিদ করিতে এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা ৪। ৫ গুণ 'অধিক ব্যয় পড়িতে লাগিল। কিন্তু আমরা এমত সময়ে চিনির ব্যবহার কমাইয়া চিনির হিসাবে খরচ পূর্ব্বের ন্যায়ই রাখিতে পারি। এরূপ করিলে আমাদের বিশেষ অসুবিধা কিছুই হয় না, সঞ্চয়েরও ব্যাঘাত হইতে পারে না। এরূপ দ্রব্যের উপর মাসুলবৃদ্ধি করিলে গবর্ণমেন্টেরও অধিক লাভ হয় না, কারণ সকলেই দুর্মূল্য হইলে এই সকল দ্রব্যের ব্যবহার কমাইয়া দেয়। কিন্তু যে সকল দ্রব্য উপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহার না করিলে প্রাণধারণ করা যায়না, এরূপ কোন দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হইলে, উহা ক্রয় করিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় হইতে থাকে, সুতরাং সঞ্চয় করিবার সুবিধাও কমিয়া যায়। চাউলের দরবৃদ্ধি হইলে আমরা কোনরূপেই উহার ব্যবহার কমাইতে পারি না, সুতরাং এরূপস্থলে সঞ্চয়ও কমিয়া যায়। কিন্তু যদি এইরূপ দ্রব্যের মূল্য কমিয়া যায়, তাহা হইলে আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সঞ্চয় করিতে সমর্থ হই। এক্ষণে প্রতিপন্ন হইতেছে, যে চাউল প্রভৃতি অত্যাবশ্যক সামগ্রী সমুদয়ের মূল্য কমিয়া যাইলে দেশের মূলধন

বৃদ্ধি হইতে পারে, মূলধনবৃদ্ধি হইলেই আবার পরিশ্রমের বেতনও বাড়িতে পারে।

বকরায় কারবার করিলে মূলধনের উৎপাদিকাশক্তির বৃদ্ধি হয়, ও মূলধনেরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যেরূপ পরিশ্রম সমবেত হইলে উহার উৎপাদিকাশক্তি বাড়িয়া উঠে, সেইরূপ মূলধন সমবেত হইলেও উহার উৎপাদিকাশক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। যে সকল ব্যবসায়ে অনেক অধিক মূলধনের আবশ্যকতা, সেরূপ ব্যবসায় কখনই একজনের মূলধন-দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না। কাহারও এত অধিক মূলধন নাই যে সে অপরের সাহায্য ব্যতিরেকেও রেলওয়ে ডাক প্রভৃতি মহৎকার্য্য চালাইতে পারে। অতএব এরূপ ব্যবসায় করিতে হইলে বকরায় করিতে হয়, নতুবা কখনই চলে না। কিন্তু এইরূপ ব্যবসায়ে অধিক ধন উৎপন্ন হয়। অতএব ব্যবসায়ের দ্বারা অধিক ধন উৎপন্ন করিতে হইলে মূল-ধনের সমবায় আবশ্যক। তবে সামান্য ব্যবসায়ে এইরূপে মূলধনের সমবায় করিলে উপকার অপেক্ষা অপকারের সম্ভাবনাই অধিক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ অধ্যায়

—০:০:০—

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধনবিস্তৃতি—স্বত্বাধিকার।

প্রথম অধ্যায়ে ধনোৎপাদনের বিষয় সবিস্তরে বিবেচিত হইয়াছে। এক্ষণে কিরূপ নিয়মানুসারে উৎপাদিত ধনের বিভাগ ও বিস্তৃতি সাধিত হইয়া থাকে, তাহা লেখা যাই-তেছে। কিরূপে ও কাহাদিগের মধ্যে ধনের বিভাগ হয়, খাজনা, বেতন ও লাভ কাহাকে বলে, কি কারণে খাজনার হার দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে, কি কারণে ব্যবসায় বা সময়ভেদে বেতনের ভিন্নতা দেখা যায়, কি কারণেই বা লাভের

ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে, এই সমস্ত বিষয় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে পর্য্যালোচনা করাই এই অধ্যায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ধনের বিভাগ বা বিস্তৃতি কিরূপ নিয়মে হইয়া থাকে, এই বিষয় বিচার করিবার পূর্ব্বে, স্বত্ব ও অধিকার কাহাকে কহে তাহার নির্ণয় করা আবশ্যক। বিভাগের পূর্ব্বে ধনের উপর স্বত্ব জন্মিয়া থাকে, ধনের উপর স্বত্ব ও অধিকার না জন্মিলে কিরূপে উহার বিভাগ হইতে পারে? যে দ্রব্যের উপর তোমার স্বত্ব ও অধিকার নাই তাহা তুমি কিরূপে অন্যকে বিভাগ করিয়া দিতে পার? ইহাদ্বারা এই বুঝা যাইতেছে, যে স্বত্বাধিকার বিভাগের নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী। যদি ধনসম্পত্তির উপর লোকের স্বত্ব না থাকিত, অর্থাৎ যদি লোকে কোন দ্রব্য তাহার নিজের, আর কাহার ও নহে, এরূপ বিবেচনা করিতে না পারিত, তাহা হইলে ধনের বিভাগ বা বিস্তৃতি কোনরূপেই হইতে পারিত না। কারণ তাহা হইলে যাহার অধিক বল, সে ইচ্ছা হইলেই হীনবলদিগের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে সমর্থ হইত। অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে, যে বিভাগের পূর্ব্বে ধনের উপর মানুষের স্বত্ব জন্মিয়া থাকে। এক্ষণে স্বত্ব কাহাকে বলে, তাহার নির্ণয় করা আবশ্যক। নিরাপদে ও নির্ব্বিবাদে ধনসম্পত্তি ভোগ দখল করিবার অধিকারকেই স্বত্ব কহে। তোমার দ্রব্য তুমি নিরাপদে ভোগদখল করিতে পার, উহা লইয়া অকারণে কেহই তোমার সহিত বিবাদ করিবেনা, করিলেও তুমি আইনের আশ্রয় লইয়া উহার প্রতীবাদ ও প্রতীকার করিতে পারিবে। কারণ, সকল সমাজের অধিবাসীদিগের স্বত্বাধিকার তত্তৎস্থানের আইন দ্বারা সংরক্ষিত। ইহার কারণ তোমার বিষয়ের উপর তোমার স্বত্ব আছে, আর কাহারও উহা লইয়া অকারণে বিবাদ করিবার অধিকার নাই।

সৃষ্টির আদিমকালে মানবজাতির স্বত্বাধিকারের সংস্কার ছিল না। ভূমি ও ভূমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি সর্ব্বসাধারণেরই সমানরূপে ভোগ্য ছিল। সুতরাং সকলে যদৃচ্ছালব্ধ ফলমূলাদি ভক্ষণ করিয়াই জীবন ধারণ করিত। কালক্রমে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারে জীবনধারণ করা ক্রমশই কষ্টকর হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে পশুচারণ, কৃষি প্রভৃতি কার্য্যে লোকের প্রবৃত্তি জন্মিতে লাগিল, এবং লোকে একটী অবিভক্ত পরিবারের ন্যায় একত্র না থাকিয়া পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করিল। কাজে কাজেই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বা পরিবার ভিন্ন ভিন্ন ভূমিখণ্ড নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে যে যাহা ব্যবহার করিতে লাগিল কালক্রমে তাহাতে তাহার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব জন্মিল। অন্যের তাহাতে আর স্বত্ব রহিল না। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে স্বত্বের সংস্কার সকল সমাজেই এইপ্রকার বদ্ধমূল হইল যে, যে ধনসম্পত্তির স্বত্বাধিকারী, সে ইচ্ছা হইলেই উহা অপরকে দানবিক্রয়াদি করিতে সমর্থ হইল, এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্রপৌত্রাদি নিকট-সম্বন্ধি-ব্যতিরেকে আর কাহারও তাহার বিষয় অধিকার করিবার ক্ষমতা রহিল না। ক্রমে সভ্যতার বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ও সকল সভ্যসমাজেই স্বত্ব-সংরক্ষণের জন্য স্বতন্ত্র আইন সংস্থাপিত হইল। তাতার প্রভৃতি অনেক অর্দ্ধসভ্য দেশে অদ্যাপি ভূমির উপর কাহারও নির্ব্যূঢ় স্বত্ব নাই, তথাকার অধিবাসীরা নিয়ত একস্থানে বাস করে না, তাহাদের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। সুতরাং যে ব্যক্তি যখন যে ভূমিখণ্ড দখল করিয়া আবাদ করে, শস্য উঠিয়া গেলেই ঐ ভূমিখণ্ডে আর তাহার অধিকার থাকে না। তখন অন্যলোকে উহা ব্যবহার করিতে পারে। ফলতঃ এই কারণেই তাতারের অধিবাসীদিগের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই।

এক্ষণে কি কি পদার্থের উপর মানুষের নির্ব্যূঢ় স্বত্ব জন্মিতে পারে, তাহার মীমাংসা করা যাইতেছে। আমরা পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উৎপন্ন করি, ও ঐ উৎপন্ন দ্রব্য হইতে

যাহা কিছু সঞ্চয় করিতে পারি, তাহাতে আমাদের সম্পূর্ণ স্বত্ব আছে। এবিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। কিন্তু কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যে ভূমি কাহারও পরিশ্রমদ্বারা উৎপন্ন হয় নাই। অতএব ভূমিতে কাহারও নির্ব্যূঢ় স্বত্ব থাকা যুক্তি-সিদ্ধ নহে। তবে যে পরিশ্রম করিয়া কোন ভূমিখণ্ডের আবাদ করিয়াছে, ফসল লওয়া পর্য্যন্তই তাহার উহাতে অধিকার থাকা উচিত। ফসল উঠিয়া গেলে উহা আবার সাধারণের সম্পত্তি হইতে পারে। বিস্তীর্ণরূপে এবিষয়ের বিচার করা এই ক্ষুদ্র পুস্তকের সাধ্য নহে। এই সকল প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর হওয়াও অসম্ভব। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, ভূমিকে ব্যবহারোপযোগিনী করিতে হইলে আমাদের প্রভূত পরিশ্রম লাগিয়া থাকে। পরিশ্রম না করিলে ভূমির ফলভোগ করা অসম্ভব, কোন ভূমিখণ্ডকে ব্যবহারের উপযুক্ত করিতে হইলে আমাদের যত পরিশ্রম করিতে হয়, একবারমাত্র উহার ফলভোগ করিয়া উহা হইতে বঞ্চিত হইতে হইলে আমাদের পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার হয় না। সুতরাং এই সকল অসুবিধানিবারণের নিমিত্ত সকল সমাজেই অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় ভূমির উপরও নির্ব্যূঢ় স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এরূপ নিয়ম না থাকিলে সমাজের বন্ধন অত্যন্ত শিথিল হইত ও সভ্যতা এবং সুখস্বচ্ছন্দের বৃদ্ধি হইতে পারিতনা।

উত্তরাধিকার, দান ও বিক্রয় প্রভৃতি নানাপ্রকারে ধন-সম্পত্তির উপর লোকের স্বত্বোৎপত্তি হয়। কিন্তু এই তিনটীই অপেক্ষাকৃত সমধিক প্রচলিত। কোন ব্যক্তি মৃত্যুকালে যদি দানাদিদ্বারা আপন বিষয়ের কোন বন্দোবস্ত না করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্রপৌত্রাদি

ও তাহাদের অভাবে অন্যান্য নিকট জ্ঞাতিকুটুম্ব উহার সম্পত্তির অধিকারী হয়। এরূপ হওয়াও বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত, কারণ যদিও মৃত্যুর পর সম্পত্তির উপর ঐ মৃতব্যক্তির কিছুমাত্র অধিকার থাকে না, তথাপি যাহার সম্পত্তি তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্রাদি থাকিতে অপরে কেন উহা অধিকার করিবে, সেই ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিলে যাহারা তাহার সম্পত্তি ব্যবহার করিতে পাইত উহার মৃত্যু হইলেও তাহাদেরই উহা ব্যবহার করা উচিত। আপন সম্পত্তি দানবিক্রয় করিতে সকলেরই সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে, অতএব এবিষয়ে কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই।

যাহার যে বিষয়ে স্বত্ব আছে, তাহাতে তাহার সম্পূর্ণ অধিকার; অপর কেহ বিনাকারণে তাহা হইতে কিছুমাত্র সাহায্য পাইতে পারে না। এই নিয়মের কার্য্যবশতই সকলের সমান অবস্থা হইতে পারে না। এই কারণ বশতঃ কেহ ধনী কেহ বা দরিদ্র হয়। ফলতঃ কেহ ধনী কেহ দরিদ্র ইহা যে সমাজের দোষে হইয়া থাকে, এরূপ বলা কেবল ভ্রান্তির কার্য্য। উক্ত নিয়মের অনিবার্য্য ফলস্বরূপ কেহ ধনী কেহ বা দরিদ্র হইয়া থাকে। যাহারা বুদ্ধিমান, সুশিক্ষিত সুস্থশরীর ও পরিশ্রমী তাহারা অল্পবুদ্ধি অশিক্ষিত রুগ্ন বা অলস ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করিতে পারে। সকল প্রকার ব্যবসায়ের উপার্জ্জন সমান নহে। কোন ব্যবসায়ে অধিক উপার্জ্জন হয়, আবার কোন ব্যবসায়ে অপেক্ষাকৃত অল্প উপার্জ্জন হইয়া থাকে। সুতরাং এই সকল কারণে উপার্জ্জনের তারতম্য দৃষ্ট হয়। আবার যে পরিমিতব্যয়ী ও দূরদর্শী সে অপরিমিতব্যয়ী ও অদূরদর্শীদিগের অপেক্ষা অধিক সঞ্চয় করিতে পারে। যাহারা অধিক উপার্জ্জন করে ও অধিক সঞ্চয় করিতে পারে, তাহারা শীঘ্রই ধনী হইয়া উঠে, আবার যাহারা তাহা না পারে তাহারা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র হইয়া পড়ে। এই রূপেই কেহ ধনী কেহ বা দরিদ্র হয়। ফলতঃ প্রাকৃতিক নিয়মেই এরূপ ঘটনা হইয়া থাকে, ইহাতে সমাজের কিছুমাত্র দোষ নাই।

ভাবিয়া দেখ, পৃথিবীর আদিম কালে সকলেরই সমান অবস্থা ছিল, পৃথিবীর অক্ষয় ভাণ্ডার সকলেরই সমানরূপ অধিকারে ছিল, তবে কেন কালসহকারে কেহ ধনী ও কেহ দরিদ্র হইল? ইহার কারণ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ যে যেরূপ পরিশ্রম ও বুদ্ধিব্যয় করিয়াছে, তাহার ভাগ্যে সেই প্রকার ফল ফলিয়াছে, কেহ ধনী কেহ বা দরিদ্র হইয়াছে।

অনেকে দরিদ্রদিগের দুঃখদর্শনে দুঃখিত হইয়া বলিয়া থাকেন, দেশে যত ধন মজুত আছে ও প্রতিবৎসর যাহা উৎপন্ন হইতেছে তৎসমুদয় একত্র করিয়া ধনী ও দরিদ্র সকলেরই মধ্যে সমানরূপে বিভাগ করিয়া দেওয়া উচিত। তাহা হইলে সকলেরই অবস্থা সমান হইয়া যায়, কেহ আর দরিদ্র থাকে না। সকলেই সমানসুখে কালযাপন করিতে পারে। কিন্তু ইহা মনে করা নিতান্ত ভ্রম, কারণ এরূপ করিলে দরিদ্রদিগের অবস্থা উন্নত না হইয়া বরং তাহাদের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুরবস্থা হয়। পূর্ব্বে যে প্রকার জীবিকানির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত সকলকেই পরিশ্রম করিতে হইত, এখনও তাহাই হয়, কিন্তু মূলধনের অল্পতাহেতুক এখনকার শ্রম পূর্ব্বের ন্যায় ফলোপধায়ক হয় না। আর যদিও এইপ্রকার বিভাগ করিয়া দিলে আপাততঃ দরিদ্রদিগের কিছু কিছু সুবিধা হয়, কিন্তু যাহারা নিজের পরিশ্রম ও বুদ্ধির বলে ধনোপার্জ্জনপূর্ব্বক ধনী হইয়াছিল ও যাহাদের ধন একণে সমানরূপে ভাগ করা হইয়াছে, তাহারা কিছুকাল কষ্ট সহ্য করিয়া কালক্রমে আবার ধনী হইয়া উঠে। যাহারা ধনের ব্যবহার জানে, তাহারা যেরূপ অবস্থায় পড়ুক না কেন, কালক্রমে আপনাদের অবস্থা উন্নত করিতে সমর্থ হয়, আর যাহারা ধনের প্রকৃত ব্যবহার জানে না, তাহাদিগকে হাজার ধন দেও, তাহারা কখনই বড় মানুষ হইবে না। একণে বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে, যে দরিদ্রদিগের দুঃখমোচন করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে কখনই কৃতকার্য্য হওয়া যায় না, বরং দেশে ধনীর সংখ্যা অধিক হইলেই দরিদ্রদিগের দুঃখ দূর হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। দেখ ধনী ব্যক্তিরা কেবল আপন আপন কার্য্যসাধনার্থ, যতই কেন ধনব্যয় করুক না, তাহাদিগকে কোন না কোন প্রকারে দরিদ্রদিগের সাহায্য করিতেই

হয়। নিতান্ত স্বার্থপরায়ণ ধনীরাও ভৃত্য কৃষক ও ব্যবসায়ীদিগকে বেতনস্বরূপে আপন আপন ধনের অংশ দিয়া থাকে, কৃপণেরাও সুদের লোভে কৃষক প্রভৃতি ব্যক্তিদিগকে কর্জ্জ দিয়া থাকে। সুতরাং ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে ধনীরা ইচ্ছা না থাকিলেও দরিদ্রদিগের সাহায্য করিতে পাকতঃ আপনাদিগের ধনব্যয় করিয়া থাকে। এখন বিবেচনা কর ধনী না থাকিলে দেশের কত কষ্ট হইতে পারে।

ধনের উৎপত্তি যেরূপ নিয়মে হইয়া থাকে, ইহার বিভাগ সেরূপ নিয়মের অধীন নহে। ধনোৎপত্তি অনেক অংশে প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তী। যে ভূমির যেরূপ উৎপাদিকা শক্তি তাহাতে তদুপযুক্ত উৎপত্তি হয়। পণ্যদ্রব্য সমুদায় যেরূপ উপকরণসামগ্রীদ্বারা প্রস্তুত হয়, তদ্ভাবতের দোষ-গুণ অনুসারে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। সুতরাং স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে, যে ধনের উৎপত্তি অনেক অংশে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। কিন্তু ধনের বিস্তৃতি বা বিভাগ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন নহে, ইহা সম্পূর্ণরূপে মানুষের ইচ্ছাধীন। আমরা যেরূপে ইচ্ছা করি উৎপন্ন ধনের বিভাগ করিতে পারি। তবে যেরূপ নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক ধনের বিভাগ করিলে যেরূপ ফল হইয়া থাকে, তাহার নির্ণয় করাই ধনবিজ্ঞানশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। কোন কোন দেশে প্রতিযোগিতা অনুসারে ধনের বিভাগ হইয়া থাকে। কোথাওবা চিরাগত প্রথাই ইহার নিয়া-মক। ইংলণ্ডে প্রতিযোগিতা অনুসারে খাজনার হার নির্ণয় হইয়া থাকে, তথায় এক খণ্ড ভূমি যে হারে খাজনা দিয়া এক জন কৃষক চাষ করিতেছে, তাহার নির্দ্ধারিত সময় অতীত হইলে যদি অন্য কোন কৃষক ঐ জমি অধিক খাজনা দিয়া লইতে রাজী হয়, তাহা হইলে উহা তাহাকেই দেওয়া

হয়। কোথাও বা চিরাগত প্রথা অনুসারে খাজনার হার নির্ণয় হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও এক্ষণে প্রতিযোগিতা অনুসারে খাজনার হার নির্ণয় হইবার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। আবার এদেশের কোন কোন পল্লী গ্রামে কোন কোন ব্যবসায়ের বেতন অদ্যাপি চিরন্তন প্রথা অনুসারে প্রদত্ত হয়। অনেক পল্লীগ্রামের নাপিতেরা তাহাদের পরিশ্রমের বেতনস্বরূপ কিছু কিছুমাত্র বার্ষিক পাইয়া থাকে। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইল, যে ধনের বিভাগ সম্পূর্ণরূপে মানব নিয়মের অনুবর্ত্তী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ধনবিস্তৃতি।

কিরূপে, ও কাহাদিগের মধ্যে উৎপন্ন ধনের বিভাগ হইয়া থাকে?

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে ধনোৎপাদনের তিনটী সাধন। প্রাকৃতিক সাধন অর্থাৎ ভূমি, পরিশ্রম ও মূলধন। ধনোৎপাদন করিতে হইলে ভূমি, পরিশ্রম ও মূলধনের প্রয়োজন। এই তিনটীর সমবায় ব্যতিরেকে কখনই ধনোৎপাদন হইতে পারেনা। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে যাহারা ভূমি, পরিশ্রম ও মূলধনের অধিকারী, উৎপন্ন ধন তাহাদিগেরই মধ্যে বিভক্ত হওয়া উচিত। কার্য্যেও ঠিক তাহাই ঘটিয়া থাকে। উৎপন্ন ধনের যে অংশ ভূম্যধিকারীকে দেওয়া যায়, তাহার নাম খাজনা বা কর। যে অংশ শ্রমিককে দেওয়া যায়

তাহার নাম বেতন। আর যে অংশ মূলধনের অধিকারীকে দেওয়া যায় তাহাকে লাভ কহিয়া থাকে। কিরূপ নিয়মানুসারে উৎপন্ন ধনের বিভাগ হইয়া থাকে, কি কারণেই বা খাজনা বেতন ও লাভের তারতম্য হইয়া থাকে, এক্ষণে তৎসমুদায় নির্ণয় করা যাইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে বা ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ে খাজনা বেতন ও লাভের পরিমাণের প্রভেদ হইয়া থাকে। ইংলণ্ডদেশে খাজনার হার অষ্ট্রেলিয়াদ্বীপের খাজনার হারের অপেক্ষা অনেক উচ্চ, কিন্তু ইংলণ্ডে পরিশ্রমের বেতন অষ্ট্রেলিয়ার বেতনের হার অপেক্ষা অনেক অল্প। আবার অষ্ট্রেলিয়ায় ইংলণ্ড অপেক্ষা অধিক লাভ হইয়া থাকে।

ভূমি, পরিশ্রম ও মূলধন এই তিন সাধনের সাহায্যে ধন উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই নিমিত্তই খাজনা, বেতন ও লাভ এই তিন আকারে ঐ উৎপন্ন ধনের বিভাগ হয়। এতাবতা এরূপ কখনই বলা যায়না, যে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে উৎপন্ন ধন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিভক্ত হয়। অর্থাৎ ভূম্যধিকারী, পরিশ্রমী ও মূলধনী সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। কারণ উৎপাদনকার্য্যে যেরূপ একজন আপন ভূমি, আর একজন পরিশ্রম, ও অপর এক ব্যক্তি মূলধন দিতে পারে, সেইরূপ একজন ভূমি ও মূলধন, ভূমি ও পরিশ্রম বা পরিশ্রম ও মূলধন তিনটীর মধ্যে দুইটী দিতে পারে, আবার কোথাও বা এক ব্যক্তিই ভূমি, মূলধন ও পরিশ্রম তিনটীই নিজে যোগাইয়া ধনোৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, যে উৎপাদনকার্য্যে যদি পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি সাহায্য করিয়া থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি যে যে সাধন দিয়া সাহায্য করিয়াছে, সে তদনুসারে উৎপন্ন

ধনের অংশ পাইয়া থাকে। যদি কেহ কেবল ভূমি দিয়া থাকে, তাহা হইলে সে খাজনা ভিন্ন আর কোন অংশই পায়না। যদি কেহ ভূমি ও মূলধন দুই দিয়া থাকে, তাহা হইলে সে খাজনা ও লাভ এই দুই অংশ পায়, যদি কেহ ভূমি ও পরিশ্রম দিয়া থাকে, তাহা হইলে সে বেতন ও খাজনা এই দুইটী পায়, যদি কেহ পরিশ্রম ও মূলধন দিয়া থাকে তাহা হইলে সে বেতন ও লাভ পাইয়া থাকে, আবার যদি কেহ ভূমি পরিশ্রম ও মূলধন তিনটীই দিয়া থাকে, তাহা হইলে সে খাজনা, বেতন, ও লাভ এই তিনটীরই অধিকারী হয়। কিন্তু সকল স্থলেই খাজনা, বেতন, ও লাভ এই তিনরূপে হিসাব করিয়া উৎপন্ন ধনের বিভাগ করা উচিত। যদি একজনই ভূমি, পরিশ্রম ও মূলধন তিনটী সাধনই দিয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহার সমুদয় উৎপন্ন ধন খাজনা বেতন ও লাভ এই তিন রূপে হিসাব করিয়া লওয়া উচিত। যদি কোন ব্যক্তি তাহার নিজের ভূমিতে নিজে ধনব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া চাস করে, তাহা হইলে ঐ ভূমি হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন হইবে, তৎসমুদয়ই তাহার নিজস্ব হইবে, উহা হইতে কাহাকেও অংশ দিতে হইবে না ইহা যথার্থ বটে, কিন্তু এখানেও ঐ ব্যক্তির হিসাব করা উচিত, যে সে খাজনাস্বরূপে কি পাইতেছে, বেতনস্বরূপে কি পাইতেছে ও লাভস্বরূপেই বা কি পাইতেছে, কারণ এরূপ হিসাব করিলে সে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে যে তাহার কত ভূমিতে কত পরিশ্রম ও কত ধনব্যয় করিয়া কি লাভ হইতেছে।

ইংলণ্ডদেশে ভূমির অধিকারীরা স্বতন্ত্র, পরিশ্রমীরা স্বতন্ত্র ও মূলধনের অধিকারীরাও স্বতন্ত্র। অর্থাৎ উৎপাদনকার্য্যে একজন ভূমি, একজন পরিশ্রম ও অপর একজন মূলধন দিয়া থাকে।

যাহারা ভূমি দিয়া থাকে তাহারা আর কিছুই দেয় না, তাহাদিগকে ভূম্যধিকারী কহে, সুতরাং উৎপন্ন ধন হইতে উহারা কেবল এক অংশ অর্থাৎ খাজনামাত্র পাইয়া থাকে। যাহারা পরিশ্রমী তাহাদের জমি বা মূলধন নাই, সুতরাং ইহারা কেবল আপন আপন পরিশ্রমের বেতন পাইয়া থাকে। আবার যাহারা মূলধনের অধিকারী তাহাদের ভূমি নাই, আর তাহারা পরিশ্রম ও করে না, সুতরাং তাহারা লাভ ভিন্ন আর কোন অংশই পায়না। কিন্তু অন্যান্য অনেক দেশে এরূপ প্রথা নাই। ফ্রান্সের দক্ষিণাংশে ও ইটালীদেশে অনেক কৃষক আছে, তাহারা নিজের জমিতে নিজে পরিশ্রম ও ধনব্যয় করিয়া চাষ করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে একজনই ভূম্যাধিকারী, ধনী ও পরিশ্রমী, সুতরাং একব্যক্তিই খাজনা বেতন ও লাভ তিনেরই অধিকারী। এইরূপ অবস্থায়, অর্থাৎ যদি কৃষক ভূমির অধিকারী হয়, ও আপনিই কৃষিকার্য্যে পরিশ্রম করে তাহা হইলে, কৃষিকার্য্যের সুবিধা হয় বটে, কারণ ভূমি কৃষকের নিজস্ব বলিয়া সে উহাতে প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকে, কিন্তু ভূম্যধিকারী কৃষকের কখনই অধিকপরিমাণে ভূমি থাকেনা। সুতরাং তাহাতে কল দিয়া কোন কার্য্য করা যায় না, কাজেই অধিক উৎপত্তি ও লাভও হয়না। পক্ষান্তরে ভিন্ন ভিন্ন ভূম্যধিকারীর নিকট খাজনা করিয়া যদি এক বন্দে অধিক ভূমির আবাদ করা হয়, তাহা হইলে তাহাতে কলে কার্য্য চালাইতে পারা যায়, সুতরাং অপেক্ষাকৃত অধিক উৎপত্তি ও লাভ হইতে পারে। এই উপায় দ্বারাই ইংলণ্ডে কৃষিকার্য্যের এতদূর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, নতুবা যৎকালে তথায় নিষ্কর ভূমির প্রথা ছিল ও কৃষকেরা ভূম্যধিকারী ছিল, তখন অপেক্ষা এক্ষণে কি প্রকারে কৃষিকার্য্যের এত উন্নতি হইবে?

আমাদের দেশে সামান্যতঃ গবর্ণমেণ্ট ও জমিদারেরা ভূমির স্বত্বাধিকারী। প্রজারা গবর্ণমেণ্ট বা জমিদারদিগের নিকট হইতে খাজনা করিয়া জমি লইয়া থাকে। অতএব গবর্ণমেণ্ট বা জমিদারেরা উৎপন্ন ধন হইতে কেবল খাজনা পাইয়া থাকেন। জমির পাট্টা লইয়া কেহ বা কেবল মূলধন ব্যয় করিয়া থাকে, আর অন্য লোককে পরিশ্রমের বেতন দিয়া খাটাইয়া লয়। এরূপ স্থলে জমিদার বা গবর্ণমেণ্ট খাজনা পান, পাট্টাদার কেবল লাভমাত্র পায়, আর শ্রমীরা বেতন পাইয়া থাকে। এদেশে কয়েক প্রকারের নিষ্কর ভূমি আছে, এই সকল ভূমির অধিকারীরা প্রায় নিজ নিজ মূলধন ব্যয় করিয়া অন্যের পরিশ্রমের সাহায্যে ধনোৎপাদন করিয়া থাকে, অতএব এরূপ স্থলে ভূম্যধিকারী খাজনা ও লাভ পাইয়া থাকে, বেতন অন্য লোককে দিতে হয়। আবার কোথাও কোথাও চাষাদিগেরও নিষ্কর ভূমি আছে। তাহারা নিজে পরিশ্রম ও মূলধনব্যয় করিয়া চাষ করিয়া থাকে, আর ভূমিও তাহাদেরই সম্পত্তি, অতএব এরূপস্থলে একব্যক্তিই খাজনা, বেতন ও লাভ তিনই পাইতেছে।

এক্ষণে এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে আমরা যে সকল নিয়মের উল্লেখ ও প্রমাণ করিয়াছি, তৎসমুদয় কেবল কৃষিজ দ্রব্যের বিষয়েই খাটিয়া থাকে, অন্যান্য প্রকারে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় তত্তাবতের বিষয় স্বতন্ত্র নিয়মের কার্য্যকারিতা। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই এরূপ সন্দেহের নিরাকরণ হইতে পারে। কৃষিজ দ্রব্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া আমরা উদাহরণ দিয়াছি এই মাত্র, নতুবা সকল প্রকার ধনোৎপাদনের বিষয়ই একরূপ নিয়মের অধীন। সকল প্রকার উৎপন্ন দ্রব্যই সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে ভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ধান্য প্রভৃতি কৃষিজ দ্রব্য, পশম প্রভৃতি পশ্বাদ্রব্য ও খনিজ এবং আকরিক প্রভৃতি যাবৎ দ্রব্যই ভূমি হইতে উৎপন্ন। অতএব ইহাদের সকলেরই উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও বিনিময় এক নিয়মের অধীন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ধনবিস্তৃতি।

খাজনা।

ভূমি ধনোৎপাদনের প্রথম সাধন। ভূমি না থাকিলে পরিশ্রম করার সম্ভাবনা থাকিত না। মূলধনও ভূমি ও পরিশ্রমের ফল, ভূমি না থাকিলে মূলধনও থাকিত না। অতএব অপরের ভূমি ব্যবহার করিতে হইলে তাহাকে ঐ ব্যবহারের পরিবর্ত্তে কিছু দেওয়া উচিত ও যুক্তিসিদ্ধ। নতুবা অন্যে তোমাকে ভূমি ব্যবহার করিতে দিবে কেন? যেরূপ লোকে সুদ পাইবার আশয়ে টাকা ধার দিয়া থাকে, সেইরূপ খাজনা পাইবার আশয়েই লোকে নিজের ভূমি অপরকে ব্যবহার করিতে দেয়। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, যে জমির ব্যবহার করিয়া ঐ ব্যবহারের পরিবর্ত্তে ভূম্যধিকারীকে যাহা দেওয়া যায় তাহারই নাম খাজনা।

খাজনার হার দুই প্রকারে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। প্রতিযোগিতা ও চিরন্তন প্রথা। আমি যে ভূমি বাৎসরিক ১ টাকা খাজনা দিয়া পাট্টা লইয়াছি, তুমি তাহা বাৎসরিক ২ টাকা খাজনা দিয়া লইতে পার, সুতরাং এরূপ স্থলে ভূম্যধিকারী আমার পাট্টার নিয়মিত সময় অতীত হইলেই আমাকে আর পাট্টা না দিয়া ২ টাকা খাজনার হারে তোমাকে পাট্টা দিয়া থাকেন। এক্ষণে সভ্য সমাজমাত্রেই প্রায় এই নিয়মে খাজনা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। দেশে যত ভূমি আছে তথায় তাহা অপেক্ষা গ্রাহকসংখ্যার রৃদ্ধি হওয়াতেই এই প্রকার খাজনার নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নতুবা কখনই ওরূপ হইত না। আমেরিকার নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহের ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা, কিন্তু তথায় অধিবাসীর সংখ্যা অতি অল্প, সুতরাং সেই সকল স্থানে বিনা খাজনায় যত ইচ্ছা

ভূমি পাওয়া যাইতে পারে। ইহার কারণ এই যে, তথায় ভূমির গ্রাহক নাই। আবার কালক্রমে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইলে সেই সকল স্থানের ভূমি ও দুর্মূল্য হইয়া উঠিবে এবং গ্রাহকবর্গের প্রতিযোগিতা অনুসারে খাজনার হার নির্দ্ধারিত হইতে আরম্ভ হইবে। এক্ষণে ইংলণ্ড ভারতবর্ষ প্রভৃতি অনেক দেশে এই নিয়মে খাজনার হার নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। কোন কোন দেশে গ্রাহকদিগের প্রতিযোগিতা অনুসারে খাজনার হার নির্দ্ধারিত না হইয়া, চিরাগত প্রথা অনুসারে হইয়া থাকে। ইটালীর অন্তর্গত অনেক প্রদেশে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত। কিছু দিন পূর্ব্বে ইউরোপের অধিকাংশেই এই নিয়ম অনুসারে খাজনা নির্দ্ধারিত হইত। এই সকল স্থানের কৃষকেরা কিছু কাল পূর্ব্বে ভূমি হইতে উৎপন্ন ফসলের অর্দ্ধাংশ ভূম্যধিকারীকে খাজনাস্বরূপ দিত, আর অর্দ্ধাংশ আপনারা ব্যবহার করিত। এক্ষণে কোথাও বা উৎপন্ন দ্রব্যের তৃতীয়াংশ কোথাও বা চতুর্থাংশ খাজনা বলিয়া ভূম্যধিকারীকে প্রদত্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সকল স্থানে খাজনার হার চিরাগত প্রথা অনুসারে নির্দ্ধারিত আছে। গ্রাহকসংখ্যার বৃদ্ধি হওয়াতে প্রতিযোগিতাদ্বারা এ সকল স্থানে খাজনার হারের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। অতি প্রাচীনকালে যখন আমাদের দেশে হিন্দুরাজাদিগের রাজত্ব ছিল, তৎকালে আমাদের দেশেও খাজনার হার চিরন্তন প্রথা অনুসারে নির্দ্ধারিত ছিল। তখন ভূমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশ, করস্বরূপে রাজসরকারে দাখিল করিতে হইত। হিন্দুরাজত্বের পর যবনদিগের রাজত্বকালেও রাজারাই ভূমির স্বত্বাধিকারী ছিলেন। ইঁহাদিগের সময়েও খাজনার হার নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাহার পর ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ হইতে কিছু কাল কোম্পানি নিজেই সমুদয় ভূমির স্বত্বাধিকারী ছিলেন, জমিদারেরা কেবল করসংগ্রহ করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত ছিল, পরে দশশালা বন্দোবস্ত সংস্থাপিত হইবার পর জমিদারেরা প্রকৃত ভূম্যধিকারী হয়েন, ও ক্রমশঃ গ্রাহকদিগের প্রতিযোগিতা অনুসারে ভূমির খাজনা নির্দ্ধারিত হইতে আরম্ভ হয়। বস্তুতঃ পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে রাজা বা প্রজা কে ভূমির প্রকৃত স্বত্বাধিকারী ছিলেন এক্ষণে তাহা স্পষ্টরূপে নিশ্চয় করা

যায় না, এই জন্যই দশশালা বন্দোবস্ত প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে এই বিষয় লইয়া অনেক বাদানুবাদ ও মতভেদ হইয়াছিল।

অনেকে বলিয়া থাকেন, যে ভূমি হইতে আমাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের উপযোগী তাবৎ সামগ্রীই উৎপন্ন হয় বলিয়াই ভূমির খাজনা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা ভ্রান্তিমূলক। জীবিকা-নির্ব্বাহের আবশ্যক সকল সামগ্রীরই যদি মূল্য থাকিত, তাহা-হইলে বায়ু ও সূর্য্যের উত্তাপও মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইত, কারণ আহারসামগ্রীর ন্যায় ইহাদিগেরও জীবনরক্ষার বিষয়ে বিশেষ উপযোগিতা আছে। কিন্তু এই দুইটী দ্রব্য কেহই মূল্য দিয়া ক্রয় করেনা, সকলেই বিনামূল্যে পাইয়া থাকে। যে সকল দেশের লোকসংখ্যা অতি অল্প ও ভূমি অনেক, তথায় বিনা খাজনায় যথেষ্ট ভূমি পাওয়া গিয়া থাকে। তথাকার ভূমি বিলক্ষণ উর্ব্বরা হইতেও পারে, কিন্তু তথাপি তথায় খাজনা দিয়া ভূমি লইতে হয় না। ইহাদ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে ভূমি হইতে আমাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সমুদয় উৎপন্ন হয় বলিয়াই যে উহার খাজনা হয়, এরূপ নহে। খাজনা হইবার অন্য কারণ আছে। কিন্তু সেই কারণটী কি? কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে ভূমির অধিকার এক প্রকার একচেটিয়া। যে দ্রব্য যাহার একচেটিয়া আছে, সে আপন ইচ্ছানুসারে তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারে, আর যদি সেই একচেটিয়া দ্রব্যটী সাধারণের প্রয়োজনীয় হয়, তাহা-হইলে ঐ দ্রব্যাধিকারী উহার যে মূল্য চাহিবে, সকলকেই অগত্যা সেই মূল্য দিয়াই উহা লইতে হইবে, কারণ উহা ঐ ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহারও নিকট পাওয়া যাইবেনা, অথচ ঐ দ্রব্য ব্যতিরেকেও কখন চলিতে পারিবেনা। জমির পক্ষেও ঠিক এই রূপ।

বায়ু ও উত্তাপের ন্যায় জমি সাধারণের অধিকারে নাই। ইহা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট লোকের হস্তগত। অতএব যাহার জমি নাই, তাহার উহা প্রয়োজন হইলে ঐ নির্দ্দিষ্ট ভূম্যধিকারীদিগের মধ্যে কাহারও না কাহারও নিকট হইতে লইতে হয়। কিন্তু জমির প্রয়োজন নাই এমন লোকই নাই। সকল লোকেরই জমির প্রয়োজন, জমি না থাকিলে কাহারও চলে না। জমির উৎপন্ন দ্রব্য হইতে জীবিকানির্ব্বাহপূর্ব্বক লাভ করা সকলেরই ইচ্ছা। অতএব সকলেরই জমির প্রয়োজন, এমন কি প্রায় সকল সভ্যসমাজেই লোকসংখ্যার এত বৃদ্ধি হইয়াছে, যে জমির পরিমাণ অপেক্ষা উহার গ্রাহকসংখ্যা অনেক অধিক হইয়া উঠিয়াছে। সকল দেশেই ভূম্যধিকারীর সংখ্যা অপেক্ষা প্রজার সংখ্যা অধিক। এই জন্যই জমি বিনা খাজনায় পাওয়া যায়না। যাহার প্রয়োজন হয় তাহাকেই ঐ ভূম্যধিকারীদিগের নিকট লইতে হয়। গ্রাহকদিগের উহাতে প্রয়োজন আছে বলিয়া জমিদারেরা উহাদিগের নিকট খাজনা লইয়া থাকেন। যদি এক ব্যক্তি পৃথিবীর তাবৎ জমির অধিকারী হইত, তাহা হইলে সে যে জমির যে খাজনা চাহিত তাহাই দিয়া গ্রাহকদিগকে জমি লইতে হইত। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, যে দুর্ল্লভতা ও প্রয়োজনীয়তা এই দুইটী কারণের সমবায়েই জমির খাজনা হইয়া থাকে। নতুবা কেবল উৎপাদিকা শক্তি আছে বলিয়া জমির খাজনা হয়, এরূপ বলা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। ফলতঃ দুর্ল্লভতা ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে যে কেবল জমিরই খাজনা নির্দ্ধারিত হয় এরূপ নহে, এই দুই কারণের সমবায়েই তাবৎ পদার্থের মূল্য হইয়া থাকে। যে পদার্থ দুর্ল্লভ অথচ প্রয়োজনীয় তাহাই আমরা মূল্য দিয়া লইয়া থাকি। যে দ্রব্যের কেবল দুর্ল্লভতা আছে, কিন্তু

প্রয়োজনীয়তা নাই, তাহার কিছুই মূল্য হইতে পারেনা, কারণ যে দ্রব্যে আমাদের প্রয়োজন নাই, তাহা লইয়া আমরা কি করিব? আবার যে দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা থাকে, কিন্তু যাহা দুর্লভ নহে তাহারও মূল্য হয়না। কারণ যে দ্রব্য অমনিই পাওয়া যায়, তাহার জন্য কেন আমরা মূল্য দিব? সূর্য্যের কিরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ, কিন্তু দুর্লভ নহে বলিয়া ইহার কিছুই মূল্য নাই। আবার এই দুর্লভতা ও প্রয়োজনীয়তার হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে খাজনা ও মূল্যেরও হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। আমেরিকার নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহের জমি বিনা খাজনায় পাইতে পারা যায়, কিন্তু ইহাদিগের বিলক্ষণ উৎপাদিকা-শক্তি আছে। ইহার কারণ এই যে তথাকার জমি এত অধিক ও লোকসংখ্যা এত অল্প যে তথায় জমির গ্রাহক হয়না। যদি অন্যদেশের লোক তথায় গিয়া চাষ করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে ফশল যথেষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু ঐ ফশল ব্যবহারের স্থানে আনিতে এত ব্যয় হয়, যে উহাতে কিছুই লাভ না হইয়া বরং লোকসান হইতে পারে। অতএব বোধ হইতেছে যে তত্রত্য জমি সমূহের প্রয়োজনীয়তা নাই, কাজেকাজেই খাজনা ও হয়না। তবে যখন ঐ সকল স্থানের লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি হইবে, তখন ঐ সকল জমি প্রয়োজনীয় হইয়া খাজনার উপযুক্ত হইয়া উঠিবে। আরবদেশের মরুভূমিও বিনা খাজনায় পাওয়া যায়। তাহার কারণ এই যে ঐ সকল জমি মরু, উহাতে কিছুই উৎপন্ন হয়না, সুতরাং উহার কিছুমাত্র প্রয়োজনীয়তা নাই। আমাদের দেশে সুন্দরবন অঞ্চলে এক্ষণে আবাদ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু যখন আবাদ আরম্ভ হয় নাই, সর্ব্বত্রই গহনবনে আচ্ছন্ন ছিল, তখন তথাকার জমির খাজনা ছিলনা, নিষ্কর পাওয়া যাইত।

আবাদ আরম্ভ হওয়াতে তথায় মধ্যে মধ্যে লোকের বসতি হইয়াছে, ও ক্রমশঃ আরও লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে। সুতরাং এক্ষণে তত্রত্য জমির বিঘা-করা এক আনা দুই আনা করিয়া কর নির্দ্ধারিত হইয়াছে, আবার লোকসংখ্যার যতই বৃদ্ধি হইবে ততই খাজনার হার আরও বাড়িতে থাকিবে।

জমির উৎপাদিকাশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে খাজনার তারতম্য হইয়া থাকে, সকলেই অবগত আছেন। উর্ব্বরতা-গুণের বৃদ্ধি হইলে খাজনা বাড়িতে পারে, আবার উহা কমিয়া গেলে খাজনাও কমিয়া যাইতে পারে। আবার দুইখণ্ড জমির মধ্যে যেটী অপেক্ষাকৃত অধিক উর্ব্বরা, তাহার খাজনাও অপেক্ষাকৃত অধিক, আর যেটী অল্প উর্ব্বরা তাহার খাজনাও অপেক্ষাকৃত অল্প, একথাটীও যথার্থ। কিন্তু জমির উর্ব্বরত্বই যে খাজনার একমাত্র নিয়ামক এরূপ নহে। জমি যেরূপ স্থানে অবস্থিত, তাহার সুবিধা অসুবিধা অনুসারেও খাজনার তারতম্য হয়। সহরের নিকটবর্ত্তী জমি-সকল যদিও অপেক্ষাকৃত অধিকদূরবর্ত্তী জমি অপেক্ষা অল্প উর্ব্বরা হয়, কিন্তু সহরের নিকটস্থ বলিয়া ঐ জমির দূরস্থ জমির অপেক্ষা অধিক খাজনা হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে সহরের নিকটস্থ জমি হইতে যদিও অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ অল্প ফসল উৎপন্ন হয়, কিন্তু উহার উৎপন্ন দ্রব্য সহরে লইয়া যাইতে অল্প ব্যয় পড়ে, সুতরাং বিক্রয় করিয়া অধিকতর লাভ পাওয়া যায়। দূরস্থ জমির ফসল সহরে আনিতে অনেক ব্যয় পড়িয়া যায়, সুতরাং লাভ ও অল্পই হয়।

জমির উৎপাদিকাশক্তি যেরূপ অবস্থায় আছে সেই-

রূপ থাকিলেও যদি ষ্টীম-এনজিন ব্যবহারাদি কোন উপায়ে চাষের ব্যয় কমিয়া যায়, তাহা হইলেও জমির খাজনাবৃদ্ধি হইতে পারে, কারণ এরূপ হইলে কৃষকেরা অধিক খাজনা দিতে সমর্থ হয় বলিয়া ভূম্যধিকারীরা খাজনা বাড়াইয়া দেন। চাষের ব্যয় কমাতে বেতনের অংশ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত হয় বটে, কিন্তু এরূপ হইলে জমিদারেরা খাজনা বাড়াইয়া ঐ উদ্বৃত্ত অংশটী লইয়া থাকেন। সুতরাং এরূপ স্থলে কেবল জমিদারদেরই লাভ হয়, কৃষকদের লাভ না হইয়া বরং লোকসান হইবার সম্ভাবনা। কারণ চাষের ব্যয় কম হইলে, ফশলের ও মূল্য কমিয়া যায়, ফশলের মূল্য কমিলে কৃষকদিগের পূর্ব্বের ন্যায় লাভ হয়না। তবে ফসলের মূল্য কমিলে অন্যান্য দ্রব্যেরও মূল্য কমিতে পারে, সুতরাং লোকের সংসারখরচ পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইতে থাকে, অতএব সাধারণের উপকার হয়। তবে এই উপকারটী কৃষকেরাও ভোগ করিতে পারে। চাষের খরচ কমিলে যেরূপ খাজনাবৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেইরূপ উহা বাড়িলে আবার খাজনাও কমিয়া যায়। কারণ এরূপ অবস্থায় লাভের অংশ সমান থাকিলে, কৃষিকার্য্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় পড়ে, তাহা ভূম্যধিকারীর অংশ অর্থাৎ খাজনা হইতেই দেওয়া হইয়া থাকে। এরূপ হইলে আবার ফসলের মূল্য বাড়িবার সম্ভাবনা হয়।

লোকসংখ্যার যত বৃদ্ধি হইতে থাকে, জমির পরিমাণ ততই অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া পড়ে। ক্রমে জমির পরিমাণ অপেক্ষা উহার গ্রাহকসংখ্যার বৃদ্ধি হয়। সুতরাং এরূপ স্থলেও খাজনার হার বৃদ্ধি হয়। লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইলে জমির দুর্লভতা, ও প্রয়োজনীয়তা যুগপৎ বাড়িয়া উঠে,

কাজেকাজেই খাজনার হার বৃদ্ধি হয়। যেরূপ কোন কোন পণ্যদ্রব্যের গ্রাহকসংখ্যার বৃদ্ধি হইলে মূল্যেরও বৃদ্ধি হয়, অবিকল সেই প্রকারে, গ্রাহকসংখ্যার বৃদ্ধিদ্বারা জমির ও খাজনা বাড়িয়া থাকে। আমাদের দেশে কোন কোন জেলায় খাজনার হার অন্যান্য জেলা অপেক্ষা অধিক! বর্দ্ধমান জেলায় বিঘাকরা ২।৩ টাকা খাজনার কমে জমি পাওয়া যায় না। তথাকার উত্তম জমির খাজনা প্রতিবিঘায় ৫।৬ টাকার ন্যূন নহে। আবার নদিয়া জেলায় ॥০ বা ১ টাকা সামান্যতঃ খাজনার হার। ইহার কারণ বর্দ্ধমানের গ্রাহকসংখ্যা অপেক্ষা নদিয়ার গ্রাহকসংখ্যার অল্পতা। দেশের লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি হইলে আহারসামগ্রীরও বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক। সুতরাং ঐ অধিকতর সামগ্রী উৎপাদন করিবার জন্য অধিক পরিমাণ জমি আবাদ করিবার প্রয়োজন হয়। অতএব একপ হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প উর্ব্বরা জমির আবাদ আরম্ভ করিতে হয়, কারণ যে সকল জমির উৎপাদিকাশক্তি অধিক, তৎসমুদয় অগ্রেই আবাদ হইয়া গিয়া থাকে। অল্প উর্ব্বরা জমি চাষ করিতে অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যয় পড়ে, কাজেকাজেই ফসলের মূল্যও বৃদ্ধি হইয়া উঠে।. জমির খাজনার হারও বাড়িয়া উঠিতে থাকে।

পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত, হইয়াছে যে দুর্লভতা ও প্রয়োজনীয়-তাই জমির খাজনা হইবার নিদান। অর্থাৎ এই দুই কারণেই জমি ব্যবহারের জন্য খাজনা দিতে হয়। কিরূপ জমি হইতে কত পরিমাণে খাজনা পাওয়া যাইতে পারে, অর্থাৎ কিপ্রকার নিয়ম অনুসারে খাজনার পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়, এক্ষণে তাহার বিচার করা যাইতেছে। কিরূপে খাজনার পরিমাণ নির্ণয় করিতে হয়, তদ্বিষয়ে ডেভিড্ রিকার্ডো-

নামক একজন লণ্ডনবাসী বণিক যে নিয়ম উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাই খাজনার পরিমাণ নির্ণয় করিবার প্রকৃত উপায়। যে সকল দেশে গ্রাহকদিগের প্রতিযোগিতা অনুসারে খাজনার হার নির্দ্ধারিত হয়, তত্তৎস্থলে খাজনার পরিমাণ-নির্দ্ধারণ বিষয়ে ও রিকার্ডো প্রদর্শিত নিয়মের বিলক্ষণ উপযোগিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে সকল স্থানে চিরন্তন প্রথা-অনুসারে খাজনার হার নির্দ্ধারিত হয়, তথায় উক্ত নিয়মের তাদৃশ উপযোগিতা নাই। কারণ এরূপ স্থলে বিশেষ বিশেষ প্রথাঅনুসারে খাজনার হার নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। নিম্নে রিকার্ডো প্রদর্শিত নিয়মের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

মনে কর এক স্থানে দুইখণ্ড জমির চাষ হইতেছে। ইহাদের খাজনার হার ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ একখণ্ডের খাজনা অপর খণ্ডের খাজনার অপেক্ষা অধিক। যেখানির খাজনা অধিক সেখানি অপেক্ষাকৃত অধিক উর্ব্বরা ও সুবিধামত স্থানে অবস্থিত, আর যেখানির খাজনা অল্প সেখানি অপেক্ষাকৃত অল্প উর্ব্বরা ও উহার অবস্থান ও তাদৃশ সুবিধার নহে। এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে এই দুই খণ্ড জমির মধ্যে এক খানি অপর খানি অপেক্ষা অধিক উর্ব্বরা ও সুবিধামত স্থানে অবস্থিত বলিয়া অধিক খাজনা দিয়া থাকে, অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই উৎকৃষ্ট জমির খাজনা হইতে নিকৃষ্ট জমির খাজনা বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ঐ উৎকৃষ্ট ভূমির উৎকৃষ্টতার মূল্যস্বরূপ। আবার মনে কর ঐ দুইখণ্ড ভূমির পার্শ্বে আর একখণ্ড ভূমি আছে, উহার উর্ব্বরতা অতি অল্প, অতএব উহা হইতে অতি যৎসামান্য খাজনা উদ্ভূত হইতে পারে। উহার খাজনা এত অল্প যে কিছুই নয় বলিলেও বিশেষ হানি নাই। এক্ষণে বুঝা যাইতেছে; যে ঐ

সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূমির খাজনা হইতে এই অধম ভূমির খাজনা বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই ঐ অধম ভূমি অপেক্ষা সর্ব্বোৎকৃষ্ট জমির যে অধিক উৎপাদকতা ও অবস্থানের সুবিধা আছে তাহার মূল্যস্বরূপ ধরিতে হইবে। কিন্তু অধম ভূমিখণ্ডের খাজনা অতি সামান্য, নামমাত্র, বা কিছুই নহে। অতএব উৎকৃষ্ট ভূমির সমুদায় খাজনাই উহার উৎপাদিকা শক্তি প্রভৃতি সুবিধার আধিক্যের মূল্যস্বরূপ, কারণ অপকৃষ্ট জমির খাজনা কিছুই নহে। এক্ষণে প্রতিপন্ন হইতেছে যে এক খণ্ড জমি অপর এক খণ্ড জমি অপেক্ষা কত উৎকৃষ্ট তাহা ঐ উভয়ের খাজনার তারতম্য অনুসারেই নির্দ্ধারিত হইতে পারে। উপরে যাহা কথিত হইল, তাহাদ্বারা এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সকল স্থানের ভূমিই উর্ব্বরতার ন্যূনাধিক্য ও অবস্থানের সুবিধা অনুসারে উৎকৃষ্ট, মধ্যম, ও অপকৃষ্ট এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। উৎকৃষ্ট ভূমির উর্ব্বরতা ও অবস্থানের সুবিধা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অধম ভূমির উর্ব্বরতা ও অবস্থানের সুবিধা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, ও মধ্যম ভূমির উর্ব্বরতা ও অবস্থানের সুবিধা এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী। এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে লোকে সর্ব্বাগ্রে উৎকৃষ্ট জমিরই আবাদ করিয়া থাকে। ক্রমে যত লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই উৎকৃষ্ট জমি দুষ্প্রাপ্য হইতে আরম্ভ হয়, সেই হেতু লোকে মধ্যম জমির আবাদ আরম্ভ করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু মধ্যম জমি আবাদ করিতে অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যয় হয়। তথাপি লোকে এইরূপ জমি আবাদ করিতে বিরত হয় না, কারণ যদিও উহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক আবাদখরচ পড়ে, কিন্তু লোকসংখ্যার বৃদ্ধি ও উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হয় বলিয়া ঐ অধিক খরচ

পোষাইয়া যায়। এরূপ সময়ে যদি কেহ উত্তম জমি পায় তাহা হইলে সে মধ্যম ভূমির আবাদ করিতে যত অধিক ব্যয় পড়িত তাহাই খাজনাস্বরূপে ভূম্যধিকারীকে দিয়া ঐ উৎকৃষ্ট জমি অনায়াসেই লইতে পারে। ক্রমে লোকসংখ্যার আরও বৃদ্ধি হইলে অধম জমিরও আবাদ করিবার প্রয়োজন হয়, সুতরাং এরূপ স্থলে অপকৃষ্ট জমি আবাদ করিতে মধ্যমভূমির ব্যয় অপেক্ষা যত অধিক ব্যয় পড়িত, তাহাই খাজনাস্বরূপে দিয়া লোকে মধ্যমভূমি লইতে পারে। আবার এমত সময়ে উৎকৃষ্ট ভূমির খাজনা আরও বাড়িয়া উঠে, অর্থাৎ এরূপ সময়ে উৎকৃষ্ট ভূমির আবাদ করিতে যাহা ব্যয় হয়, অপকৃষ্ট ভূমি আবাদ করিতে তাহা অপেক্ষা যত অধিক ব্যয় পড়ে, তাহাই খাজনাস্বরূপে দিয়া লোকে উৎকৃষ্ট ভূমি লইতে সম্মত হয়।

জমি হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তৎসমুদায়ের সমষ্টিকে উহার মোট উৎপন্ন কহে। মোট উৎপন্ন হইতে আবাদখরচ, মূলধনের সুদ প্রভৃতির হিসাবে যাহা ব্যয় হয়, তৎসমুদয় বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাকেই জমির খাটী উৎপন্ন কহে। এই দুইটী শব্দের পরস্পর প্রভেদ মনে রাখিয়া রিকার্ডোর নিয়ম কোন বিশেষ স্থলে খাটাইলে কোন্ জমির কি পরিমাণে খাজনা হওয়া উচিত তাহা অনায়াসেই প্রতীয়মান হইতে পারে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে এক কেতা জমির খাজনা হইতে, পূর্ব্বোক্তপ্রকার অপকৃষ্ট জমির খাজনা বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই ঐ ভূমিখণ্ডের উর্ব্বরত্বাদির আধিক্যের মূল্যস্বরূপ। এক্ষণে বুঝিতে হইবে, যে কোন ভূমিখণ্ডের পূর্ব্বোক্তপ্রকার মূল্য, উহার খাটী উৎপন্ন হইতে অপকৃষ্ট ভূমিখণ্ডের খাটী উৎপন্ন বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার সমান। অতএব এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল, যে কোন জমির

খাজনানিরূপণ করিতে হইলে উহার খাটী উৎপন্ন হইতে উহার সমানপরিমাণ অপকৃষ্টজমির খাটী উৎপন্ন বাদ দিতে হয়। বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই উহার খাজনাস্বরূপে নিরূপিত হয়। মনে কর এক ব্যক্তি তোমার এক খণ্ড ভূমি আবাদ করে, তাহার জমির খাটী উৎপন্ন অতি সামান্য, মনে কর কিছুই নহে, আর এক ব্যক্তি তোমার আর এক খণ্ড ভূমির আবাদ করিয়া থাকে, উহার খাটী উৎপন্ন পূর্ব্বোক্ত ভূমির খাটী উৎপন্ন হইতে ২০ টাকা অধিক। এক্ষণে স্থির হইতেছে যে ২ নং ভূমিখণ্ডের খাজনা বাৎসরিক ২০ টাকা হইতে পারে। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, যে ২০ টাকা সমুদয়ই যে ঐ জমির খাজনা হইবে এরূপ নহে। তবে এই পর্য্যন্ত স্থির যে, খাজনা উহা অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। ঐ পর্য্যন্তই খাজনার চরম সীমা, কারণ প্রতিযোগিতা প্রবল হইলে ঐ পর্য্যন্তই খাজনা স্বীকার করিয়া লোকে জমি লইয়া থাকে। এস্থলে এরূপ আপত্তি হইতে পারে যে যদি অপকৃষ্ট জমির খাটী উৎপন্ন কিছুই নহে, তাহা হইলে লোকে এরূপ জমি আবাদ করিবে কেন? তাহার কারণ আছে। "খাটী উৎপন্ন" ইহার অর্থ কি? মোট উৎপন্ন হইতে আবাদ খরচ, টাকার সুদ, পাট্টাদারের নিজের পরিশ্রমের বেতন এই সকল বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই খাটী উৎপন্ন কহে। অতএব নামমাত্র খাজনায় জমি পাইলে যদিও উহার খাটী উৎপন্ন নামমাত্র বা কিছুই নয়, এরূপও হয়, তাহাতেও কৃষকের বিশেষ লোকসান নাই। সমাজের আদিম অবস্থায় লোকে কেবল উৎকৃষ্ট জমিরই আবাদ করিয়া থাকে, অপকৃষ্ট বা মধ্যবিধ জমির আবাদ করেনা, কারণ তৎকালে লোকসংখ্যার অল্পতাপ্রযুক্ত মধ্যবিধ বা অপকৃষ্ট জমির আবাদ করিবার আবশ্যকতা হয়

না। এস্থলে এরূপ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যে ঐরূপ সময়ে উৎকৃষ্ট জমি নামমাত্র খাজনায় আবাদ করিতে না দিলে আর রিকার্ডোপ্রদর্শিত নিয়ম অনুসারে খাজনার পরিমাণ নিরূপিত হইতে পারেনা, কারণ তাঁহার নিয়মের অর্থ এই যে কালক্রমে লোকসংখ্যার বাহুল্য হইয়াই উৎকৃষ্ট ও মধ্যম জমির খাজনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সমাজের আদিম অবস্থায় উৎকৃষ্ট জমিরও খাজনা ছিল না। কিন্তু ভূম্যধিকারীরা কিকারণে তাঁহাদের জমি কোন কালেই নামমাত্র খাজনায় অপরকে ব্যবহার করিতে দিবেন, ইহা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে গ্রাহকের প্রাচুর্য্য না থাকাতে, ও নিজ প্রয়োজনসাধনের উপযুক্ত অপেক্ষাও অধিক জমি থাকাতে জমিদারেরা নামাত্র যৎকিঞ্চিৎ খাজনা লইয়া নিজভূমি অপরকে ব্যবহার করিতে দিতেন, তবে যৎকিঞ্চিৎ খাজনা লওয়া আপনাদের স্বত্ব ও অধিকার বজায় রাখিবার নিমিত্ত এইমাত্র। ফলতঃ এইরূপ করাতেই কালক্রমে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইয়া তাঁহাদের জমির খাজনাবৃদ্ধি হইয়াছে। নতুবা কখনই হইত না।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে শস্যোৎপাদন করিবার নিমিত্ত জমির প্রয়োজন হয়। কিন্তু শস্যোৎপাদন ভিন্ন জমিগ্রহণের আরও অশেষবিধ প্রয়োজন আছে। গৃহনির্ম্মাণ, হাট, বাজার, প্রভৃতি বসান ইত্যাদি নানাপ্রকারে জমির প্রয়োজন হয়। ফলতঃ যে কোন প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত জমি গৃহীত হউক না কেন, ইহার দুর্লভতা ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারেই খাজনা হইয়া থাকে। কলিকাতার বড়বাজারে এক কাঠামাত্র জমির যে খাজনা, পল্লীগ্রামস্থ উৎকৃষ্টতম এক বিঘা জমির খাজনাও তাহা অপেক্ষা অনেকাংশে ন্যূন। একণে বুঝিতে

হইবে রিকার্ডোর নিয়ম, আবাদ করিবার নিমিত্ত যে জমি গৃহীত হয়, তাহারই খাজনা নিরূপণ করিবার উপযোগী নহে, গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি যে কোন প্রয়োজনের নিমিত্ত প্রতিযোগিতার সহিত জমি গৃহীত হয়, তৎসমুদায়েরই খাজনা ঐ নিয়ম অনুসারে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

অনেক সময়ে জমির খাজনা ও জমি হইতে উৎপন্ন শস্যাদির মূল্য উভয়ই যুগপৎ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহাতে অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে জমির খাজনা বৃদ্ধি হওয়াতেই তদুৎপন্ন শস্যাদির মূল্যবৃদ্ধি হয়। কিন্তু এটী ভ্রম। কারণ খাজনাবৃদ্ধি হইলে ত আর জমির উৎপাদিকাশক্তি কমিয়া গিয়া ভূমি হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প উৎপন্ন হয়না। তবে তজ্জন্য শস্যের পণ বাড়িয়া উঠিবে কারণ কি? দেশে যত লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই গ্রাহকসংখ্যার বৃদ্ধি হইয়া উঠে, ও জমির পরিমাণ ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত অল্প হয়। কাজে কাজেই এরূপ সময়ে জমির খাজনা ও শস্যের মূল্য এককালেই বৃদ্ধি পায়। লোকসংখ্যার বৃদ্ধিই এস্থলে শস্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণ, নতুবা খাজনাবৃদ্ধি দ্বারা যে ঐরূপে শস্যের মূল্যবৃদ্ধি হয় তাহা কখনই নহে। প্রত্যুত এরূপস্থলে খাজনাবৃদ্ধিও যে কারণে হয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিও সেই কারণেই হইয়া থাকে।

অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে জমির খাজনা কমাইয়া অথবা একবারে উঠাইয়া দিলে উৎপন্নদ্রব্যের মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প হইতে পারে, খাদ্যদ্রব্যাদির মূল্য অল্প হইলে সকলেরই সুবিধা হয়, অতএব যাহাতে খাজনা কমিয়া যায় বা একবারে উঠিয়া যায় তদ্বিষয়ের চেষ্টা করা উচিত। জমির খাজনা উঠাইয়া দিলে কেবল ভূম্যধিকারীদিগের লোকসান ভিন্ন আর কিছুই ফল হয়না, জমির খাজনা উঠাইয়া দিলে কখ-

নই আবশ্যক সামগ্রীর অভাব কমেনা, পূর্ব্বে যেরূপ প্রয়োজন ছিল খাজনা উঠাইয়া দিলেও তাহাই থাকে। পূর্ব্বে যত জমির আবাদ করিতে হইত এক্ষণেও তত জমির আবাদ করিতে হয়। অতএব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে নামমাত্র খাজনাবিশিষ্ট যে সকল জমি পূর্ব্বে আবাদ করিতে হইত, এখনও তৎসমুদয়ের আবাদ করিতে হয়, কারণ ইহাদের উৎপন্নদ্রব্যব্যবহার খাজনা উঠাইয়া দিবার পূর্ব্বে যেরূপ অত্যাবশ্যক ছিল, খাজনা উঠাইবার পরেও অবিকল তদ্রূপই থাকিবে। অতএব যদি খাজনা উঠাইয়া দিলে দ্রব্যের মূল্যের হ্রাস হয়; তাহা হইলে যাহারা এইরূপ অপকৃষ্ট জমির চাষ করিত, তাহাদিগকে যৎ-পরোনাস্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে, কারণ উৎপন্নদ্রব্যের মূল্য কমাতে তাহাদের আয় অতিশয় কমিয়া যাইবে, অথচ সমান আবশ্যকতা থাকাতে উহারা কখনই ঐরূপ অপকৃষ্ট জমির চাষ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবেনা। অতএব সপ্রমাণ হইতেছে যে জমির খাজনা উঠাইয়া দিলে উৎপন্নদ্রব্যের মূল্য কখনই কম হইতে পারেনা, কাজে কাজেই এরূপ করিলে ভূম্যধিকারী ও যাহারা অপকৃষ্ট জমির চাষ করে তাহাদের ক্ষতি ভিন্ন কোন ফলোদয় হয় না।

এক্ষণে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া খাজনার বিষয় শেষ করা যাইতেছে। খাজনার নিরূপণ হইলে কোন বিশেষ ভূমির কত মূল্য তাহারও নিশ্চয় হইতে পারে। অর্থাৎ খাজনার নির্ণয় হইলে ভূমি কি দরে বিক্রয় করা যাইতে পারে তাহারও নিশ্চয় হয়। কতিপয় নিয়মিতসংখ্যক বৎসরে কোন ভূমি খণ্ডের যাহা খাজনা হইতে পারে, তাহাই উহার মূল্যস্বরূপে ধরা উচিত। আমাদের দেশে সচরাচর ২০ সনের খাজনা ধরিয়া ভূমির মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ভূমির ২০

বৎসরের খাজনাই উহার মূল্যস্বরূপে গৃহীত হয়। যদি এক বিঘা ধেনো জমির বার্ষিক ৫ টাকা খাজনা হয়, তাহা হইলে ঐ জমি বিক্রয় করিতে হইলে ৫ × ২০=১০০ টাকা উহার মূল্য হইবে।

আমাদের দেশে সমুদয় ভূমিই উৎপাদিকাশক্তি ও অবস্থানের সুবিধার তারতম্য অনুসারে চারি প্রকারে বিভক্ত। শালি আউওল, সুইয়েম, ডুইয়েম ও চাহারাম। যাহাতে ষোলআনা রকম অর্থাৎ পুরো উৎপন্ন হয় তাহার নাম আউওল, যাহাতে বারআনা রকম উৎপন্ন হয় তাহার নাম সুইয়েম, যাহাতে আটআনা রকম উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ডুইয়েম, আর যাহাতে চারি আনা রকম উৎপন্ন হয় তাহার নাম চাহারম। বোধ হয় ইহাদিগেরও খাজনার হার নির্ণয় চিরকালই রিকার্ডোর ন্যায় নিয়ম অনুসারে চলিয়া থাকিবে।

——:০:——

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ধনবিভূতি—বেতন।

যেরূপ জমি ব্যবহার করিতে দিয়া উহার পরিবর্ত্তে যে অর্থ পাওয়া যায় তাহার নাম খাজনা, সেইরূপ পরিশ্রমের বিনিময়ে যে অর্থ পাওয়া যায় তাহার নাম বেতন। পরিশ্রম দ্বিবিধ, শারীরিক ও মানসিক। যে কার্য্যে অধিক মাত্রায় শারীরিক ও অল্পমাত্রায় মানসিক পরিশ্রমের প্রয়োজন, তাহাকে শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্য কহে, আর যাহাতে অধিক মাত্রায় মানসিক ও অল্পমাত্রায় শারীরিক পরিশ্রমের আবশ্যকতা, তাহাকে মানসিক পরিশ্রমের কার্য্য কহে। এইরূপ প্রভেদ করিবার প্রয়ো-

জন এই যে, যে সকল কার্য্যে মানসিক পরিশ্রম করিতে হ তাহার বেতন অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া থাকে।

খাজনার ন্যায় বেতনও দেশাচার ও প্রতিযোগিতা উভয় প্রকারেই নির্ণীত হইয়া থাকে। কোন স্থানে দেশাচার আর কোন স্থানে বা প্রতিযোগিতা অনুসারে বেতনের তারতম্য হইয়া থাকে। ফলতঃ কোন ব্যবসায়ই এরূপ নাই যে যতই প্রতিযোগিতা বাড়ুক না কেন উহার বেতনের হার কিছুতেই কমিবেনা।

বেতনের বিষয়ে প্রধান কথা সর্ব্বশুদ্ধ দুইটী। ১ মঃ—কি কি সাধারণ নিয়ম অনুসারে সামান্যতঃ বেতনের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে, ২ য়ঃ—কি কি কারণে ব্যবসায় ও সময়ভেদে বেতনের তারতম্য হইয়া থাকে। এক্ষণে বেতনের হ্রাসবৃদ্ধির সাধারণ নিয়ম কি কি তাহার নিরূপণ করা যাইতেছে।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, কোন ব্যবসায়ে যে পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, উহার মূলধন হইতেই ঐ পরিশ্রমের বেতন প্রদত্ত হয়। মূলধনের কিয়দংশ পরিশ্রমের বেতনস্বরূপে ব্যয়িত হইয়া থাকে। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে মূলধন ও শ্রম-ব্যবসায়ী লোকদিগের সংখ্যা এই উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ অনুসারেই বেতনের তারতম্য হইয়া থাকে। যদি কোন দেশে শ্রমিকদিগের সংখ্যা স্থিরভাবে একরূপই থাকে, তাহা হইলে যতদিন পর্য্যন্ত তথাকার মূলধন পূর্ব্বাপেক্ষা না বাড়িয়া উঠিবে, ততদিন শ্রমিকদিগের বেতনও বাড়িতে পারিবে না। আবার যদি শ্রমিকদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়, কিন্তু মূলধন বৃদ্ধি না হইয়া সমভাবে থাকে, তাহা হইলে বেতনের হার অবশ্যই পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যাইবে। কিন্তু যদি লোকসংখ্যা একরূপ থাকিয়া মূলধনের বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে বেতনের বৃদ্ধি হইবে, মূলধন

একরূপ থাকিয়া যদি কোন কারণে লোকসংখ্যার হ্রাস হয়, তাহা হইলেও বেতনের বৃদ্ধি হইতে পারে। ইহার কারণ এই, যে মূলধনের বৃদ্ধি হইলে উহা ধনোৎপাদন কার্য্যে বিনিয়োজিত করিবার জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিশ্রমের আবশ্যকতা হয়, কিন্তু যদি শ্রমিকদিগের সংখ্যা না বাড়িয়া পূর্ব্বমতই থাকে, কাজে কাজেই পরিশ্রমের বেতনবৃদ্ধি করিতে হয়,নতুবা কেহই পরিশ্রম করিতে ইচ্ছুক হয় না। আবার যদি মূলধন একরূপ থাকিয়া শ্রমিকদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে বেতনের হার পূর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন হইয়া পড়ে। কারণ এরূপ স্থলে মূলধন যত লোককে বেতন দিয়া খাটাইতে পারে তদপেক্ষা লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে সুতরাং পরিশ্রমের বেতন সভাবতই কমিয়া যায়। আবার যদি মূলধনও যে পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, লোকসংখ্যাও ঠিক সেই পরিমাণে বাড়িতে থাকে তাহা হইলে পরিশ্রমের বেতন বাড়িতেও পারেনা,কমিতেও পারেনা, একরূপই থাকে। এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে শ্রমজীবীদিগের অবস্থার উন্নতি করা যাইতে পারে। যদি মূলধন অল্প ও শ্রমিকদিগের সংখ্যা অধিক হয় তাহা হইলে পরিশ্রমের বেতন অল্প হইয়া পড়ে ও শ্রমজীবীরা ক্লেশ পাইতে থাকে, অতএব এরূপ স্থলে শ্রমজীবীদিগের দারিদ্র্যনিবারণ করিতে হইলে মূলধনের বৃদ্ধি করিতে হয়। মূলধনের বৃদ্ধি হইলে ক্রমশঃ অধিক লোকের পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় ও কালসহকারে উহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়া শ্রমিকদিগের অবস্থার উন্নতি হইতে পারে। কি উপায়ে মূলধনের বৃদ্ধি করিতে পারা যায় তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে নির্ণীত হইয়াছে, অতএব এস্থলে উহার পুনরুল্লেখ করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু যদি দেশের অবস্থার দোষে মূলধনের বৃদ্ধি করা অসম্ভব হয়

তাহা হইলে দেশের বড়ই অমঙ্গল, কারণ এরূপ স্থলে শ্রমজীবী-দিগের কষ্ট নিবারণ করিতে হইলে লোকসংখ্যা কমান ভিন্ন উপায়ান্তর থাকেনা। আমাদের দেশে শ্রমজীবীর অভাব নাই। কিন্তু মূলধন অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়া শ্রমজীবীদিগের অবস্থা তত ভাল নহে। ইহাদিগের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে কেবল মূলধনের বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন, লোকসংখ্যা কমাইবার আবশ্যকতা নাই। কয়েকবৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে শ্রমজীবীদিগের যেরূপ অবস্থা ছিল এক্ষণে তাহা অপেক্ষা অনেক উন্নতি হইয়াছে, পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে পরিশ্রমের বেতন অনেক অংশে বাড়িয়া উঠিয়াছে, পূর্ব্বে ১ টাকায় আট দশটা মজুর পাওয়া যাইত, অর্থাৎ মজুরদিগের দৈনিক বেতন দেড় আনা, দুই আনার অধিক ছিলনা, কিন্তু এক্ষণে টাকায় ৩।৪ টার অধিক মজুর পাওয়া যায়না, অর্থাৎ মজুরদিগের দৈনিক বেতন এক্ষণে চারি আনা, পাঁচ আনা হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ কেবল মূলধনের অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি আর কিছুই নহে। আমাদের দেশের এক্ষণে যেরূপ অবস্থা তাহাতে বোধ হয় যে যতই আমাদের দেশের মূলধন বৃদ্ধি হইতে থাকিবে শ্রমিক-দিগের অবস্থাও ততই উন্নত হইতে থাকিবে।

আবার যদি দেশের মূলধন ও শ্রমিকদিগের সংখ্যা সম-কালেই সমান পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহা হইলেও শ্রমজীবীদিগের অবস্থার উন্নতি হওয়া দুঃসাধ্য হয়। সুতরাং এরূপস্থলে লোকসংখ্যা কমান ব্যতিরেকে শ্রমিকদিগের অবস্থা উন্নত করিবার উপায়ান্তর নাই। ইংলণ্ডদেশে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে মূলধনের এত বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে, যে পৃথি-বীর কুত্রাপি ওরূপ উন্নতি দেখা যায় না। কিন্তু তথাপি তত্রত্য শ্রমজীবীদিগের বেতন বৃদ্ধি হয় নাই, তাহাদের অবস্থা পূর্ব্বে-

রই ন্যায় রহিয়াছে। ইহার কারণ এই যে তথায় মূলধনও যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, লোকসংখ্যাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমান পরিমাণেই বাড়িয়া উঠিয়াছে, অতএব এস্থলে মূলধন বৃদ্ধিদ্বারা কোন বিশেষ ফল হয় নাই। ইহাদ্বারা অনুমান হইতেছে যে যদি মধ্যে মধ্যে দেশের লোকসংখ্যার হ্রাস না হয় তাহা হইলে কোন প্রকারেই শ্রমজীবীদিগের অবস্থার উন্নতি হইতে পারে না। কিন্তু কি উপায়ে লোকসংখ্যার হ্রাস হইতে পারে? মধ্যে মধ্যে লোকসংখ্যার কিছু কিছু হ্রাস না হইলে, এমত হইতে পারে যে অল্পকালের মধ্যেই পৃথিবীতে আর স্থান হয় না। পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে,যে যদি কোন কারণে হ্রাস না হয়, তাহা হইলে বিংশতি বৎসরের মধ্যেই সকল স্থানের লোকসংখ্যা দ্বিগুণিত বৃদ্ধি হইতে থাকিলে অবশেষে পৃথিবীতে আর স্থান হইতে পারে না। প্রায় সকল দেশেই মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি কারণে লোকসংখ্যার হ্রাস হইয়া থাকে, অনেকস্থানে উপযুক্তরূপ যত্ন ও প্রতিপালনের অভাবে বাল্যাবস্থাতেই অনেক মৃত্যু হয়। নরওয়ে প্রভৃতি দেশের লোকেরা উপার্জ্জনক্ষম না হইলে বিবাহ করিতে পারে না। অতএব বোধ হইতেছে এই সকল কারণে লোকসংখ্যার হ্রাস হওয়াতেই পরিশ্রমের মূল্য একবারে কমিয়া যাইতে পারে না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে লোকসংখ্যার হ্রাস হইয়াও অনেক স্থানে অনেক সময়েবিশেষ ফল হয় না, কারণএকদিকে যেমন লোকসংখ্যা কিছু কিছু হ্রাস হয় বটে কিন্তু অন্যদিকে আবার এত বৃদ্ধি হইতে থাকে যে পরিশেষে বিশেষ উপকার দর্শে না। অতএব বোধ হইতেছে, যে এরূপ স্থলে অন্য কোন উপায়ে লোকসংখ্যার হ্রাস করা বিধেয়। কিন্তু কি উপায়ে উহা সাধিত হইতে পারে? উপনিবেশসংস্থাপনের তুল্য ইহার

উপযুক্ত উপায় আর নাই। কোন দেশের লোকসংখ্যা অতিশয় বাড়িয়া উঠিলে তথাকার কিয়দংশ লোক লইয়া যেখানে বসতি নাই অথবা অতি অল্পমাত্র লোকের বসতি আছে, এরূপ কোন নূতন, উর্ব্বর ও স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করাইতে হয়। ইহাকেই উপনিবেশ সংস্থাপন বলে। উপনিবেশ সংস্থাপন দ্বারা মাতৃভূমি ও উপনিবেশ উভয় দেশেরই বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। অতিরিক্ত লোকসংখ্যা বাহির হইয়া যাওয়াতে মাতৃভূমির ব্যয়ের পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক লাঘব হয়, ব্যয়ের লাঘব হইলেই মূলধনও পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িতে থাকে, এবং পরিশ্রমের মূল্য ক্রমে আবার বাড়িয়া উঠে, ও শ্রমজীবীদিগের অবস্থারও উন্নতি হইতে থাকে। আবার যাহারা উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে যায় তাহাদিগেরও বিশেষ উপকার! দেখ ইহারা দেশে থাকিয়া কেবল যে আপনারাই কষ্ট পাইতেছিল এরূপ নহে, দেশশুদ্ধ তাবৎলোকেরই ক্লেশের হেতু হইয়াছিল। কিন্তু বাহির হইয়া নূতন স্থানে বাস করাতে ইহাদের কষ্ট নিবৃত্তি হইল। ইহারা নূতন উর্ব্বরা স্থান প্রচুর পরিমাণে পাইয়া অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ধান্যোৎপাদন করিতে সমর্থ হইল। আবার এরূপ হওয়াও অসম্ভব নহে যে কালক্রমে ঔপনিবেশিকেরা মাতৃভূমির অপেক্ষাও অধিকতর উন্নতি লাভ করিতে পারে। ফলতঃ উপনিবেশ সংস্থাপন দ্বারা যে মাতৃভূমি ও উপনিবেশ উভয়েরই অশেষ উপকার হয় তাহাতে আর অনুমাত্র সংশয় নাই। প্রাচীনকালে গ্রীসদেশের অধিবাসীরা এইরূপে উপনিবেশ সংস্থাপনদ্বারাই অত উন্নত হইয়াছিলেন। আবার অধুনা ইংলণ্ডের অধিবাসীরা নানাস্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া আপনাদিগের ও সেই সেই উপনিবেশের বিশেষ উপকার করিতেছেন। আমাদের দেশের এক্ষণে যেরূপ অবস্থা

তাহাতে বোধ হয় যদি আমরা ইংরাজশাসনের অধীনে স্থানে স্থানে উপনিবেশ-সংস্থাপন করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইতে অবিলম্বেই আমাদের অবস্থার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি হইতে পারে। প্রায় ২০।৩০ বৎসর অবধি বঙ্গদেশের প্রায় সকল স্থানেই ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশ প্রভৃতির কোন কোন অংশে অতি ভয়ানক সংক্রামক জ্বর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এমন কি, মধ্যে মধ্যে মহামারী পর্য্যন্ত হইতেছে। রেলওয়ে হওয়াতে অনেক স্থানে জলনিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া এরূপ হইতেছে এ কথা যথার্থ বটে, কি লোকসংখ্যার বৃদ্ধি যে এইরূপ হইবার অন্যতম কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব এই অনিষ্ট নিবারণ করিতে হইলে জলনিকাশের পথ পরিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করা যেরূপ আবশ্যক, দেশের কিয়দংশ লোক লইয়া কোন উর্ব্বরা অথচ স্বাস্থ্যকর স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিবার চেষ্টা করাও সেইরূপ প্রয়োজনীয়।

এক্ষণে কি কি কারণে ব্যবসায় ও সময়ভেদে বেতনের তারতম্য হইয়া থাকে তাহার নিশ্চয় করা যাইতেছে। সকল প্রকার পরিশ্রমের বেতন সমান নহে। সকল প্রকার ব্যবসায়ের লোকেরা সমান বেতন পায় না। মজুর বা মুটিয়া, রাজমিস্ত্রি ও ঘড়িওয়ালা, ইহারা সকলেই একরূপ বেতন পায় না। মজুর বা মুটিয়া অপেক্ষা রাজমিস্ত্রির বেতন অধিক, আবার ঘড়িওয়ালা ঐ উভয় অপেক্ষাও অধিক বেতন পাইয়া থাকে। সমান ব্যবসায়ীদিগের মধ্যেও সকলে সমান বেতন পায় না। সমান সময় পরিশ্রম করিলে সামান্য কারিকর অপেক্ষা একজন সুনিপুণ কারিকর অধিক বেতন পাইয়া থাকে। একজন সামান্য রাজ সমস্তদিন পরিশ্রম করিলে যাহা বেতন পায় একজন পাকা মিস্ত্রি সমস্তদিন পরিশ্রম করিলে তদপেক্ষা অধিক বেতন পাইয়া

থাকে। মানসিক পরিশ্রমের বিষয়েও এইরূপ নিয়ম। একজন সামান্য কেরাণী বা মুহুরী অপেক্ষা একজন সুদক্ষ একাউণ্টাণ্ট অধিক বেতন পায়। আবার উকীল বা চিকিৎসক ইহাদের অপেক্ষাও অধিক বেতন পাইয়া থাকে। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যে পরিশ্রমের তারতম্য অনুসারে বেতনের তারতম্য হয়না। পরিশ্রম দ্বারা যেরূপ কার্য্য নিষ্পন্ন হয় তাহারই প্রকৃতি অনুসারে পরিশ্রমীর বেতনের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। অতএব বুঝিতে হইবে যেরূপ দুর্ল্লভতা ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে দ্রব্যের মূল্যনির্দ্ধারণ হইয়া থাকে, সেইরূপ পরিশ্রমজন্য কার্য্যের দুর্ল্লভতা ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারেই পরিশ্রমের বেতনের ন্যূনাধিক্য হয়। কখন কখন কোন কোন বিশেষ ব্যবসায়ের বেতন বাড়িয়া উঠে, কিন্তু অন্যান্য ব্যবসায়ের বেতনের কিছুমাত্র পরিবর্ত্ত হয় না। ইহার কারণ এই যে তৎকালে সেই ব্যবসায়ের অধিকতর প্রয়োজন হয়, কিন্তু সেই ব্যবসায়ের লোক তত অধিক পাওয়া যায় না।

যে যে কারণে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ে বেতনের বিভিন্নতা হইয়া থাকে এডাম স্মিথ সাহেব তৎসমুদয় নিম্নলিখিত পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

১। কর্ম্মের উপাদেয়তা ও বিরক্তিকরতা। অর্থাৎ যে কর্ম্ম করিতে ভাল লাগে, তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ও সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে, অতএব এরূপ কার্য্যের বেতন অল্প। আর যে কর্ম্ম করিতে ভাল লাগে না, তাহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় ও আয়াস লাগিয়া থাকে, সুতরাং এরূপ কার্য্যের বেতন অপেক্ষাকৃত অধিক।

২। কর্ম্মশিক্ষার সুখসাধ্যতা বা কঠিনতা, ও অল্পব্যয়-সাধ্যতা বা বহুব্যয়-সাধ্যতা। যে কর্ম্ম সহজে ও অল্পব্যয়ে

শিক্ষা করা যায়, তাহার বেতন অল্প, আর যাহা শিক্ষা করা কঠিন, শিখিতেও অধিক ব্যয় পড়ে, তাহার বেতন অপেক্ষাকৃত অধিক।

৩। কার্য্যপ্রাপ্তির নিশ্চিন্ততা ও অনিশ্চিততা। যে ব্যবসায় শিক্ষা করিলে কার্য্যপ্রাপ্তির বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না, তাহার বেতন অল্প, আর যাহাতে কার্য্যপ্রাপ্তি অনিশ্চিত, তাহার বেতন অধিক।

৪। কর্ম্মকরদিগের প্রতি বিশ্বাসের ন্যূনাধিক্য। যে ব্যবসায়ে কর্ম্মকরদিগের প্রতি অধিক বিশ্বাস করিতে হয়, নতুবা কার্য্য চলে না, তাহার বেতন অধিক। আর যাহাতে কর্ম্মকরদিগের প্রতি অল্প বিশ্বাস করিলেও কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার বেতন অপেক্ষাকৃত অল্প।

৫। ব্যবসায়শিক্ষা করিবার পর তাহাতে প্রতিপত্তিলাভ সম্ভাবনার ন্যূনাধিক্য। অর্থাৎ যে ব্যবসায় শিক্ষা করিলে সকলে সহজেই তাহাতে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে, তাহার বেতন অল্প। আর যে ব্যবসায় শিক্ষা করিলে তাহাতে প্রতিপত্তি লাভ করা সহজ নহে, তাহার বেতন অধিক।

উপরি উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ে যে বেতনের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে, তাহার উদাহরণ সহজেই সংগৃহীত হইতে পারে। প্রথম—যেব্যক্তি কয়লা লৌহ প্রভৃতি ধাতুর খনি খনন করিয়া থাকে, সে তাহা অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যদক্ষ অন্যান্য ব্যবসায়ী অপেক্ষা অধিক বেতন পায়, সূত্রধর যত পরিশ্রম করিয়া যাহা বেতন পায়, খনিতে যে পরিশ্রম করে, সে তদপেক্ষা অল্প সময় পরিশ্রম করিয়াও তাহা অপেক্ষা অধিক পাইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে খনিখনন-কার্য্যে যে কেবল অধিকতর পরিশ্রমের প্রয়ো-

জন এরূপ নহে, এই কার্য্যে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। এই কার্য্য করিতে হইলে সর্ব্বদাই অপরিচ্ছন্ন থাকিতেহয়, অন্ধকার-ময় স্থানে অতিশয় পীড়াজনক বায়ুর মধ্যে থাকিয়া পরিশ্রম করিতে হয়, অতএব যাহারা এরূপ কার্য্য করে, শীঘ্রই তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা। আবার কখন কখন খনির উপরিভাগ খসিয়া পড়িয়া নিম্নস্থ কর্ম্মকরদিগের অপঘাতমৃত্যুও দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং অধিক বেতন না পাইলে এরূপ বিপজ্জনক কার্য্যে লোকের প্রবৃত্তি হইবে কেন?

দ্বিতীয়। যে কার্য্য শিক্ষা করা আপেক্ষাকৃত কঠিন, অর্থাৎ যাহা শিক্ষা করিতে বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয় হয়, তাহার বেতন অধিক হইয়া থাকে। মনে কর একব্যক্তি ঘড়ির কার্য্য শিক্ষা করিবে। এক্ষণে তাহাকে অন্ততঃ বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কার্য্য শিখিতে হইবে। মনে কর এই বিশ বৎসরের মধ্যে তাহার ভরণপোষণার্থ তাহার পিতা মাতার কত ব্যয় পড়িয়া থাকে, তাহার উপর আবার কার্য্যশিক্ষার নিমিত্ত শিক্ষকদিগকে বেতন দিতে হয়। আবার মনে কর যদি সে ঘড়ীর কার্য্য না শিখিতে গিয়া সূত্রধরের কার্য্য শিখিত তাহা হইলে অনেক দিন পূর্ব্বেই অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিত। আবার ঘড়ীর কার্য্য শিক্ষা করাও কঠিন ব্যাপার। হয় ত ঐ ব্যক্তি অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াও ভালরূপ শিখিতে পারিলনা, সুতরাং তাহার সকলই বৃথা হইল। এক্ষণে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে ঘড়ীর কার্য্য শিক্ষা করিলে যদি অন্যান্য ব্যবসায় অপেক্ষা তাহাতে অধিক বেতন না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঘড়ীর কার্য্য শিক্ষা করিতে লোকের প্রবৃত্ত হইবে কেন? ফলতঃ অধিক বেতনের প্রত্যাশাতেই লোকে এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ঘড়ীওয়ালার ন্যায় উকীল চিকিৎসক

প্রভৃতির ব্যবসায় শিক্ষা করাও অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যয়সাধ্য ও কঠিন, এবং এই জন্যই ঘড়ীওয়ালা উকীল বা চিকিৎসক, কৃষক, সূত্রধর বা মজুরে অপেক্ষা অধিক বেতন পাইয়া থাকে।

তৃতীয়। যে ব্যবসায়ে ইচ্ছা হইলেই কার্য্য পাওয়া যায় না, কারিকরদিগকে মধ্যে মধ্যে বসিয়া থাকিতে হয়, তাহারও বেতন অন্যান্য ব্যবসায় অপেক্ষা অধিক। ইহার কারণ এই যে, মধ্যে মধ্যে বেকার বসিয়া থাকিতে হয় বলিয়া ইহাদিগকে কার্য্যের সময় এরূপ বেতন দিতে হয়, যে উহাদ্বারা তাহাদের বেকার অবস্থার ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াও কিঞ্চিৎ লাভ থাকে। নতুবা তাহারা ওরূপ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে কেন? রাজমিস্ত্রি প্রভৃতির ব্যবসায় এইরূপ। বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস কার্য্য করিয়া ইহাদিগকে বসিয়া থাকিতে হয়।

চতুর্থ। যে সকল ব্যবসায়ে কর্ম্মকরদিগের উপর অধিকতর বিশ্বাস করিতে হয় তৎসমুদায়ের বেতন অধিক। কারণ অবিশ্বস্ত লোকের উপর এরূপ কার্য্যের ভার দিলে বিলক্ষণ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা! স্বর্ণকার বা মণিকারের হস্তে অনেক টাকার দ্রব্য দিতে হয়, স্বর্ণকার অবিশ্বস্ত হইলে অনেক সময় ঠকিতে হয়। আবার স্বর্ণকার ও মণিকার নিজ নিজ ব্যবসায় চালাইবার জন্য যে সমস্ত কারিকর নিযুক্ত করে তাহাদিগেরও বিলক্ষণ বিশ্বাসভাজন হওয়া উচিত, নতুবা স্বর্ণকার বা মণিকারকে বিলক্ষণ প্রতারিত হইতে হয়। এই নিমিত্তই এইরূপ ব্যবসায়ের বেতন অধিক। চিকিৎসক ও উকীলদিগের যে বেতন অধিক ইহাও তাহার একটী কারণ। চিকিৎসককে জীবন দিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। উকীলকে ধনসম্পত্তি রক্ষা করিবার ভার দিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। সুতরাং এরূপ লোক অবিশ্বস্ত হইলে একেবারে সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা। এই কারণেই এই দুই ব্যবসায়ের বেতন প্রায় সকল ব্যবসায় অপেক্ষা অধিক।

পঞ্চম। শিক্ষা করিলেও যে ব্যবসায়ে প্রতিপত্তিলাভের নিশ্চয় নাই, তাঁহার বেতন অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া থাকে। যদি কাহাকেও

সূত্রধরের কার্য্য শিখান যায়, তাহা হইলে এরূপ নিশ্চয় বলা যাইতে পারে, যে, ঐ ব্যক্তি কালক্রমে সুনিপুণ কারিকর হইয়া উপযুক্ত অর্থো-পার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু এক জনকে উকীল বা ডাক্তার করিতে হইলে কখনই এরূপ বলা যাইতে পারে না, যে ঐ ব্যক্তি ভবিষ্যতে গণনীয় উকীল বা চিকিৎসক হইয়া নিজ ব্যবসায়ে বিলক্ষণ প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারিবে। কারণ এরূপ ব্যবসায় শিক্ষা করিবার যে সকল প্রতিবন্ধক আছে, তৎসমুদয় উত্তীর্ণ হইয়া যদিও কেহ শিক্ষা করিতে সমর্থ হয়, তথাপি এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে; যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি যে সকল গুণ থাকিলে ঐরূপ ব্যবসায়ে প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারা যায়, ঐ ব্যক্তির তাহা নাই, অথবা অতি সামান্য কিঞ্চিৎ আছে। অতএব এরূপ হইলে ঐ ব্যক্তির তাদৃশ পসার হয়না, আবার যদিও নূতন উকীলব্যবসায়ীর পূর্ব্বোক্ত গুণ সকল যথেষ্ট থাকে, তথাপি মোকদ্দমার দালাল ও মোক্তারদিগের সহিত আলাপ না থাকিলে হঠাৎ প্রতিপত্তিলাভ করা সহজ হয়না। কাজে-কাজেই এরূপ ব্যবসায়ের বেতন অন্যান্য অনেক ব্যবসায় অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে পাঁচটী নিয়মের উল্লেখ করা গিয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্যান্য নানাবিধ নিয়ম অনুসারে ও বেতনের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। আমাদের দেশে জাতিভেদ প্রচলিত আছে। অতএব সকল জাতিরই সকল প্রকার কর্ম্ম করা ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। সুতরাং এরূপ ব্যবসায় আছে, যাহার একচেটিয়া কতিপয় নির্দ্দিষ্ট জাতিরই হস্তগত, অপর জাতির লোকেরা সেই সকল কার্য্য করিতে পায়না। পৌরোহিত্য একটী ব্যবসায়, ইহা ব্রাহ্মণজাতির হস্তগত। কিন্তু সকল ব্রাহ্মণেই কৈবর্ত্ত কলু প্রভৃতি ইতর জাতির পৌরোহিত্য করেনা। যাহারা ঐ সকল জাতির পৌরোহিত্য করে তাহারা পতিত হয়। সুতরাং অন্য কোন জাতিই তাহাদের পৌরোহিত্য গ্রহণ করেনা। এই কারণে এক জাতির পুরোহিতেরা তাহাদের যজমানদিগের নিকট হইতে পৌরোহিত্যের সচরাচর যেরূপ বেতন তাহা অপেক্ষা অধিক লইয়া থাকে।

এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে কথিত হইয়াছে, যে মূলধন ও

শ্রমিকসংখ্যার পরস্পর সম্বন্ধ অনুসারেই বেতনের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। অর্থাৎ শ্রমিকসংখ্যা অবিচলিত থাকিয়া যদি মূলধনের বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে বেতনের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, আর যদি লোকসংখ্যা যেরূপ আছে সেইরূপই থাকে কিন্তু মূলধন কমিয়া যায়, অথবা যদি মূলধন যেরূপ আছে তাহাই থাকে, কিন্তু শ্রমিকদিগের সংখ্যা বাড়িয়া উঠে, তাহা হইলে বেতন কমিয়া যায়। এই দুইটীই বেতনের হ্রাসবৃদ্ধির সাধারণ নিয়ম। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে বেতনের হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারেনা। অনেকে বলিয়া থাকেন, যে কোন বিশেষ ব্যবসায়ের উন্নতি হইলে সেই ব্যবসায়ের পরিশ্রমীদিগের বেতনবৃদ্ধি হয়। ব্যবসায়ের উন্নতি হইলে বেতনবৃদ্ধি হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার কারণ কি? পূর্ব্বোক্ত নিয়মই তাহার কারণ। ব্যবসায়ের উন্নতি কাহাকে কহে? কিরূপে ব্যবসায়ের উন্নতি হয়? মূলধন বৃদ্ধি হইলেই উহার উন্নতি হয়। উন্নতি হইলেই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, কিন্তু মূলধনের বৃদ্ধি সহকারে ত আর তত্তদ্ব্যবসায়ের শ্রমজীবীদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়না। কাজে কাজেই পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অনুসারে বেতনের হার বৃদ্ধি হইয়া উঠে।

আবার অনেকে এরূপ বলিয়া থাকেন যে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হইলে সকল ব্যবসায়েরই পরিশ্রমের মূল্যবৃদ্ধি হয়, আবার খাদ্যদ্রব্যের মূল্য কম হইলে পরিশ্রমের বেতনও কমিয়া যায়। কিন্তু এরূপ বলা ভ্রমমাত্র। খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হইলে বেতনের মূল্যবৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, কখন কখন উহা পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়াও যায়, কারণ আকাল উপস্থিত হইলে দরিদ্র শ্রমজীবীরা আপনাদের ক্লেশনিবারণার্থ পূর্ব্বাপেক্ষা অল্পবেতনে পরিশ্রম করিতে বাধ্য হয়, কেহ অল্প বেতনে পরিশ্রম করিতে

আরম্ভ করিলে প্রতিযোগিতাবশতঃ সেই ব্যবসায়ের সকল শ্রমজীবীকেই অল্পবেতন লইয়া পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইতে হয়। তবে যদি এরূপ আকাল অল্পসময়ব্যাপী না হইয়া অধিক কাল চলিতে থাকে, তাহা হইলে শ্রমজীবীরা ধর্ম্মঘট করিয়া আপনাদের বেতন বাড়াইতে পারে। আবার খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য কম হইলেই যে পরিশ্রমের বেতন কমিয়া যায় ইহাও নহে। দেখ খাদ্যদ্রব্যের মূল্য কমিলে শ্রমজীবীরা পূর্ব্বাপেক্ষা অল্পব্যয়ে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে, সুতরাং চেষ্টা করিলেই পূর্ব্বতন বেতনে পরিশ্রম করিতে অসম্মত হইয়া আপন পরিশ্রমের বেতন বর্দ্ধন করিতে সমর্থ হয়। ফলতঃ যদি পরিশ্রমীর সংখ্যা প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক থাকে, তাহা হইলে খাদ্যসামগ্রীর যতই মূল্যবৃদ্ধি হউক না কেন কিছুতেই তাহাদের বেতনবৃদ্ধি হইতে পারেনা, আবার আবশ্যক অপেক্ষা শ্রমজীবীর সংখ্যা অল্প থাকিলে যদিও খাদ্যসামগ্রীর মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া যায়, তথাপি বেতনের হ্রাস হইতে পারে না।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে শ্রমজীবীদিগের কখন অল্প বেতন, কখন বা অধিক বেতন পাওয়া উচিত নহে। সকলেরই সকল সময়ে সমান বেতন পাওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু এরূপ মনে করা নিতান্ত অন্যায়। এরূপ করিলে স্বাধীনতার ব্যাঘাত হয়, এবং উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। যেরূপ বিক্রেতার নির্দ্দিষ্ট মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিতে বাধ্য হইতে হইলে ক্রেতার ক্ষতি হইতে পারে, সেইরূপ বেতন-দাতার নির্দ্দিষ্ট বেতনে শ্রমজীবীকে পরিশ্রম করিতে হইলে তাহারও বিলক্ষণ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। অতএব বেতনের হার নির্দ্ধারণ জন্য কোন নিয়ম না করিয়া উহা বেতনদাতা ও পরি-

শ্রমী ইহাদের পরস্পরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করাই যুক্তিসঙ্গত।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে চিকিৎসা ওকালতী প্রভৃতি উচ্চতম ব্যবসায়ের বেতন প্রতিযোগিতা অনুসারে না হইয়া চিরন্তন প্রথানুসারে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। এই সকল ব্যবসায়ে যে প্রতিযোগিতা নাই এরূপ কখনই বলা যায়না প্রত্যুত বিলক্ষণ প্রতিযোগিতা আছে। কিন্তু তথাপি এই সকল ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতাদ্বারা বেতন নির্দ্ধারণ হয় না। উকীল বা চিকিৎসকেরা পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া কখনই আপনাদের বেতন পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প করেন না, কিন্তু সকলের সুবিধার নিমিত্ত আপন আপন বন্ধুদিগের মধ্যে কার্য্য ভাগ করিয়া লয়েন। ইহার কারণ এই যে, এই দুই ব্যবসায়ে শ্রমজীবীর উপর যত বিশ্বাস করিতে হয়, অন্যান্য কোন ব্যবসায়েই তত নহে, অতএব যদি কোন উকীল বা চিকিৎসক আপন বেতন কমাইয়া দেন তাহা হইলে তাঁহার পসার না বাড়িয়া বরং কমিতে পারে, কারণ লোকে সহজেই মনে করিতে পারে অমুক ব্যক্তির তাদৃশ যোগ্যতা নাই, থাকিলে ঐ ব্যক্তি কেনই আপন বেতনের মূল্য কমাইবে? এইরূপ সংস্কার হইলে তাঁহার প্রতি লোকের বিশ্বাস কমিয়া যায়, কাজে কাজেই পসারের ও হানি হইয়া পড়ে। অতএব এরূপ স্থলে আপন পরিশ্রমের বেতন কমাইয়া ব্যবসায়ের অবমাননা করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ধনবিস্তৃতি—লাভ।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, যে একব্যক্তি অপরকে নিজ ভূমি

ব্যবহার করিতে দিয়া উহার পরিবর্ত্তে যাহা পায়, তাহার নাম খাজনা, ও শ্রমজীবীরা শ্রমের বিনিময়ে যাহা পাইয়া থাকে তাহার নাম বেতন। সেইরূপ ধনোৎপাদনকার্য্যে যাহারা মূলধন যোগাইয়া থাকে, তাহারা ঐ মূলধন যোগাইবার পরিবর্ত্তে যাহা পাইয়া থাকে, তাহাকে লাভ কহে। মূলধন সঞ্চয়ের ফলস্বরূপ ইহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে সপ্রমাণ করা হইয়াছে। ধনসঞ্চয় করিতে হইলে ব্যয়ের সংযম করিতে হয়। আমরা যাহা উপার্জ্জন করি ইচ্ছা করিলে সমুদয়ই ব্যয় করিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু সঞ্চয় করিতে হইলে তাহা না করিয়া আমাদিগকে ব্যয়ের সংযম করিতে হয়, নতুবা কখনই ধনসঞ্চয় হইতে পারে না। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে বেতন যেরূপ কায়িক পরিশ্রমের পুরস্কার সেইরূপ লাভও ব্যয়সংযমের পুরস্কার স্বরূপ। যে ব্যক্তি ব্যয়সংযমপূর্ব্বক ধনসঞ্চয় করিয়া ঐ সঞ্চিত ধন ধনোৎপাদন কার্য্যে নিযুক্ত করে সেই ঐ ব্যয়সংযমের পুরস্কারস্বরূপ লাভ পাইয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি ব্যবসায়ে আপন মূলধন নিয়োজিত করে, তাহা হইলে ঐ ব্যবসায়ে যাহা মোট উৎপন্ন হইবে তাহা হইতে মূলধন বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই তাহার লাভ। অর্থাৎ কোন ব্যবসায়ের উৎপন্ন ধন হইতে মূলধন বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই ঐ ব্যবসায়ের লাভ। মনে কর এক ব্যক্তি ৫০০ টাকা মূলধন লইয়া কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিল। এই মূলধন হইতে তাহাকে চাষের নিমিত্ত বীজ ও লাঙ্গল গরু প্রভৃতি উপকরণ সকল ক্রয় করিতে হয়, ও কৃষাণপ্রভৃতি মজুরদিগের বেতন দিতে হয়। অতএব চাষ হইতে যে ধন উৎপন্ন হইবে, তাহা হইতে তাহার মূলধন অর্থাৎ ঐ ৫০০ টাকা বাদ দিলে, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই ঐ কৃষিবৃত্তি ব্যক্তির লাভস্বরূপ ধরিতে হইবেক। আবার

ও পৌনঃ-পুনিক মূলধনের পরস্পর কিরূপ প্রভেদ তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে নির্ণীত হইয়াছে, এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে ব্যবসায়ের একবার-কার উৎপন্ন ধন হইতে তাবৎ স্থাবর মূলধন উদ্ধৃত হইতে পারে না, অনেকবার ব্যবসায় চলিতে চলিতে ক্রমশঃ স্থাবর মূলধন উঠিয়া থাকে। চাষ করিতে হইলে লাঙ্গল গরু গোলা প্রভৃতি নানাপ্রকার স্থাবর মূলধনের প্রয়োজন হয়, কিন্তু একবারের ফসল হইতে কখনই এই সমুদয়ের দাম উঠিয়া লাভ হইতে পারে না। তবে মজুরি প্রভৃতি যে সমস্ত প্রকারে পৌনঃ-পুনিক মূলধন ব্যয়িত হয় তাহা একবারেই উঠিয়া যায়। নীট করিয়া বলিতে হইলে এই বলিতে হইবে যে, ব্যবসায়ের উৎপন্ন ধন হইতে সমুদয় পৌনঃ-পুনিক মূলধন ও স্থাবর মূলধনের কিয়দংশ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ঐ ব্যবসায়ের লাভ। তবে কিছুদিন এইরূপ চলিলে যখন স্থাবর মূলধন সমুদয় উঠিয়া যায়, তখন উৎপন্ন ধন হইতে সামান্যতঃ "মূলধন বাদ দিলে" এরূপ বলা যাইতে পারে। কেবল ব্যয়-সংযমের পুরস্কার যে লাভ এইরূপ নহে, অর্থাৎ কেবল মূলধনের সুদ পাওয়াই যে লাভ এরূপ বলা যুক্তিসিদ্ধ নহে। কারণ ব্যবসায়মাত্রেই ধনীকে নিজেও পরিশ্রম করিতে হয়। ব্যবসায় চালাইবার নিমিত্ত যে সকল লোক নিযুক্ত করা যায় ধনীকে তাহাদিগের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে হয়। ইহাতে ধনীর পরিশ্রম ও সময়ব্যয় হইয়া থাকে। অতএব ব্যবসায় হইতে যাহা লাভ হয়, তাহার কিয়দংশ ধনীর নিজের তত্ত্বাবধানপরিশ্রমের বেতনস্বরূপ ধরিতে হইবে। কারণ পরিশ্রম ও সময়ব্যয় দ্বারা ধনোপার্জ্জন হইবে এরূপ আশা না থাকিলে কেহই বৃথা পরিশ্রম ও সময়ব্যয় করিতে চাহে না। আবার সকল ব্যবসায়েই কিছু না কিছু ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। কোন ব্যবসায়ে

ক্ষতির সম্ভাবনা অল্প, কোন ব্যবসায়ে বা ক্ষতির সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অধিক। যদি কোন ব্যক্তি আপন মূলধন গবর্ণমেণ্ট বা কোন বিশ্বস্ত কোম্পানি বা ব্যক্তির হস্তে ঋণস্বরূপে রাখিয়া দেয়, তাহা হইলে ঐ ধন নিরাপদে থাকে, উহার ক্ষতি হইবার প্রায় সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু যদি তাহা না করিয়া ধনী আপন ধন কোন ব্যবসায়ে নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে ঐ ধন আর পূর্ব্বের মত নিরাপদ থাকে না। ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া উঠে। প্রাকৃতিক ও মানুষিক উভয় কারণেই ব্যবসায়ের ক্ষতি হইতে পারে। মনে কর হাজাশুকা প্রভৃতি কারণে এক বৎসর মূলে ফসল জন্মিলনা, বা কাহারও মাল-বোঝাই জাহাজ ডুবিয়া গেল, এরূপ হইলে যে ক্ষতি হইল তাহা অনিবার্য্য। আবার ব্যবসায় করিতে গিয়া ব্যবসায়ীকে অনেক সময় প্রতারিত হইতে হয়। অতএব এই সকল কারণে ব্যবসায়ের লাভ হইতে উহার সম্ভাবিত ক্ষতির কিয়দংশে পূরণ হওয়া উচিত। এই কারণেই, অর্থাৎ ক্ষতির সম্ভাবনা অধিক বলিয়া কোম্পানির সুদ অপেক্ষা অন্যান্য সুদের হার অধিক, আবার এই কারণেই বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিতে হইলে, যাহা সুদ লওয়া যায় শুধু হাতে টাকা দিলে তদপেক্ষা অধিক সুদ গৃহীত হইয়া থাকে। এক্ষণে প্রতিপন্ন হইতেছে, যে লাভের সর্ব্বশুদ্ধ তিনটী উপকরণ বা অংশ।

১ ম। সঞ্চয় বা ব্যয়সংযমনের পুরস্কার।

২ য়। সম্ভাবিত ক্ষতির আংশিক পূরণ।

৩ য়। তত্ত্বাবধানশ্রমের বেতন।

এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, লাভ যে তিনটী অংশে বিভক্ত হইল, ঐ তিনটী অংশ সর্ব্বদাই যে এক ব্যক্তিই পাইয়া থাকে এরূপ কখনই বলা যায় না। এক ব্যক্তি তিনটী

অংশই পাইতে পারে, আবার স্থলবিশেষে এক ব্যক্তি তিনটীর মধ্যে দুইটী পাইয়া থাকে। কখন বা একটীমাত্র পায়। যে স্থলে ব্যবসায়ী নিজের টাকা ব্যয় করিয়া ও নিজে তত্ত্বাবধানশ্রম স্বীকার-পূর্ব্বক নিজে ক্ষতির সম্ভাবনা সহ্য করিয়া ব্যবসায় করিয়া থাকে, তথায় লাভের তিনটী অংশ এক ব্যক্তিই পাইয়া থাকে। কিন্তু যে স্থলে মূলধন ব্যবসায়ীর নিজের নহে, ব্যবসায়ী অপরের নিকট কর্জ্জ করিয়া কারবার চালাইয়া থাকে, তথায় লাভের প্রথম অংশটীমাত্র অর্থাৎ টাকার সুদ, যাহার টাকা সেই পায়, আর অপর দুইটী অংশ অর্থাৎ তত্ত্বাবধানশ্রমের বেতন ও সম্ভাবিতক্ষতির পূরণ ব্যবসায়ী নিজে পাইয়া থাকে। আবার যেস্থলে ধনী আপন মূলধন অপরকে ব্যবহার করিতে দেয়, ও ব্যবসায়ের ক্ষতি হইলে সেই ক্ষতির কিঞ্চিদংশ নিজে সহ্য করিতে স্বীকৃত হয়, তথায় ধনী ব্যবসায়ের লাভ হইতে টাকার সুদ ও সম্ভাবিতক্ষতির পূরণেরও কিয়দংশ পাইতে পারে। আবার এরূপ হওয়াও অসম্ভব নহে, যে কোন ব্যবসায়ে এক ব্যক্তি কেবল মূলধন ব্যবহার করিতে দেয় এই মাত্র, সুতরাং সে কেবল সুদ পাইয়া থাকে, অপর এক ব্যক্তি ক্ষতি সহ্য করিবার ভার লয়, অতএব সে কেবল সম্ভাবিতক্ষতির পূরণই পাইয়া থাকে। আবার আর এক ব্যক্তি কেবল ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধান করে, সুতরাং সে কেবল তত্ত্বাবধানশ্রমের বেতনমাত্র পায়। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল ও ইহাতে কাহারও সুবিধা নাই।

একণে পূর্ব্বোক্ত লাভাংশত্রয়ের-পৃথক্ পৃথক্ বিচার করা যাইতেছে।

১ম। লাভের যে অংশটী সঞ্চয় বা ব্যয়সংযমের পুরস্কারস্বরূপ সেটী অতি সহজেই নির্ণীত হইতে পারে। সকল সভ্যসমাজেই অর্থ এরূপে বিন্যস্ত করিতে পারা যায়, যে উহা নিরাপদে থাকে।

উহার ক্ষতি হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকেনা। আমাদের দেশে গবর্নমেন্ট বা মিউনিসিপালিটীকে অর্থ ধার দিলে কোন নির্দ্দিষ্ট হারে উহার সুদ পাওয়া যায়। এবং এইরূপে অর্থ রাখিলে কিছুমাত্র ক্ষতির সম্ভাবনা থাকেনা, অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে এই রূপে নিরাপদ অবস্থায় টাকা রাখিলে উহা হইতে যাহা সুদ পাওয়া যায় তাহাকেই ব্যয়সংযমক্লেশের পুরস্কারস্বরূপ গণনা করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় টাকা রাখিলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকেনা, সুতরাং এরূপ স্থলে ক্ষতি-পূরণের হিসাবে কিছুই পাওয়া যায়না। আবার এইরূপে সঞ্চিতধন হইতে সুদ পাইবার জন্য ধনীকে কিছুমাত্র পরিশ্রম স্বীকার করিতেও হয়না। অতএব এরূপ স্থলে টাকার যে সুদ পাওয়া যায়, তাহা ব্যয়সংযমক্লেশের পুরস্কার ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপে টাকা রাখিলে যে সুদ পাওয়া যায়, তাহাকে সুদের 'চলিত হার' কহা যায়, সুতরাং কত টাকা হইতে সঞ্চয়ের পুরস্কারস্বরূপ কত পাওয়া যাইতে পারে তাহা দেশের সুদের চলিত হারের প্রতি দৃষ্টি করিলে অনায়াসেই স্থির করিতে পারা যায়। সকল দেশে সুদের চলিত হার সমান নহে। ইংলণ্ড বা আমাদের দেশ অপেক্ষা অষ্ট্রেলিয়ার সুদের চলিত হার অনেক অধিক। আবার এক দেশেও সকল সময়ে উহা একরূপ থাকেনা, আমাদের দেশে কিছু দিন পূর্ব্বে সুদের চলিত হার শতকরা ৫ টাকা ছিল, কিন্তু এক্ষণে শতকরা ৪ বা ৩৷৷০ টাকার অধিক নাই। যদি সুদের চলিত হার শতকরা বাৎসরিক ৪ টাকা হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ৫০০ টাকা লইয়া কারবার করিতেছে, সে পরিশ্রমের বেতন ও সম্ভাবিত-ক্ষতির পূরণের উপর বাৎসরিক ২০ টাকা সুদ পাইয়া থাকে। এই ২০ টাকা সেই ব্যক্তি স্বয়ং পরিশ্রম ও ক্ষতি সহ্য করিবার ভার না লইয়াও পাইতেছে। অতএব এস্থলে এই ২০ টাকাই তাহার ব্যয়সংযমক্লেশের পুরস্কারস্বরূপ।

২য়। লাভের প্রথম অংশটী নিরূপণ করা যেরূপ সহজ, দ্বিতীয় অংশটী নিরূপণ করা সেইরূপ কঠিন। কখন কখন ব্যবসায়ীরা সম্ভাবিত ক্ষতি সহ্য করিবার আংশিক ভার লইবার জন্য অপরকে আপন আপন লাভের কিয়দংশ দিয়া থাকে। যাহারা এইরূপ ভার লয়, ব্যবসায়ে ক্ষতি

হইলে উহারা ধনীর ক্ষতিপূরণ করিয়া থাকে। কিন্তু লাভ অপেক্ষা লোকসান হইবার সম্ভাবনা অনেক অল্প, সুতরাং উহারা দশটী স্থলে লাভ করে ও একটী স্থলে ঐ লাভের অংশ হইতে ধনীর ক্ষতিপূরণ করিয়া দেয়। ইংলণ্ডদেশে ব্যবসায়ীরা অগ্নিদ্বারা মাল নষ্ট হইয়া পাছে ক্ষতি হয়, সেই সম্ভাবিত ক্ষতির পূরণার্থ ক্ষতিপূরণব্যবসায়ীদিগকে লাভের কিঞ্চিৎ অংশ দিয়া থাকে। এইরূপ বোঝাই জাহাজ ডুবিয়া যাইলে যে ক্ষতি হইতে পারে, লাভের অংশ দিয়া তাহারও আংশিক পূরণ করিয়া থাকে। আমাদের দেশে এরূপ নিয়ম নাই, সুতরাং ব্যবসায়ে লোকসান হইলে উহা কেবল ব্যবসায়ীকেই সহ্য করিতে হয়, আর কেহ উহার অংশ লয়না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্ষতিপূরণের উপায় থাকিলেও কোন ব্যবসায়ের লাভ হইতে ক্ষতিপূরণের হিসাবে কি পাওয়া উচিত ইহার স্থিরনির্ণয় করিতে পারা যায় না। কারণ দৈব ও মানুষিক উভয়বিধ কারণেই ব্যবসায়ের ক্ষতি হইতে পারে। সুতরাং সকল ব্যবসায়ে ক্ষতির সম্ভাবনা সমান নহে। কোন ব্যবসায়ে ক্ষতির সম্ভাবনা যেরূপ অপর ব্যবসায়ে তদপেক্ষা অল্প, অতএব ক্ষতিপূরণের হিসাবে ব্যবসায়ের লাভ হইতে কি পাওয়া উচিত, ইহার নিরূপণ করিতে হইলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, যে যে ব্যবসায়ে ক্ষতির সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অধিক তাহাতে ক্ষতিপূরণের হিসাবে অধিক পাওয়া উচিত, আর যাহাতে ঐ সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অল্প, তাহাতে ক্ষতিপূরণের হিসাবে অপেক্ষাকৃত অল্প পাওয়া বিধেয়। যদি কোন ব্যবসায়ী নিজে ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধান না করিয়া অপরকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে তিনি ঐ ব্যবসায়ে যাহা সুদ পান তাহা হইতে সুদের চলিত হার বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই ঐ ব্যবসায়ের সম্ভাবিত ক্ষতির আংশিক পূরণস্বরূপ বুঝিতে হইবে, কারণ ঐস্থলে ধনীকে নিজে তত্ত্বাবধানশ্রম করিতে হইতেছেনা, সুতরাং তিনি লাভের তিন অংশের দুই অংশ পাইতেছেন, অর্থাৎ ব্যয়সংযমের পুরস্কার ও সম্ভাবিত ক্ষতির পূরণ এই দুইটীই তাঁহার প্রাপ্য। কিন্তু ব্যয়সংযমের পুরস্কার সুদের চলিত হার অনুসারে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, সুতরাং তাঁহার প্রাপ্ত ধন হইতে ব্যয়সংযমের পুরস্কার বাদ

দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই ঐ ব্যবসায়ের সম্ভাবিত ক্ষতির পূরণের হিসাবে প্রাপ্য। আমাদের দেশে যখন পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি সংঘটিত হয়, তৎকালে কোম্পানির কাগজের সুদ অপেক্ষা শতকরা অনেক অধিক সুদে উহার অংশ ক্রয় করিতে পাওয়া যাইত, যদি ঐ কোম্পানির কার্য্য নির্বিঘ্নে চলিত, তাহা হইলে উহা হইতে গবর্ণমেন্টের সুদ অপেক্ষা অধিক লাভ পাওয়া যাইত সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে মাতলা সহরে বাণিজ্যের বন্দর হইবার সুবিধা না হওয়াতে উক্ত কোম্পানি ফেল হইয়া গেল ও উহাতে যাহারা টাকা ফেলিয়াছিল তাহাদের বিলক্ষণ লোকসান হইল। এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে, এইরূপ বিপদের সম্ভাবনা ছিল বলিয়াই উক্ত কোম্পানির বকরায় অত অধিক লাভের সম্ভাবনা ছিল, নতুবা কখনই ওরূপ হইত না। আমাদের দেশে বিলাতী ঔষধবিক্রেতারা অন্যান্য ব্যবসায়ীদিগের অপেক্ষা অধিক লাভ লইয়া থাকে। ইহার কারণ এই অন্যান্য ব্যবসায় অপেক্ষা ঔষধের ব্যবসায়ে ক্ষতির সম্ভাবনা অধিক। অনেক ঔষধ বহুকাল অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে পারে। এই রূপ অধিক কাল পড়িয়া উহা অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। সুতরাং ঐ রূপ ঔষধ ফেলিয়া দিতে হয়। ইহাতে বিলক্ষণ ক্ষতির সম্ভাবনা। আবার ডাক্তারদিগের সাহায্য ব্যতিরেকে ঐ ব্যবসায় চলা কঠিন হয়, কারণ ডাক্তারদিগের ব্যবস্থা না পাইলে ত আর লোকে কোন ব্যবসায়ীর নিকট ঔষধ ক্রয় করে না। সুতরাং ঔষধবিক্রেতারা ডাক্তারদিগের সাহায্য পাইবার নিমিত্ত আপন আপন লাভ হইতে ডাক্তারদিগকে কিছু কিছু কমিসন দিয়া থাকে, নতুবা কারবার চলেনা। এই ব্যবসায়ে আবার প্রায়ই ধারে বিক্রয় করিতে হয়। টাকা আদায় করিতে বিলম্ব ও পড়ে, আর অনেক টাকা একবারে আদায় না হইতেও পারে। অতএব এই সকল ক্ষতির সম্ভাবনা পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে ঔষধব্যবসায়ীরা যে, অন্যান্য ব্যবসায়ীদিগের অপেক্ষা অধিক লাভ লয় ইহা কোন রূপে অন্যায্য নহে।

৩য়। উপরে লাভের যে দুইটী অংশের বিবরণ লিখিত হইয়াছে, মোট লাভ হইতে সেই দুইটী বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে,

তাহাকেই লাভের তৃতীয় অংশস্বরূপ গণনা করিতে হইবেক। অর্থাৎ তাহাই ধনীর তত্ত্বাবধারণের বেতনস্বরূপ। যে ব্যবসায়ে তত্ত্বাবধারণের অধিক তাহার লাভ ও অধিক, আর যাহার তত্ত্বাবধারণ অপেক্ষাকৃত অল্প তাহার লাভ ও অপেক্ষাকৃত অল্প।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, সকল দেশে সুদের চলিত হার সমান নহে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে সুদের চলিত হার ভিন্ন ভিন্ন। ইংলণ্ডে সুদের চলিত হার শতকরা ৩ টাকা, আমাদের দেশে ৫ টাকা, আবার অষ্ট্রেলিয়ায় শতকরা ১০ টাকা। আবার কালভেদেও সুদের তারতম্য হয়। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে সুদের চলিত হার শতকরা ৮ টাকা ছিল, এক্ষণে কমিয়া ৩ টাকা হইয়াছে। আমাদের দেশেও কিছু দিন পূর্ব্বে সুদের চলিত হার ৫ টাকা ছিল, এক্ষণে ৪ টাকা হইয়াছে। কি কারণে এইরূপ সুদের তারতম্য হইয়া থাকে তাহা সুদের পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে। তবে এস্থলে এ সকল বিষয় উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, সকল দেশেই কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সুদের চলিত হার একরূপই থাকে। এক সময়ে একদেশে সুদের চলিত হার নানাপ্রকার থাকে না। সুদের চলিত হার নির্দ্দিষ্ট ও স্থির। ইহাদ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে, লাভের প্রথম অংশটী অর্থাৎ ব্যয়সংবরণক্লেশের পুরস্কার অর্থাৎ মূলধনের সুদ সকল ব্যবসায়েই সমান, ব্যবসায়ভেদে ইহার বিভিন্নতা হয় না। এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ে যে ভিন্নভিন্ন প্রকার লাভ হইয়া থাকে, তাহা কেবল লাভের অপর দুইটী অংশ অর্থাৎ সম্ভাবিত ক্ষতির পূরণ ও তত্ত্বাবধারণের বেতন এই উভয়ের তারতম্য অনুসারেই হয়। নতুবা প্রথম অংশ অর্থাৎ মূলধনের সুদের এ বিষয়ে কিছুমাত্র উপযোগিতা নাই। যে ব্যবসায়ে ক্ষতির সম্ভাবনা বা তত্ত্বাবধারণ অথবা উভয়ই অপেক্ষাকৃত অধিক, তাহার লাভও অন্যবিধ ব্যবসায় অপেক্ষা অধিক। আর যে ব্যবসায়ে ঐ সকল অপেক্ষাকৃত অল্প তাহার লাভ ও অপেক্ষাকৃত অল্প।

সকল ব্যবসায়েরই লাভের এক একটী নির্দ্দিষ্ট পৃথক্ পৃথক্ হার আছে, ঐ লাভ হইতে সেই সেই ব্যবসায়ের মূলধনের

সুদ, সম্ভাবিত ক্ষতির পূরণ, ও তত্ত্বাবধানশ্রমের বেতন সমুদায়ই পোষাইয়া যায়। এই নির্দ্দিষ্ট হারে লাভ না হইয়া যদি উহা অপেক্ষা অল্প হইয়া পড়ে তাহা হইলে ব্যবসায়ে লোকসান হয়, আর অধিক দিন এরূপ অবস্থা থাকিলে কোন ব্যবসায়ই চলিতে পারেনা। প্রত্যেক ব্যবসায়েই এই নির্দ্দিষ্ট লাভের হার ভিন্ন ভিন্ন। কোন দুই বা ততোঽধিক ব্যবসায়েই উহা একরূপ হইতে পারেনা। তবে যে সকল ব্যবসায়ে ক্ষতির সম্ভাবনা ও তত্ত্বাবধানশ্রমের বেতন এই উভয়ের পরস্পর প্রভেদ এত অল্প যে ব্যবসায়ীরা ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই একটী ব্যবসায় পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন করিতে পারে, তাহা হইলে প্রতিযোগিতানিবন্ধন ঐ সকল ব্যবসায়ে লাভের হার প্রায় সমান হইয়া পড়ে, কিন্তু কখনই একবারে অভিন্নপ্রকার হইতে পারেনা।

সকল ব্যবসায়েই লাভের এক একটী নির্দ্দিষ্ট হার আছে যথার্থ বটে, কিন্তু এই হার সর্ব্বদা একভাবে থাকেনা। কখন কখন ব্যবসায়ের লাভ ঐ নির্দ্দিষ্ট হার অপেক্ষা নাবিয়া পড়ে, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট হার অপেক্ষা অল্প লাভ হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু লাভের এইরূপ বর্দ্ধিত বা অবনত অবস্থা চিরকাল স্থায়ী হইতে পারেনা। ফলতঃ লাভের হার নিরন্তর ঐ নির্দ্দিষ্ট হারের অভিমুখে ধাবমান। কোন কারণে কিছুদিন নির্দ্দিষ্ট হার অপেক্ষা অধিক লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু এরূপ অবস্থা চিরস্থায়ী হইবার নহে। কিছুদিন এইরূপ চলিয়া আবার কমিতে আরম্ভ হয় এবং পরিশেষে সাবেক অবস্থায় অর্থাৎ চিরনির্দ্দিষ্ট হারে পরিণত হয়। আবার যদি নির্দ্দিষ্ট হার অপেক্ষা লাভ কমিয়া যায়, তাহা হইলে ওরূপ অবস্থাও চিরস্থায়ী হয়না। কিছুদিন ঐরূপ যাইয়া আবার বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ

হয় এবং কালক্রমে আবার সেই পূর্ব্বমত হারে পরিণত হইয়া যায়। কোন ব্যবসায়ের উন্নতি হইলে লোকে স্বভাবতই অধিকতর লাভ পাইবার আশয়ে উহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মূলধন নিক্ষেপ করে। পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূলধন নিক্ষিপ্ত হইলেই আবার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎপন্ন হইতে থাকে, সুতরাং কিছুকাল এরূপ চলিলে আবশ্যক অপেক্ষা অধিক উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হয়। কাজে কাজেই কালক্রমে আবার উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য কমিতে আরম্ভ হয়, সুতরাং ব্যবসায়ের লাভ কমিয়া কমিয়া ক্রমে আবার চিরনির্দ্দিষ্ট হারে পরিগণিত হইয়া যায়। মনে কর আমাদের দেশে পাটের ব্যবসায়ের উন্নতি হইল। পাটের ব্যবসায়ীরা সকলেই অধিক লাভের প্রত্যাশায় নিজ নিজ ব্যবসায়ের মূলধন বাড়াইতে আরম্ভ করিল, যাহারা ইতিপূর্ব্বে পাটের ব্যবসায় করিতনা তাহারাও লাভের প্রত্যাশায় পাটের কারবার আরম্ভ করিল। এইরূপে পাটের ব্যবসায়ে বিলক্ষণ লাভ হইতে আরম্ভ হইল ও ইহার মূলধন অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু এইরূপে মূলধনবৃদ্ধির সহিত ব্যবসায়ের লাভ কমিবারও সূত্রপাত হইয়া থাকে কারণ পাটের ব্যবসায়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মূলধন ব্যাপৃত হওয়াতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাট জন্মিতে থাকে এবং কিছুকাল এরূপ চলিলে প্রয়োজন অপেক্ষাও অধিক পাট উৎপন্ন হইতে থাকে, সুতরাং আবার পাটের মূল্য কমিয়া যায় এবং পাটের ব্যবসায়ের লাভ পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া কমিয়া সাবেক অবস্থায় উপস্থিত হয়। আবার এরূপ হওয়াও অসম্ভব নহে যে লাভ একবার অবনতির উন্মুখ হইলে নির্দ্দিষ্ট হারে পৌঁছিয়াই স্থগিত হয়না, ক্রমাগত অবনত হইয়া পরিশেষে নির্দ্দিষ্ট হারের নীচে নামিয়া যায়। এক্ষণে প্রতিপন্ন হইল যে কোন ব্যব-

সায়ের লাভ নির্দ্দিষ্ট হার অপেক্ষা উন্নত হইলে কালক্রমে আবার অবনত হইয়া পড়ে।

গত কয়েক বৎসরে আমাদের দেশে পাটের ব্যবসায়ের ঠিক এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। কয়েক বৎসর উহাতে অতিরিক্ত লাভ হয়, কিন্তু এক্ষণে আবার বাজার পড়িয়া গিয়াছে ও পাটের কারবারে অনেকের বিলক্ষণ লোকসান হইয়াছে। আবার মনে কর পাটের ব্যবসায়ের অবনতি হইল। পাটের ব্যবসায়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প লাভ হইতে লাগিল। ব্যবসায়ীদিগের লোকসান হইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু এরূপ অবস্থাও চিরকাল থাকিতে পারেনা। কালক্রমে আবার এই ব্যবসায়ের উন্নতি হইয়া থাকে। কারণ এইরূপ অবস্থা হইলেই ব্যবসায়ীরা পাটের ব্যবসায়ে আর অধিক টাকা নিক্ষেপ করেনা। যাহাও নিক্ষিপ্ত আছে তাহাও তুলিয়া লইবার চেষ্টা করে। তুলিতে পারিলেই অন্যান্য লাভজনক ব্যবসায়ে অর্পণ করিয়া থাকে। অতএব পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প পাট জন্মিতে থাকে। আবার কিছুদিন এরূপ চলিলে ক্রমে প্রয়োজন অপেক্ষা সর্ব্বরাহ কম হইয়া পড়ে। প্রয়োজন অপেক্ষা সর্ব্বরাহ কমিলেই আবার পাটের মূল্যবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয় ও পাটের ব্যবসায়ে আবার লাভ হইতে থাকে। এইরূপে লাভের হার উন্নত হইয়া পরিশেষে আবার চিরনির্দ্দিষ্ট হারে উপস্থিত হয়, এবং ক্রমে ঐ হার অতিক্রম করিয়া আরও উন্নত হইতে পারে। এক্ষণে সপ্রমাণ হইল যে ব্যবসায় মাত্রের লাভের হার তত্তদ্ব্যবসায়ের নির্দ্দিষ্ট লাভের হার অপেক্ষা বাড়িয়া বা কমিয়া চিরকাল সেইরূপ অবস্থায় থাকিতে পারেনা। কালক্রমে আবার পূর্ব্বের অবস্থায় উপস্থিত হয়, কিন্তু ইহা অল্প সময়ে হইতে পারেনা। মনে কর যে স্থলে লাভের হার বাড়িয়া উঠিয়াছে, সে স্থলে উহাতে

লাভের প্রত্যাশায় অধিক মূলধন নিক্ষিপ্ত হয়। এই নূতন নিক্ষিপ্ত মূলধন কার্য্যকর হইলে প্রয়োজন অপেক্ষা সরবরাহ কমিয়া যায়, সুতরাং ব্যবসায়ের লাভও কমিয়া যায়। কিন্তু ঐ নূতন নিক্ষিপ্ত মূলধন কার্য্যকর হইতে ব্যাপক-কাল অতিবাহিত হয়, কারণ বহুবিধ যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়াই প্রায় ঐরূপ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ইচ্ছামাত্র কোন ব্যবসায়েই প্রবৃত্ত হওয়া যায়না, অতএব যতদিন ঐ নূতন মূলধন কার্য্যকর না হয়, ততদিন লাভের হার নির্দ্দিষ্ট হার অপেক্ষা অধিক থাকিয়া যায়। এইরূপ লাভের হার নির্দ্দিষ্ট হার অপেক্ষা কমিয়া গেলে আবার বাড়িয়া উঠে ইহাও যথার্থ বটে, কিন্তু ইহাতেও সময় অপেক্ষা করে। এরূপ স্থলে ব্যবসায় হইতে মূলধনের অপসারণই ঐ ব্যবসায়ের লাভবৃদ্ধির কারণ, কিন্তু যে ব্যবসায়ে নানাবিধ উপকরণসামগ্রী লইয়া প্রবৃত্ত হইতে হয়, ইচ্ছামাত্র তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া মূলধন অপসারিত করা যাইতে পারেনা। ইহাতে কাল অপেক্ষা করে। সুতরাং এরূপ স্থলে মূলধন অপসারিত করিতে যতদিন বিলম্ব হয়, ততদিন তত্তদ্ব্যবসায়ের লাভের হার অবনত অবস্থাতেই থাকিয়া যায়।

এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে লাভের যে তিনটী অঙ্গ প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই তিনটীর মধ্যে একটী বাড়িলেও ব্যবসায়ের লাভ বাড়িয়া থাকে। অর্থাৎ টাকার সুদ, ক্ষতির সম্ভাবনা, বা তত্ত্বাবধানশ্রম এই তিনটীর এক একটী বাড়িলেই লাভ বাড়িয়া থাকে, দুইটী বা তিনটী যুগপৎ বাড়িয়া উঠিলে ত আর কথাই নাই।

অনেকের এইরূপ সিদ্ধান্ত আছে, যে লাভের হার, শ্রমিকদিগের বেতনের হারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অর্থাৎ কোন ব্যবসায়ে শ্রমিকদিগের বেতন যে পরিমাণে বাড়িয়া উঠে,

সেই ব্যবসায়ের লাভও সেই পরিমাণে কমিয়া যায়। আবার শ্রমিকদিগের বেতন যে পরিমাণে কমিয়া যায়, ব্যবসায়ের লাভও সেই পরিমাণে বাড়িয়া উঠে। কোন একটী শিল্পকার্য্য উপলক্ষ করিয়া পরীক্ষা করিলে এই বিষয় অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইবে। কোন শিল্পকার্য্য হইতে যে ধন উৎপন্ন হয়, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, এক ভাগ শ্রমিকেরা পায়, আর এক ভাগ ধনী পাইয়া থাকে, অর্থাৎ এক ভাগ শ্রমিকদিগের বেতন, আর এক ভাগ ধনীর লাভস্বরূপ হয়। অতএব এই দুই ভাগের একটী কম হইলে অপরটী আপনিই বাড়িয়া উঠে। আবার একটী বাড়িয়া উঠিলে অপরটী কমিয়া যায়। যদি বেতনের ভাগ বাড়িয়া উঠে তাহা হইলে লাভের ভাগ কমিয়া যায়, আর যদি বেতনের ভাগ কমিয়া যায় তাহা হইলে লাভের ভাগ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া উঠে। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কোন ব্যবসায়ে বেতন কমিলে লাভ বাড়িয়া উঠে, আর বেতন বাড়িলে লাভ কমিয়া যায়। কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই সিদ্ধান্তটী অপসিদ্ধান্ত, কারণ ধনোৎপাদনকার্য্যে নিযুক্ত মূলধনের কিয়দংশ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্যয়িত হয়, অর্থাৎ পরিশ্রমের বেতনদান প্রভৃতি বিষয়ে অর্পিত হইয়া থাকে, আর কিয়দংশ যন্ত্রাদিক্রয় প্রভৃতি বিষয়ে পরম্পরাসম্বন্ধে ব্যয়িত হয়। সুতরাং লাভের হারও এই উভয় প্রকারব্যয়ের সমষ্টির তারতম্য অনুসারে অল্প বা অধিক হইয়া থাকে। অর্থাৎ উৎপাদনব্যয়ের তারতম্য অনুসারে লাভের হারেরও তারতম্য হইয়া থাকে। উৎপাদনব্যয় যে পরিমাণে অল্প হয়, লাভের হারও সেই পরিমাণে অধিক হইয়া থাকে। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, লাভের হার কেবল পরিশ্রমের বেতনের

তারতম্য অনুসারে নির্দ্ধারিত হয়না। আবার মনে কর শ্রমিকদিগকে নিজ নিজ কার্য্যের বিষয় উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া হইল, ব্যবসায়ী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রম ও মনোযোগের সহিত কার্য্যের তত্বাবধান করিতে আরম্ভ করিলেন, আর ব্যবসায়ের উন্নতি করিবার নিমিত্ত উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া কার্য্য চালাইতে আরম্ভ হইল। অর্থাৎ এই সকল উপায়দ্বারা শ্রমের উৎপাদকতা শক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে বাড়িয়া উঠিল। এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে এই সকল উপায়ে যদি শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইতে পারা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বে যে পরিশ্রমদ্বারা যত ধন উৎপন্ন হইতেছিল এক্ষণে সেই পরিশ্রমদ্বারা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে ধন উৎপন্ন হইতে থাকে। এস্থলে পরিশ্রমের পরিমাণ একরূপ থাকিতেছে বলিয়া বেতনও একরূপ থাকিতেছে, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া লাভের পরিমাণ বাড়িয়া উঠিতেছে। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে বেতনের ভাগ না কমিলে লাভের ভাগ বাড়িতে পারে না এরূপ বলা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে।

মনে কর এক ব্যক্তি ১০ জন লোক খাটাইয়া একটী কারবার করিতেছে। ঐ ১০ জন লোকে পরিশ্রম করিয়া প্রতিদিন ১০ টাকার দ্রব্য উৎপন্ন করিতেছিল, তখন পরিশ্রমের বেতন /৪ চাউল, ও /৪ চারি সের চাউলের মূল্য ।০ আনা ছিল। সুতরাং ব্যবসায়ীকে সর্ব্বশুদ্ধ (।০ x ১০) অর্থাৎ ২॥০ টাকা বেতন দিতে হইত, অতএব ১০টাকা হইতে ২॥০টাকা বাদ দিয়া ৭॥০টাকা তাহার লাভ হইতেছিল। কিন্তু যদি কোন উপায়ে ব্যবসায়ী শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি এরূপে বাড়াইতে পারে, যে ঐ ১০জন লোকে দৈনিক ১০ টাকার দ্রব্য উৎপাদন না করিয়া ১৫ টাকার দ্রব্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বের অপেক্ষা বেতনবৃদ্ধি হয় না। প্রত্যেক মজুরের দৈনিক বেতন /৪ চাউলই থাকে। এইরূপ স্থলে যদি চাউলের দরবৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে মজুরীর বেতন সমান

থাকিয়া ও ধনীর লাভবৃদ্ধি হয়। কারণ এরূপ হইলে ১৫ টাকা হইতে ২॥০ টাকা মজুরী বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ ১২॥০ টাকা ধনী লাভস্বরূপে পাইতে পারে।

আবার যদি শ্রমের বেতন পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যায়, কিন্তু উহার উৎপাদিকা শক্তি একভাবেই থাকে, ও খাদ্যাদির দামবৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলেও ধনীর লাভ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। কারণ পূর্ব্বে যত জনে পরিশ্রম করিয়া যে ধন উৎপাদন করিতেছিল, এরূপ হইলে তাহা অপেক্ষা অল্পসংখ্যক লোকে পরিশ্রম করিয়া সেই পরিমাণে ধন উৎপন্ন করিতে পারে, সুতরাং বেতনের হিসাবে ধনীকে পূর্ব্বাপেক্ষা কম দিতে হয়। উপরে যে উদাহরণটী দেখান হইয়াছে, তাহাতে যদি শ্রমিকের বেতন /৫ চাউল না হইয়া /২ সের হয় তাহা হইলে ব্যবসায়ীকে ১০ টাকা হইতে বেতনের হিসাবে কেবল ১।০ মাত্র বাদ দিতে হয়, সুতরাং ৮৸০ তাহার লাভ থাকে। আবার যদি খাদ্যাদিসামগ্রীর দাম পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যায়, কিন্তু শ্রমিকের বেতন ও শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি উভয়ই পূর্ব্ববৎ থাকে, তাহা হইলেও ব্যবসায়ীর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকলাভ হয়, কারণ এরূপ স্থলে শ্রমক্রয়ের ব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে /৫ চাউলের দাম ।০ আনা না থাকিয়া যদি ৵০ হইয়া যায়, কিন্তু শ্রমিকদিগের বেতন পূর্ব্ববৎ /৫ চাউলই থাকে, ও ১০ জনে পরিশ্রম করিয়া প্রতিদিন ১০ টাকার দ্রব্যই উৎপাদন করিতে থাকে, তাহা হইলে ব্যবসায়ী পূর্ব্বকার ৭।০ টাকার স্থলে এক্ষণে ৮৸০ পাইবে, কারণ এক্ষণে খাদ্যদ্রব্যাদির মূল্য কমাতে ১০ জন মজুর পূর্ব্বমত বেতন পাইয়াও ১।০ সিকার অধিক পাইবে না।

এক্ষণে প্রতিপন্ন হইল যে ব্যবসায়ের লাভ শ্রমের বেতনের উপর নির্ভর করে না, কিন্তু শ্রমার্থ ব্যয়ের তারতম্য অনুসারেই লাভের তারতম্য হইয়া থাকে। শ্রমের ব্যয় আবার শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি, পরিশ্রমের বেতন, অর্থাৎ বেতনপ্রাপ্য খাদ্যাদি, ও ঐ বেতনপ্রাপ্য খাদ্যাদির দামের উপর নির্ভর করে। যদি পরিশ্রমের উৎপাদিকা শক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া উঠে, কিন্তু বেতন ও খাদ্যাদির মূল্য একরূপই থাকে, তাহা হইলে পরিশ্রমের ব্যয় অর্থাৎ উৎপাদনব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা

কমিয়া যায়। কারণ এরূপ হইলে অল্প পরিশ্রমে অপেক্ষাকৃত অধিক উৎপন্ন হইতে থাকে। যদি পরিশ্রমের বেতন কমিয়া যায়, কিন্তু উৎপাদিকা শক্তি ও খাদ্যাদির দাম একভাবেই থাকে তাহা হইলেও উৎপাদন ব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যায়। আবার যদি খাদ্যাদির মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যায়, কিন্তু উৎপাদিকা শক্তি ও শ্রমের বেতন একরূপ থাকে, তাহা হইলেও উৎপাদনব্যয় কমিয়া যায়। খাদ্যাদির মূল্য কম হইলে শ্রমিকদিগের বেতন কমাইলেও তাহাদের বিশেষ ক্ষতি হয়না, সুতরাং এরূপ স্থলে উৎপাদনব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা কমান যাইতে পারে। ইংলণ্ডে যে মজুর মাসিক ২০ টাকা উপার্জ্জন করে, সে রুটীর দর সেরকরা ৵০ করিয়া হইলেও, আপনি, স্ত্রী, ও দুইটী সন্তান সর্ব্বশুদ্ধ এই চারিটী পরিবারের ভরণপোষণ করিতে সমর্থ হয়। এরূপ স্থলে রুটীর দাম যদি সেরকরা ৵০ না থাকিয়া /১ করিয়া হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ২০ টাকা অপেক্ষা অল্প বেতন পাইলেও পরিবার চালাইতে পারে, অতএব এরূপ হইলে যদি উহার বেতন খাদ্যদ্রব্যাদির মূল্যের হ্রাস অনুসারে কিঞ্চিৎ কমিয়া যায়, তাহা হইলেও তাহার বিশেষ ক্ষতি হয়না, বরং বেতনদাতার লাভ বাড়িয়া উঠিতে পারে।

এক্ষণে প্রতিপন্ন হইল যে পূর্ব্বোল্লিখিত যে কোন কারণে হউক না কেন, উৎপাদনব্যয়ের হ্রাস হইলেই ব্যবসায়ীর লাভ পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িতে পারে। আবার যে কোন কারণেই হউক, যদি উৎপাদনব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে ব্যবসায়ীর লাভ পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যায়। অর্থাৎ যদি শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি কমিয়া যায়, কিন্তু বেতন ও খাদ্যাদির মূল্য একরূপই থাকে, তাহা হইলে লাভের হার পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যায়। যদি উৎপাদিকাশক্তি ও খাদ্যাদির দর একরূপ থাকিয়া শ্রমের বেতন বর্দ্ধিত হয় তাহা হইতেও লাভের হার পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইয়া পড়ে। আবার যদি শ্রমের বেতন অর্থাৎ তল্লভ্য খাদ্যাদি ও উৎপাদিকাশক্তি একরূপ থাকিয়া খাদ্যাদির

দামবৃদ্ধি হয় তাহা হইলেও ব্যবসায়ীর লাভের হার কমিয়া যায়।

যে কারণে প্রধানতঃ লাভের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা উপরে ব্যাখ্যাত হইল। কিন্তু এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, যে উক্ত কারণ ভিন্ন অন্যান্য কারণেও লাভের হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে। ব্যবসায়ীর বুদ্ধি, নৈপুণ্য, ভুয়োদর্শন প্রভৃতির তারতম্য অনুসারেও লাভের হারের তারতম্য হইতে পারে। যে ব্যবসায়ী অন্যের অপেক্ষা অধিক নিপুণ ও কার্য্যদক্ষ সে আপনার অপেক্ষা নীকৃষ্ট ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক লাভ করিতে পারে। আর যাহার নৈপুণ্যাদি অন্যের অপেক্ষা অল্প তাহার লাভও অপেক্ষাকৃত অল্প হয়। এতদ্ভিন্ন কোন কোন দেশে বা কোন কোন ব্যবসায়ে চিরন্তনপ্রথাও কিয়দংশে লাভের হ্রাসবৃদ্ধির সহকারিতা করিয়া থাকে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ধনবিস্তৃতি—বেতনবর্দ্ধন ও দারিদ্র্যনিবারণের উপায়।

সকল সভ্যসমাজের অধিবাসীদিগকেই ধনের ন্যূনাধিক্য অনুসারে ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র এই তিন প্রকার পৃথক পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ধনী ও মধ্যবিত্ত লোকেরা ধনোৎপাদনকার্য্যে প্রায়ই নিজ নিজ মূলধন ব্যাপৃত করিয়া থাকেন, ও দরিদ্রেরা পরিশ্রম করিয়া থাকে। ধনী ও মধ্যবিত্ত লোকেরা পরিশ্রমের বেতন দিয়া অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোকদিগকে ধনোৎপাদনকার্য্যে খাটাইয়া থাকেন, ও আপনারা ঐসকল পরিশ্রমের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। সকল সমাজেই ধনীর সংখ্যা অপেক্ষা দরিদ্রদিগের সংখ্যা অধিক ইহার কারণ কি?

কি কারণে কেহ ধনী, কেহ বা দরিদ্র হয়? কি উপায়েই বা দেশের দারিদ্র্যদুঃখ দূর করা যাইতে পারে? দরিদ্রদিগের মধ্যে অনেকে ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহারা ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া যদি পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ইহাদিগের কষ্টনিবৃত্তি হইতে পারে। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই এরূপ অলস, যে প্রাণপণেও পরিশ্রম করিতে চাহেনা, সুতরাং ভিক্ষুকদিগের ভরণপোষণার্থ সকল সমাজেই প্রায় কিছু কিছু ধন বৃথা ব্যয়িত হইয়া থাকে। ভিক্ষুকেরা ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা দেশের যে ধনভাগ হরণ করিয়া থাকে, যদি উহারা ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ পরিশ্রমের বেতনস্বরূপে ঐ ধনভাগ লইতে যত্নবান হয়, তাহা হইলে উহা হইতে সমাজের জন্য কিছু কিছু উৎপন্ন হইতেও পারে, উহাদিগেরও জীবিকানির্ব্বাহ হইয়া যায়। ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা লওয়াতে যদিও উহাদিগের জীবিকানির্ব্বাহ হয় বটে কিন্তু উহা অনুৎপাদক হইয়া যায়। সে যাহা হউক দরিদ্রদিগের মধ্যে সকলেই পরিশ্রমক্ষম নহে, অনেকেই উৎকট বা দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত বলিয়া পরিশ্রম করিতে অসমর্থ। সুতরাং এরূপ অক্ষম ব্যক্তিদিগের পরের উপর নির্ভর করা ভিন্ন অন্য উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ হইতে পারে না। অতএব এইরূপ অবস্থায় ভিক্ষুকদিগের নিমিত্ত কোনরূপ উপায় করিয়া সবল ও পরিশ্রমক্ষম ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহই ভিক্ষা করিতে পারিবেনা, করিলে দণ্ডিত হইবে এরূপ আইন হওয়া আবশ্যক। এরূপ হইলে ক্রমশঃ ভিক্ষুকের সংখ্যা কমিয়া যাইতে পারে, ও দারিদ্র্যের একটী কারণ অন্তর্হিত হয়। একণে সকল সভ্যসমাজেই প্রায় এইরূপ আইন হইয়াছে। ইংলণ্ডে পীড়িত আতুর অক্ষম

দরিদ্রদিগের প্রতিপালনার্থ সকল গৃহস্থকেই কিছু কিছু টেক্স দিতে হয়, আর সবল ও সক্ষম কোন ব্যক্তি ভিক্ষা করিলে তাহাকে দণ্ডিত হইতে হয়। আমাদের দেশে অক্ষম দরিদ্রদিগের ভরণপোষণের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ টেক্স দিতে হয় না, আমাদের দেশে লোকের দানপ্রবৃত্তি এত প্রবল, যে আমরা স্বেচ্ছাক্রমেই দরিদ্রদিগকে দান করিয়া থাকি, ইহার জন্য আইনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমরা অক্ষম দরিদ্রদিগকে যেরূপ ভিক্ষা দিয়া থাকি সক্ষম ও সবলশরীর ভিক্ষুকদিগকেও সেইরূপেই দান করিয়া থাকি। ইহাতে তাহাদিগের আলস্য ও ভিক্ষাবৃত্তির উৎসাহ দেওয়া হয়। সুতরাং সক্ষম ব্যক্তিরা ভিক্ষা করিলেই রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এইরূপ আইনের প্রবল প্রচার আবশ্যক। কিন্তু এইরূপ আইনের প্রবল প্রচার সহজ ব্যাপার নহে। আমাদের দেশের লোকেরা ধর্ম্ম বলিয়া ভিক্ষা দিয়া থাকে, সুতরাং এইরূপ আইন হইলে ধর্ম্মের ব্যাঘাত হয়। তবে কালক্রমে সভ্যতার উন্নতিসহকারে যখন লোকের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, তখনই আইন কার্য্যকর হইতে পারিবে।

সে যাহা হউক ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণ করিয়া সকলকে পরিশ্রমে প্রবৃত্ত করিতে পারিলেই যে দারিদ্র্যদুঃখের মূলোচ্ছেদ হইবে এরূপ কখনই বলা যায় না। কারণ ভিক্ষাবৃত্তি রহিত হইলেও আবার এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে, যে কেহ কেহ কর্ম্ম পাইবে না। যত পরিশ্রম দেশের প্রয়োজন, তদপেক্ষা লোকসংখ্যা অধিক হইলে কাজে কাজেই অনেককে নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিতে হইবে সন্দেহ নাই। তবে কি উপায়ে দারিদ্র্যদুঃখের অবসান হইবে? কি উপায়ে দরিদ্রদিগের অবস্থার উন্নতি হইয়া দেশের সুখসমৃদ্ধি-বৃদ্ধির সূত্রপাত হইবে? শ্রমজীবী-

দিগের অবস্থার উন্নতি করিতে পারিলেই দেশের দারিদ্র্য দূর হইতে পারে, ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত করা গিয়াছে। কিন্তু কি উপায়ে শ্রমজীবীদিগের অবস্থার উন্নতি হইতে পারে? অনেকে এই প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া বিলক্ষণ ভ্রমে পড়িয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, দেশের সমুদায় ধন একত্র করিয়া সকলকে সমানরূপে বিভাগ করিয়া দেওয়া উচিত। কেহ বা বলেন, ওরূপ না করিয়া দেশে প্রতিবৎসর যাহা উৎপন্ন হইতেছে তৎসমুদয় সকলকেই সমানরূপে ভোগ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু এই সকল উপায় অবলম্বন করিলে দারিদ্র্যদুঃখ নিবারিত না হইয়া বরং পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া উঠিতে পারে, কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। এইরূপ উপায় অবলম্বন করা নিষ্ফল ও অনিষ্টকর ইহা এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে নির্ণীত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে উহার পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। তবে বেতনবর্দ্ধনের প্রকৃত উপায় কি? পূর্ব্বে নির্ণীত হইয়াছে যে দেশের মূলধন হইতেই শ্রমজীবীরা আপন আপন পরিশ্রমের বেতন পাইয়া থাকে। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দেশের মূলধনবৃদ্ধি, বা শ্রমিকদিগের সংখ্যার হ্রাস এই উভয়ের একটী না একটী কারণে শ্রমিকদিগের বেতনবৃদ্ধি করা যাইতে পারে। এই দুইটী ভিন্ন বেতনবর্দ্ধনের প্রকৃত উপায় কিছুই নাই। যদি শ্রমিকদিগের সংখ্যা অপেক্ষা তাহাদিগকে নিয়োগ করিবার আবশ্যকতা অধিক হয়, অথবা যদি নিয়োগ করিবার প্রয়োজন অপেক্ষা শ্রমিকদিগের সংখ্যা অল্প হয়, তাহা হইলে শ্রমের বেতন বাড়িতে পারে। শ্রমিকদিগের সংখ্যা একরূপ রাখিয়া যদি দেশের মূলধন বাড়াইতে পারা যায় তাহাহইলে শ্রমজীবীদিগের সংখ্যা অপেক্ষা তাহাদিগকে নিয়োগ করিবার প্রয়ো-

জন অধিক হয়, সুতরাং শ্রমিকদিগের বেতনবৃদ্ধি হইতে পারে। আবার যদি মূলধনের অবস্থা একরূপ রাখিয়া শ্রমিকদিগের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কমাইতে পারা যায়, তাহা হইলে নিয়োগ করিবার প্রয়োজন অপেক্ষা শ্রমজীবীদিগের সংখ্যা অল্প হইয়া পড়ে, সুতরাং এরূপ স্থলেও শ্রমিকদিগের বেতনবৃদ্ধি হইতে পারে। এই উভয়ের বিপরীত অবস্থা হইলেই বেতন সর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যায়, ও কিছুকাল এইরূপ থাকিলে দেশের দারিদ্র্যদুঃখ উপস্থিত হইতে থাকে। এক্ষণে প্রতিপন্ন হইতেছে যে বেতনবর্দ্ধন করিবার দুইটী উপায় আছে। ১মঃ-শ্রমজীবীদিগের সংখ্যা অপেক্ষা তাহাদিগকে নিয়োগ করিবার আবশ্যকতা বর্দ্ধিত করা।২য়ঃ-নিয়োগ করিবার প্রয়োজন অপেক্ষা শ্রমজীবীর সংখ্যা অল্প করা। এই দুইটীর মধ্যে কোন্ টী অবলম্বন করা সহজ ও সুসাধ্য তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। এক্ষণে এইমাত্র উল্লেখ করিবার প্রয়োজন যে, বেতনবর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত যিনি যে উপায়ই উদ্ভাবন করুন না কেন, এই দুই নিয়মের প্রতিকূল হইলে উহা কখনই কার্য্যকর হইতে পারে না।অর্থাৎ এইরূপ কোন নিয়ম কার্য্যকর হইতে হইলে, উহাদ্বারা হয় লোকসংখ্যা অপেক্ষা নিয়োগ করিবার আবশ্যকতা বাড়াইতে হইবে, নয় নিয়োগ করিবার প্রয়োজন অপেক্ষা লোকসংখ্যা কমাইতে হইবে। এই উভয়ের কিছুই না হইলে এরূপ উপায় কখনই কার্য্যকর হইতে পারিবে না।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে আইনদ্বারা শ্রমজীবীদিগের বেতনের হার নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। ইঁহাদিগের মতে সকল প্রকার পরিশ্রমেরই বেতন নির্দ্ধারিত করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। অমুকপ্রকার পরিশ্রমের এই বেতন, অমুক প্রকারের এই বেতন, এই রূপে সকল প্রকার পরি-

শ্রমেরই বেতন নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক। আর এরূপ নিয়ম থাকার প্রয়োজন যে, কেহ নির্দ্ধারিত বেতন অপেক্ষা অল্প বেতন দিয়া কাহাকে ও খাটাইলে দণ্ডিত হইবেক। সমাজে এইরূপ আইন প্রবর্ত্তিত হইলে কেহই নির্দ্দিষ্ট বেতন অপেক্ষা অল্প বেতন দিয়া কাহাকেও খাটাইতে পারিবে না, কাজে কাজেই এরূপ হইলে শ্রমিকদিগের বেতনবৃদ্ধি হইবে, ও তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইতে থাকিবে। কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, এইরূপ আইন করিলে শ্রমজীবীদিগের উপকার না করিয়া বরং অপকার করাই হয়। এরূপ নিয়ম হইলে শ্রমজীবীদিগের আপাততঃ কিছু কিছু উপকার হইতে পারে বটে, কিন্তু কিছুকাল এইরূপ চলিয়া পরিশেষে এরূপ হইতে পারে, যে শ্রমজীবীরা একবারে কর্ম্ম পায় না, ও তাহাদের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দুর্দ্দশা হইয়া উঠে। মনে কর কোনদেশে এইরূপ আইন জারি হইল। মজুরদিগের দৈনিক বেতন পূর্ব্বে প্রতি জনে চারিআনা ছিল, নিয়ম হইল আটআনার কম দৈনিক বেতন দিয়া কেহই মজুর খাটাইতে পারিবে না। কাজে কাজেই কি কৃষিবৃত্তি, কি অন্যব্যবসায়ী, সকলকেই এই বর্দ্ধিত হারে বেতন দিতে বাধ্য হইতে হইল। কিছুকাল এইরূপ নিয়মে কার্য্য চলিলে পরিশেষে ব্যবসায়ীর বিলক্ষণ ক্ষতি হইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে ব্যবসায়ে সচরাচর যাহা লাভ হইতে পারে, সেইরূপই লাভ হইতেছিল, এক্ষণে সেই লাভ হইতে শ্রমিকদিগকে বর্দ্ধিতহারে বেতন দিতে হওয়াতে ব্যবসায়ের লাভ বিলক্ষণ কমিয়া গেল। সুতরাং এরূপ অবস্থায় আর কতদিন ব্যবসায় চলিতে পারে? কাজে কাজেই ব্যবসায়ীকে নিজ কারবার বন্ধ করিয়া যাহাতে অধিকতর লাভ হইতে পারে এরূপ অন্য কোন ব্যবসায় করিবার চেষ্টা করিতে

হইল। সুতরাং এরূপ হইলে শ্রমজীবীকে হয় পূর্ব্বাপেক্ষাও অল্পবেতনে কার্য্য করিতে স্বীকার করিতে হইল, নতুবা বেকার থাকিয়া যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতে হইল। এখন বিবেচনা কর, এরূপ আইন হওয়াতে যদিও শ্রমজীবীদিগের কিছুদিন অধিক সুবিধা হইয়াছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে আবার পূর্ব্বের অপেক্ষাও অধিকতর দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল। যদি বল যে, ঐরূপে শ্রমের বেতন বৃদ্ধি করিলে ব্যবসায়ীদিগের লোকসান হইবে কেন? এরূপ অবস্থায় লোকসানের সম্ভাবনা দেখিলেই ব্যবসায়ীরা আপন আপন ব্যবসায়দ্রব্যের মূল্য বাড়াইয়া সেই সম্ভাবিতক্ষতির পূরণ করিতে পারে। মনে কর তাহাই হইল, কিন্তু তাহাতেও শ্রমিকদিগের সুবিধা হইতে পারে না, কারণ তাহাদিগের বেতনবৃদ্ধি হইয়া যেমন একদিকে কিছু কিছু সুবিধা হইল, তেমনি আবার তাবৎ দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হওয়াতে অপরদিকে বিলক্ষণ অসুবিধা দাঁড়াইল। অতএব গণনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে এরূপে পরিশ্রমের বেতনবৃদ্ধি হইলে শ্রমিকদিগের যাহা কিছু সুবিধা হয়, অসুবিধার ভাগ তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়া পড়ে। আবার কেবল তাহাই কেন? এইরূপে বেতনবৃদ্ধি হইলে শ্রমিকদিগের কিছু সুবিধা হওয়াতে সকল ব্যবসায়েই শ্রমিকদিগের সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে, সুতরাং কিছুদিন এই রূপ বাড়িলে অল্পদিনের মধ্যেই নিয়োগ করিবার আবশ্যকতা অপেক্ষা তাহাদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি হইবে। কাজে কাজেই আবার বেতন কমাইবার আইন করিতে হইবেক, নতুবা শ্রমিকদিগের ক্লেশের পরিসীমা থাকিবে না। এক্ষণে প্রতিপন্ন হইল যে আইনদ্বারা কোনরূপ পরিশ্রমেরই বেতননির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করা কেবল যে

নিষ্ফল হয় এরূপ নহে, প্রত্যুত ইহাদ্বারা শ্রমিকদিগের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি না হইয়া বরং দিন দিন অধোগতি হইতে থাকে। অতএব এবিষয়ে কিছুই আইন করা যুক্তিসঙ্গত নহে। বেতনদাতা ও শ্রমজীবীদিগের পরস্পরের ইচ্ছা ও সুবিধার উপরই শ্রমিকদিগের বেতননির্দ্ধারণের ভার রাখাই সম্পূর্ণরূপে বিধেয়।

আবার অনেকে বলিয়া থাকেন যে গবর্ণমেণ্টের আইনদ্বারা পরিশ্রমের বেতন নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা বিফল ও অনিষ্টকর হইতে পারে বটে, কিন্তু দেশের সমুদয় শ্রমিকদিগকেই উপযুক্ত বেতন দিয়া কর্ম্ম যোগাইয়া দেওয়া সকল গবর্ণমেণ্টেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। ইঁহারা বলেন যদি গবর্ণমেণ্ট অন্যের নিকট হইতে শ্রমজীবীদিগকে বর্দ্ধিত হারে বেতন দেওয়াইতে না পারেন, তাহা হইলে নিজের তহবিল হইতে বেতন দিয়া কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী মাত্রকেই কর্ম্ম দেওয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, ইহাতে আর সন্দেহ কি? কারণ গবর্ণমেণ্টের উপর প্রজাদিগের রক্ষার ভার, প্রজারা কোনরূপ কষ্ট পাইলে সেই কষ্ট নিবারণ করা গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য। এ কথা কেহই অস্বীকার করে না। গবর্ণমেণ্ট যদি কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রকেই কর্ম্ম দিবার ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে কিছুদিনের নিমিত্ত শ্রমজীবীদিগের অবস্থা উন্নত হইতে পারে, আর অন্য লোকেরও তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু যদি গবর্ণমেণ্ট চিরকালের জন্য এই গুরু ভার গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে কিছুকাল চলিবার পর উহা হইতে অপকার ভিন্ন উপকার হইবার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে অল্পকালের জন্য গবর্ণমেণ্ট এই ভার গ্রহণ করিলে শ্রমিকদিগের উপকার হইতে পারে। এই কারণেই সকল সভ্য

গবর্ণমেণ্টই সময়ে সময়ে কর্ত্তব্যবোধে এই ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। যখন দেশে অজন্মা প্রভৃতি কারণে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, খাদ্যদ্রব্যাদি সমুদয় অগ্নিমূল্য হইয়া উঠে, শ্রমজীবী কৃষক প্রভৃতি প্রজারা অন্নাভাবে কষ্ট পাইতে থাকে, তখনই গবর্ণমেণ্ট ঐ কষ্ট নিবারণ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হয়েন। রাস্তা, বাঁধ, খাল প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্য আরম্ভ হইয়া যায়, ও বেকার প্রজারা ঐ সকল কার্য্যে পরিশ্রম করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বেতন পায় এবং এই প্রকারে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে। এই সকল কার্য্যের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্ট কিছুকালের নিমিত্ত প্রজাদিগের নিকট হইতে ইনকম-টেক্স প্রভৃতি নানাবিধ কর গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, এবং এইরূপে যাহা আয় হয় তাহা হইতে শ্রমজীবীদিগেরও প্রাণ-রক্ষা হয়, আর রাস্তা ঘাট প্রভৃতি হইয়া সর্ব্বসাধারণেরও উপ-কার হইয়া থাকে। অল্পদিনের জন্য ঐরূপ টেক্স দিতে কেহই কাতর হয় না, কারণ এরূপ সময়ে টেকস দিতে হইলে, কেহই আর আপন মূলধন হইতে উহা দেয় না, ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হয়, তাহা হইতেই দিয়া থাকে। সুতরাং দেশের মূলধনেরও কিছুমাত্র হানি হইতে পারে না। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে এরূপ সময়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মপ্রার্থী ব্যক্তিমাত্রকেই কর্ম্ম দিবার ভার লইয়া যদি পূর্ব্বোক্তপ্রকারে অর্থসংগ্রহ করেন, তাহা হইলে যাহারা টেক্স দেয় তাহাদেরও অপকার হয় না, আর শ্রমজীবীদিগেরও জীবনরক্ষা হইয়া থাকে।

ফলতঃ এরূপ দুঃসময় উপস্থিত হইলে উপরে উল্লিখিত উপায় ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই প্রজাদিগের জীবনরক্ষা হইতে পারে না। সুতরাং এরূপ সময়ে যদি গবর্ণমেণ্ট উক্ত উপায় অবলম্বন না করেন তাহা হইলে, উহা গবর্ণমেণ্টের

দোষ বলিতে হইবে। ইংরাজী ১৮৬৬। ৬৭ শালে উড়িষ্যা অঞ্চলে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের গবর্ণমেণ্ট ঐ দুর্ভিক্ষনিবারণের নিমিত্ত যথাসময়ে উক্তরূপ উপায় অবলম্বন করিতে পারেন নাই। সুতরাং শত সহস্র দীন দরিদ্র প্রজা অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করে। অতএব এস্থলে গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ ভ্রম হইয়াছিল বলিতে হইবে। অল্পদিনের জন্য গবর্ণমেণ্ট এরূপ ভার গ্রহণ করিলে দেশের মঙ্গল হইতে পারে বটে, কিন্তু যদি তাহা না হইয়া গবর্ণমেণ্ট চিরকালের নিমিত্ত এই গুরুতর ভার গ্রহণের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েন তাহা হইলে কিছুদিনের পর বহুবিধ অনিষ্টাপাত হইতে আরম্ভ হয়, ও পরিশেষে শ্রমিকদিগের উপকার না হইয়া কেবল অপকারমাত্র হইতে থাকে। অল্পদিনের জন্য দরিদ্রদিগের ভারগ্রহণ করিলে গবর্ণমেণ্ট যে উপায়ে উহার ব্যয়নির্ব্বাহ করিতেন, অধিক দিন বা চিরকালের নিমিত্ত ঐ বন্দোবস্ত হইলেও গবর্ণমেণ্টকে অগত্যা অবিকল সেইরূপেই ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়, অর্থাৎ প্রজাদিগের নিকট নূতন নূতন টেক্স লইয়া ঐ আয়ের উপরই গবর্ণমেণ্টকে নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু অল্পদিনের জন্য কোন কর ধার্য্য হইলে প্রজারা যেরূপ ব্যয়সংক্ষেপ পূর্ব্বক উহার উদ্বৃত্ত অংশ হইতে ঐ কর দিতে সমর্থ হয়, অধিকদিনের নিমিত্ত কখনই সেরূপ চলেনা। কাজে কাজেই এরূপ হইলে প্রজাদিগকে নিজ নিজ মূলধন হইতেই ঐ টেক্স সর্ব্বরাহ করিতে হয়। সুতরাং এইরূপে দেশের মূলধনের ক্ষতি হইয়া থাকে। আর তাহা না হইলেও শ্রমিকদিগের ইহাতে সুবিধা কি? ইহাতে তাহাদের বেতনবর্দ্ধনের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। কারণ দেশের মূলধন না বাড়িলে ত আর তাহাদের বেতনবৃদ্ধি হইতে পারে না। কিন্তু এরূপ স্থলে মূলধন কিছুমাত্র বাড়ে না, কেবল হস্তান্তর

হয় এইমাত্র। কেননা ঐ ধন ধনীদিগের হস্ত হইতে গবর্ণমেণ্ট লয়েন, আবার গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে শ্রমিকেরা বেতনস্বরূপে লইয়া থাকে। অতএব একরূপ করিলে শ্রমজীবীদিগের বেতনবর্দ্ধন হইতে পারে না ইহা সপ্রমাণ হইল। কেবল যে বেতনবর্দ্ধন হইতে পারে না একরূপ নহে, কিছুকাল এইরূপ থাকিলে পরিশেষে তাহাদিগের ঘোর অনিষ্টাপাত হয়। মনে কর গবর্ণমেণ্ট সকলকেই কোন না কোন কার্য্যে খাটাইবেন এইরূপ অঙ্গীকার করিলেন। অতএব শ্রমিকেরা কর্ম্ম পাইবার বিষয়ে একবারে নিশ্চিন্ত হইল। উদরান্নের জন্য তাহাদের আর ভাবনা রহিলনা, কারণ তাহারা প্রয়োজন হইলেই গবর্ণমেণ্টের নিকট কর্ম্ম করিয়া বেতন পাইবে। একরূপ বন্দোবস্ত হইলে দেশের মূলধন একরূপ থাকে ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এক্ষণে ভাবিয়া দেখ মূলধন যত লোককে বেতন দিতে পারে, তাহাঅপেক্ষা কর্ম্মাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যাবৃদ্ধি হইলে উহাদের কিরূপ অবস্থা হইয়া থাকে? উহাদের বেতন কমিয়া যায় ও কিছুকাল ঐরূপ চলিলে উহাদিগের মধ্যে ঘোরতর দারিদ্র্য আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রমজীবীরা কর্ম্মপ্রাপ্তির বিষয় নিশ্চিন্ত থাকিলে শীঘ্রই উহাদিগের ঐ দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। যদি গবর্ণমেণ্ট সকলকেই কর্ম্ম দিতে অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে শ্রমিকেরা মনে করে আমরা সুখী হইয়াছি। একরূপ সংস্কার হইলে শ্রমিকেরা সাধারণতঃ অল্প বয়সেই বিবাহ করিতে আরম্ভ করে। যাহারা পূর্ব্বে অতিশয় দারিদ্র্যনিবন্ধন বিবাহ করিতে পারিত না, তাহারাও এক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়া বিবাহ করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং তাহাদের সকলের সন্তান সন্ততি হইয়া অতি শীঘ্রই শ্রমজীবীদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়। যত লোক কর্ম্ম প্রার্থনা করে, গবর্ণমেণ্টের সকলকেই কর্ম্ম দিতে

হয়। সুতরাং কিছুকাল এরূপ চলিলে সহজেই নিয়োগ করিবার আবশ্যকতা অপেক্ষা শ্রমজীবীদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়া উঠে। কাজেই গবর্ণমেণ্ট সকলকে আর পূর্ব্বের ন্যায় কর্ম্ম দিতে পারেন না, তখন শ্রমজীবীর সংখ্যা অল্প করা গবর্ণমেণ্টের এক প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া উঠে। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, এই উপায়টী কোনরূপেই শ্রমিকদিগের অবস্থার উন্নতি করিতে পারে না। যদিও গবর্ণমেণ্ট অল্পকালের জন্য এইরূপ উপায় অবলম্বন করিলে কৃতকার্য্য হয়েন বটে, কিন্তু অধিকদিনের জন্য করিতে হইলে অবশেষে আমাদের প্রদর্শিত উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, অর্থাৎ লোকসংখ্যা কমাইবার চেষ্টা করিতে হয়। নতুবা কোন রূপেই কার্য্য চলিতে পারে না। এক্ষণে নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হইল যে বেতনবৃদ্ধির নিমিত্ত কোনরূপ আইন করাই যুক্তিসঙ্গত নহে। এই জন্যই সভ্য গবর্ণমেণ্ট মাত্রেই বিশেষ দুঃসময় ভিন্ন এরূপ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না।

কখন কখন শ্রমিকেরা আপনাদের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দ্বারা নিজ নিজ পরিশ্রমের বেতনবর্দ্ধন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহারা রাজনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া আপনারা দলবদ্ধ ও একমত হইয়া স্ব স্ব ব্যবসায়ে পরিশ্রমের বেতন বর্দ্ধন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। আমাদের দেশেও মধ্যে মধ্যে ঘরামী, মজুর, মুটিয়া, রাজমিস্ত্রি, ছুতর, বেহারা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রমিকদিগকে এইরূপে দলবদ্ধ হইতে দেখা যায়। এইরূপে দলবদ্ধ হইয়া ইহারা সময়ে সময়ে আপনাদিগের অভীষ্ট সাধনে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে। অভীষ্ট বেতন না পাইলে কেহই পরিশ্রম করিতে চাহেনা দেখিয়া নিয়োগকর্ত্তারা অগত্যা তাহাদের প্রার্থিত বেতন দিয়াই কার্য্য লইতে বাধ্য হয়। সুতরাং ইচ্ছানুরূপ বেতন পাওয়াতে শ্রমিকদিগের অবস্থার কিছু উন্নতি হইয়া থাকে। অল্পদিনের জন্য অল্পস্থান ও নিয়মিত সংখ্যক লোকদিগের মধ্যে এইরূপ ধর্ম্মঘট হইলে শ্রমিকদিগের

চেষ্টা সফল হয় বটে, কিন্তু ইহাদিগের সংখ্যা নির্দ্ধারিত না থাকিলে ঐ চেষ্টা কখনই ফলোপধায়ক হইতে পারেনা। কারণ দলস্থদিগের সংখ্যা নির্দ্ধারিত না থাকিলে শীঘ্রই শ্রমিকদিগের সংখ্যাবাহুল্য হইয়া প্রতি-যোগিতানিবন্ধন উঁহাদের ঐক্যচেষ্টা বিফল হইয়া যায়। এই নিমিত্তই এরূপ দলের অধ্যক্ষেরা আপন আপন দলে নিয়মিতসংখ্যক লোক রাখিয়া থাকে। অন্য লোককে কখনই আপন আপন ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট হইতে দেয়না। কিন্তু ইহাদ্বারা দলস্থ লোকদিগের ও সর্ব্বসাধারণেরই অপকার ভিন্ন উপকার হইতে পারেনা, ইংলণ্ডের অনেক স্থানে এইরূপ দল ছিল। এরূপ দলস্থলোকদিগকে দলাধ্যক্ষদিগের আজ্ঞানুসারে চলিতে হয়। ইহারা নির্দ্দিষ্ট হারের অপেক্ষা অল্প বেতন লইয়া কোথাও কর্ম্ম করিতে পায়না, যদি কোন ব্যবসায়ী উঁহাদের ইচ্ছামত বেতন দিতে অস্বীকার করে, তাহাহইলে উঁহাদের সকলকেই একবাক্য হইয়া ঐ ব্যক্তির কর্ম্মত্যাগ করিতে হয়। আর দলস্থদিগের মধ্যে যাহারা বেকার থাকে, তাহাদের প্রতিপালনার্থ দলস্থ সকলকেই আপন বেতন হইতে কিছুকিছু দলাধ্যক্ষদিগের হস্তে জমা দিতে হয়। এইরূপ নিয়মে কার্য্য করিলে ঐ দলস্থদিগের ও সমাজের উপকার, না অপকার, হইয়া থাকে কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। প্রথমতঃ এরূপ দল হইতে দলস্থদিগের উপকার না হইয়া কেবল অপকারই হয়। এইরূপে বেতনবর্দ্ধন হইলে ব্যবসায়ীরা লোকসান পোষাইবার নিমিত্ত আপন আপন দ্রব্যের মূল্য বাড়াইয়া দেয়, সুতরাং দলস্থদিগের এক-দিকে কিছু উপকার হইলেও অপরদিকে ক্ষতি হইয়াথাকে। আবার যখন অধ্যক্ষদিগের আজ্ঞানুসারে অধিকসংখ্যক লোকদিগকে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয়, তখন দলের চাঁদা হইতে আর তাহাদের ব্যয়নির্ব্বাহ হয়না সুতরাং কিছুকাল অন্নাভাবে কষ্ট পাইয়া পরিশেষে আবার অল্পবেতনে কর্ম্মস্বীকার করিতে হয়, তখন অধ্যক্ষেরাও আর তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারে না। দলাধ্যক্ষেরা ব্যবসায়ীদিগের প্রতি যেরূপ অত্যা-চার করে তাহাতে ব্যবসায়ীদিগের কারবার চালাইতে অন্যায় ব্যয় হইয়া লোকসান হইতে থাকে। সুতরাং ব্যবসায়ীরা হয় স্থানত্যাগকরে নতুবা ব্যবসায়পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। কাজেকাজেই এরূপ হইলে

শ্রমিকদিগের সুবিধা দূরে থাকুক, কর্ম্ম পাওয়াও দুর্ঘট হইয়া উঠে। এক্ষণে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এরূপ দল হইতে শ্রমিকদিগের উপকার না হইয়া সমূহ অপকারই হইয়া থাকে। আবার ইহাদিগের যেরূপ অপকার হয়, সমাজেরও তাহাই হইয়া থাকে। কারণ ইহারা আপনাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে দেয় না বলিয়া কেহই আপন ইচ্ছানুসারে ব্যবসায় শিক্ষা করিতে পারে না। কাজে কাজেই যে ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে এরূপ দল হইয়াছে, সেই ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট হইতে পায় না বলিয়া অনেককে অন্যান্য ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট হইতে হয়, সুতরাং লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হওয়াতে ঐ সকল ব্যবসায়ে বেতন কমিয়া যায়, কাজেই দলস্থদিগের অন্যান্য ব্যবসায়ীদিগের বেতন অপহরণ করা হয়, কারণ দলস্থ লোকে প্রতিবন্ধকতা না করিলে অনেকেই ঐ ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট হইত, কিন্তু উহাদিগের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া অনেককে নিজ নিজ স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া যে সে ব্যবসায়ে প্রবেশ পূর্ব্বক অতি সামান্য বেতন গ্রহণ করিতে হয় আবার এইরূপ দলের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া ব্যবসায়ীদিগকেও বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। অনেক সময় তাহাদিগকে একবারে ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে হয়। সকল ব্যবসায়েই এরূপ হইলে সমাজেরও বিলক্ষণ হানি হইয়া থাকে। কখন কখন শ্রমজীবীরা ঐরূপ দলস্থ না হইয়াও বেতন বাড়াইবার জন্য ধর্ম্মঘট করিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করে। কখন কখন ঐরূপ উপায়ে তাহাদের কার্য্যসিদ্ধি হয় বটে, কিন্তু উহাদ্বারা উহাদিগের স্থায়ী উপকার কিছুই হয় না। কিছুদিন চলিয়া আবার তাহাদিগকে অল্প বেতনে কর্ম্ম স্বীকার করিতে হয়, নতুবা হয় কর্ম্ম পায় না নাহয়, দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি হওয়াতে কষ্টপাইতে থাকে। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে আইন অনুসারে বা শ্রমজীবীদিগের ঐক্যবন্ধনদ্বারা বেতনবর্দ্ধনের চেষ্টা করিলে ঐ চেষ্টা যে নিষ্ফল হয় এরূপ নহে, প্রত্যুত শ্রমিকদিগের ও সর্ব্বসাধারণেরই অপকার হইয়া থাকে।

তবে বেতনবর্দ্ধনের প্রকৃত উপায় কি? বেতনবর্দ্ধনের নিমিত্ত কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে কাহারও অপকার না হইয়া শ্রমিকদিগের বেতনবৃদ্ধি হইতে পারে? এই পরিচ্ছে-

দের প্রথমে নির্ণীত হইয়াছে যে বেতনবর্দ্ধনের প্রকৃত উপায় দুইটী ১ ম।—শ্রমজীবীদিগের সংখ্যা অপেক্ষা তাহাদিগকে নিয়োগ করিবার আবশ্যকতা বর্দ্ধিত করা। ২ য়।—নিয়োগ করিবার প্রয়োজন অপেক্ষা শ্রমিকদিগের সংখ্যা অল্প করা। এই দুইটী বেতনবর্দ্ধনের প্রকৃত উপায়। এই দুইটীর মধ্যে কোন্ টী সুসাধ্য ও কোন্ টী হইতে চিরকাল উপকার হইতে পারে তাহার নির্ণয় করা যাইতেছে। শ্রমজীবীদিগের সংখ্যা অপেক্ষা তাহাদিগকে নিয়োগ করিবার আবশ্যকতা বৃদ্ধি করা বেতনবর্দ্ধনের প্রথম উপায়। শ্রমজীবীদিগের সংখ্যা একরূপ রাখিয়া যদি দেশের মূলধন বাড়াইতে পারা যায়, তাহা হইলেই এই উপায়টী কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। কারণ এরূপ হইলে বর্দ্ধিত মূলধন ধনোৎপাদনকার্য্যে ব্যাপৃত করিতে হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রমের আবশ্যকতা হয়। কিন্তু শ্রমিকদিগের সংখ্যা পূর্ব্বমতই রহিয়াছে। সুতরাং এরূপ স্থলে উহাদিগকেই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেতন দিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক খাটাইতে হয়, এবং এই জন্যই ইহাদিগের বেতন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু লোকসংখ্যা একরূপ রাখিয়া মূলধন বৃদ্ধি করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। পৃথিবীর উৎপাদিকাশক্তি নিরন্তর বৃদ্ধি পাইতেছে বটে, কিন্তু যে পরিমাণে পৃথিবীর উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে, লোকসংখ্যা তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে বাড়িয়া থাকে। পরীক্ষাদ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে ২০ বৎসরের মধ্যে কোন স্থানের অধিবাসীর সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হইয়া থাকে। যদি দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি নানাবিধ প্রাকৃতিক ও মানুষিক কারণে মধ্যে মধ্যে লোকসংখ্যার হ্রাস না হয় তাহা হইলে কিছুদিনের মধ্যেই পৃথিবীতে মানুষের আর স্থান হয়না।

পৃথিবীর পরিমাণ নির্দ্ধারিত, লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত পৃথিবী ত আর বাড়িয়া উঠিতে পারেনা সুতরাং কোন না কোন কারণে হ্রাস না হইয়া অনবরত বাড়িতে থাকিলে কিছুদিনের মধ্যেই এরূপ হইয়া উঠে যে পৃথিবীতে আর স্থান হইতে পারেনা। কাজেই আহার পাওয়া যে কতদূর দুঃসাধ্য হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। পৃথিবী সমুদায় ধনের আকর। কি উদ্ভিজ্জ, কি খনিজ, কি প্রাণিজ তাবৎ দ্রব্যই পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে! মানুষ পরিশ্রম করিয়া পৃথিবী হইতে দ্রব্যই উৎপাদন করিয়া থাকে। মানুষের পরিশ্রমে পৃথিবী হইতে যাবতীয় দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে তন্মধ্যে অন্নই সর্ব্ব-প্রধান। কৃষিবৃত্তি আপন পরিশ্রমে পৃথিবী হইতে অন্ন উত্তোলন করিতেছে, ও আপন ব্যবহারের উপযুক্ত রাখিয়া দিয়া অবশিষ্টাংশ অপরকে দিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে নানাবিধ আবশ্যক সামগ্রী গ্রহণ করিতেছে। ফলতঃ কৃষকের নিকট ঐ অন্ন পাইবার আশয়েই তন্তুবায় বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে, সূত্রধর বাক্স সিন্দুক প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, চিকিৎসক চিকিৎসা করিয়া থাকেন, ও রাজা প্রজাপালন করিয়া থাকেন, ইঁহারা কেহই স্বহস্তে কৃষিকার্য্য করেন না— কিন্তু আপন আপন পরিশ্রমের বদলে কৃষকের নিকট হইতে অন্ন পাইয়া থাকেন। কিন্তু যদি কৃষকের পরিশ্রমে তাহার আপন প্রয়োজন অপেক্ষা অতিরিক্ত অন্ন উৎপন্ন না হইত, তাহা হইলে সকলকেই স্বহস্তে চাষ করিয়া উদরপূরণ করিতে হইত সন্দেহ নাই। অর্থাৎ ওরূপ হইলে তন্তুবায়, সূত্রধর, চিকিৎসক, উকীল রাজা প্রভৃতি যাবতীয় লোককেই কৃষক হইতে হইত, ও পৃথিবীর এরূপ সুখস্বচ্ছন্দের অবস্থা কখনই উপস্থিত হইতে পারিতনা। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পৃথিবীতে যাহা উৎপন্ন হয়,

তাহা হইতে কৃষকের পর্য্যাপ্ত হইয়াও অনেক উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে। অন্যান্য ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ পরিশ্রম দিয়া উহার পরিবর্ত্তে ঐ উদ্বৃত্ত অংশ পরস্পর ভাগ করিয়া লয়েন। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে অন্নের যে ভাগ দিয়া অন্যের পরিশ্রম ক্রয় করা যায় তাহাকেই বেতন বা বেতনার্থ ধন কহে। যে দেশে ঐ বেতনার্থ ধন অধিক ও শ্রমিকদিগের সংখ্যা অল্প তথায় শ্রমিকেরা অধিক বেতন পাইয়া থাকে, আর যে দেশে ঐ বৈতনিক ধন অল্প, কিন্তু শ্রমিকদিগের সংখ্যা তদপেক্ষা অধিক, তথায় শ্রমিকেরা অপেক্ষাকৃত অল্প বেতন পাইয়া থাকে। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে ভারতবর্ষ বা ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের অপেক্ষা অল্পকাল হইল লোকের বসতি হইয়াছে। সুতরাং এই সকল স্থানে অনেক ভূমির অদ্যাপিও আবাদ হয় নাই। আর ভূমিও বিলক্ষণ উর্ব্বরা বলিয়া অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। আবার এ দেশে অদ্যাপি অন্যান্য প্রাচীন দেশের ন্যায় লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হয় নাই। অতএব এই সকল স্থানে অদ্যাপি লোকসংখ্যা অপেক্ষা তাহাদিগকে নিয়োগ করিবার আবশ্যকতা অধিক আছে। কাজেই এ সকল স্থানের শ্রমজীবীরা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অধিক বেতন পাইয়া থাকে। কালক্রমে আবার লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইলে এই সকল স্থানেও শ্রমজীবীদিগের বেতনবর্দ্ধনের আবশ্যকতা হইবেক। ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ অতিশয় প্রাচীন স্থান। কতদিন অবধি এই সকল দেশে লোকের বসতি হইয়াছে তাহার নির্ণয় করা যায়না। এই সকল দেশের প্রায় তাবৎ ভূমিই আবাদ হইয়া গিয়াছে, আবার এই সকল স্থানের লোকসংখ্যাও যতদূর বাড়িতে পারে, বাড়িয়া উঠিয়াছে। অতএব এই সকল দেশে মূলধন অপেক্ষা শ্রমজীবীদিগকে নিয়োগ করিবার প্রয়োজন কমিয়া গিয়াছে ও শ্রমজীবীরা

এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অল্প বেতন পাইতেছে। সুতরাং ইহাদিগের বেতনবৃদ্ধি করিতে না পারিলে এসকল দেশ কালক্রমে দরিদ্র হইয়া পড়িবে। কিন্তু কি উপায়ে এই সকল দেশে পরিশ্রমের বেতনবৃদ্ধি করা যাইতে পারে? লোক-সংখ্যা একরূপ রাখিয়া মূলধনবৃদ্ধি করা যে মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে তাহা একপ্রকার নির্ণীত হইয়াছে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, পৃথিবীতে যতই লোকসংখ্যাবৃদ্ধি হউক না কেন, পরিশ্রম করিলে আহারের জন্য চিন্তা নাই। যদি পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা অসম্ভব হইত, তাহা হইলে পরমেশ্বর কখনই এত জীবের সৃষ্টি করিতেন না। আমাদের দেশে "জীব দিয়াছেন যিনি আহার দিবেন তিনি" এইরূপ একটী জনশ্রুতি আছে। ইহার অর্থ এই যে আহারের জন্য আমাদের চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই, পরমেশ্বর আমাদিগকে যখন সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তিনি অবশ্যই আহার যোগাইবেন। পৃথিবীর পরিমাণ যদি অসীম হইত, ও যে পরিমাণে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হয় যদি সেই পরিমাণে পৃথিবীর উৎপাদিকাশক্তিও বৃদ্ধি পাইত, তাহা হইলেই ঐ কথা যুক্তিসঙ্গত হইত। কিন্তু পৃথিবী অসীম নহে, আর লোকসংখ্যার বৃদ্ধি অনুসারে পৃথিবীর উৎপাদিকাশক্তিরও বৃদ্ধি হয়না, সুতরাং পৃথিবী হইতে যত লোকের স্বচ্ছন্দে আহার চলিতে পারে তাহা অপেক্ষা লোক-সংখ্যার বৃদ্ধি হইলেই লোকের কষ্ট পাইতে হয়। যে মূলধন হইতে যত লোকের পর্য্যাপ্তরূপে চলিতে পারে তাহা অপেক্ষা লোকসংখ্যাবৃদ্ধি হইলেই কালক্রমে দেশে দারিদ্র্য-দুঃখ উপস্থিত হয়। দেশের এইরূপ অবস্থা হইলে লোকে উপযুক্ত আহার ও অন্যান্য আবশ্যকসামগ্রীর অভাবে কষ্ট

পাইতে থাকে। কিছু দিন এইরূপ চলিলে পরিশেষে দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি ভয়ানক যমদূত সকলের আবির্ভাব হয় ও দেশের অনেক লোক ইহাদের প্রবল জঠরাগ্নিতে আহুতি স্বরূপ হইয়া যায়। যাহারা দৈবাধীন অব্যাহতি পায় তাহারা আবার বহুকালের পর ক্রমে ক্রমে সুখস্বচ্ছন্দের অবস্থায় উপস্থিত হয়। অতএব বোধ হইতেছে যে কোন দেশের লোকসংখ্যা কমাইবার আবশ্যকতা হইলে ঈশ্বর স্বয়ং মহামারী প্রভৃতি উপায়ে সংহার করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, এক্ষণে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে কোন দেশে মূলধন অপেক্ষা লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইলে উহা কমাইবার চেষ্টা করা উচিত, কারণ এরূপ স্থলে লোকসংখ্যা কমান ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই দারিদ্র্যদুঃখ নিবারণ করা যায় না। তবে যতদিন দেশে যত স্থান আছে তাহা অপেক্ষা অধিবাসীর সংখ্যা অল্প থাকে, ততদিন পর্য্যন্তই কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতিপূর্ব্বক মূলধনের বৃদ্ধি করিয়া পরিশ্রমের বেতন বর্দ্ধন করিতে পারা যায়। কিন্তু কিছু দিন পরে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইলে আর ঐ উপায় কার্য্যকর হইতে পারেনা, কাজে কাজেই লোকসংখ্যা কমাইবার চেষ্টা করিতে হয়। আমাদের দেশের এক্ষণে যেরূপ অবস্থা তাহাতে বোধ হয় আমাদের দেশে এখনও যথেষ্ট স্থান আছে, অদ্যাপি সুন্দরবন প্রভৃতি সকল স্থান আবাদ হয় নাই। অতএব এখনও আমাদের দেশে কৃষিবাণিজ্যাদির উন্নতি-দ্বারা মূলধনের বৃদ্ধি করিতে পারিলে পরিশ্রমের বেতন বাড়ান যাইতে পারে। তবে যখন ইহা অপেক্ষা অনেক অংশে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইবেক, তখনই লোকসংখ্যা কমান ভিন্ন বেতন বর্দ্ধনের উপায়ান্তর থাকিবে না। ' এক্ষণে

প্রতিপন্ন হইল যে, বেতনবর্দ্ধনের যে দুইটী উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তন্মধ্যে প্রথমটী [অর্থাৎ লোকসংখ্যা একরূপ রাখিয়া মূলধন বর্দ্ধনের চেষ্টা করা] অবলম্বন করিলে চির-কাল অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারেনা। অগত্যা দ্বিতীয় উপা-য়টী অবলম্বন করাই বেতনবর্দ্ধনের অব্যর্থ উপায় বলিয়া স্থির হইল। অর্থাৎ নিয়োগ করিবার প্রয়োজন অপেক্ষা লোকসংখ্যাবৃদ্ধি হইলে উহা কমাইবার চেষ্টা করাই বিধেয়, নতুবা অন্য কোন উপায়েই বেতনবর্দ্ধন হইতে পারেনা। কিন্তু কিরূপে ঐ দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করিতে পারা যায়? কি উপায়ে দেশের লোকসংখ্যা কমান যাইতে পারে? এবিষ-য়ের বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক। প্রাকৃতিক নিয়মে যেরূপ জন্ম হইতেছে, সেইরূপ মৃত্যুও হইতেছে। আবার সকলদেশেই প্রায় দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ প্রভৃতি নানাবিধ কারণে সময়ে সময়ে লোকসংখ্যার হ্রাস হইয়া থাকে। এরূপে লোকসংখ্যার হ্রাস হয় ইহা কাহারও অভিলষণীয় বা প্রার্থনীয় নহে। প্রত্যুত যাহাতে ঐরূপ কারণে লোকসংখ্যার হ্রাস হইতে না পায় এরূপ উপায় বিধান করা উচিত। যাহাতে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, সংক্রামক পীড়া প্রভৃতি না হয় সকলদেশের লোকেরই তাহার উপায় করা উচিত, আর হইলেও তৎসমুদয় নিবারণ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অতএব যাহাতে অল্পসংখ্যক লোকের জন্ম হয়, ও যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে তাহারা উপযুক্ত আহারাদি পাইয়া কর্ম্মক্ষম ও দীর্ঘজীবী হয়, তদ্বিষয়ে সকল সমাজেরই মনো-যোগ করা উচিত। এরূপ করিলে যে কেবল বেতনবর্দ্ধনের পথ পরিষ্কৃত হয়, এরূপ নহে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি কারণে সমাজের বিপদ ও বিশৃঙ্খলতা হইতে পায়না।

সকল সমাজেই ভিক্ষুক ও দরিদ্রেরা চিরজীবন পরের গলগ্রহ হইয়া কালাতিপাত করিয়া থাকে, আবার কেবল যে আপনারাই এইরূপে সমাজের ধন বৃথা নষ্ট করে তাহাও নহে. সকলেই সন্তানোৎপাদন করিয়া পরের গলগ্রহ ও দেশের দারিদ্র্য বাড়াইয়া যায়। আমাদের দেশে ফকির বৈষ্ণব প্রভৃতি ভিক্ষাব্যবসায়ীরা ইহার প্রকৃত নিদর্শন। ইহারা পুরুষানুক্রমে ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে, ইহাদের আর কোন কার্য্যই নাই। ইহারা চিরকাল পরের উপর নির্ভর করিয়া সমাজের কণ্টকস্বরূপ থাকে, এবং প্রত্যেকে সন্তানোৎপাদন করিয়া সমাজেরকণ্টক বাড়াইয়া থাকে। ইহাদের প্রতিপালনার্থ সমাজের যে ধনভাগ ব্যয়িত হইয়া থাকে তাহা হইতে সমাজের কিছুমাত্র উপকার নাই। আপন আপন জীবন ভোগ করিবার অধিকার সকলেরই আছে ইহা কেহই অস্বীকার করেনা। কিন্তু নিজে পরের গলগ্রহ হইয়া থাকা ও পরের গলগ্রহ হইবার জন্য সন্তানোৎপাদন করা ইহাতে কাহারও অধিকার নাই। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে যাবৎ পরিবার প্রতিপালনের সামর্থ্য না জন্মে ততদিন কাহারও বিবাহ বা সন্তানোৎপাদন করা উচিত নহে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে বিবাহ করা একটী স্বাভাবিক নিয়ম। সুতরাং একবারে বিবাহ না করিয়া, বা অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখিয়া নিষ্কলঙ্কভাবে কালযাপন করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু এইরূপ বলা কেবল ভ্রমমাত্র। মানুষ যখন চেষ্টা করিয়া অন্যান্য স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দমন করিতে সমর্থ হন, তখন বিবাহেচ্ছা একবারে পরিত্যাগ করা, বা কিছু অধিক বয়স পর্য্যন্ত দমন করিয়া রাখা যে একবারে দুঃসাধ্য ইহা কখনই স্বীকার করিতে পারা যায়না। আবার অনেকে এরূপ বলিয়া থাকেন, যে সন্তানোৎপাদন মনুষ্যের ইচ্ছাধীন নহে, ইহা প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তী; সন্তানোৎপাদন ইচ্ছাধীন নহে ইহা যথার্থ বটে, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলেই মনুষ্য সন্তানোৎপাদন করিতে পারেনা একথা যথার্থ, কিন্তু ইচ্ছা করিলে যে সকলেই সন্তানোৎপাদনপ্রবৃত্তি সংযত রাখিতে পারে ইহা কে না স্বীকার করিবে? মনুষ্যের বুদ্ধিশক্তি আছে, বুদ্ধিশক্তি-প্রভাবে মনুষ্যের অসাধ্য কিছুই নাই। ইহারই প্রভাবে সভ্য সমাজের এতদূর

শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। আমাদের যে সকল কুপ্রবৃত্তি আছে, তৎসমুদায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণপূর্ব্বক তাহাদিগকে দমন করাই বুদ্ধির কার্য্য। ইহাই সভ্যতার প্রকৃত লক্ষণ। আমরা পীড়ার ভয়ে অতিভোজনস্পৃহা দমন করিয়া থাকি; অযুক্ত ক্রোধের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিলে বিপদ হইতে পারে এই ভয়ে আমরা ক্রোধনিবারণ করিতে সমর্থ হই। রাজদণ্ড ও ধর্ম্মের ভয়ে আমরা চুরি করিবার ইচ্ছা দমন করিয়া থাকি, তবে কেন আমরা দারিদ্র্যের ভয়ে বহুসন্তানোৎপাদন করিতে বিরত হইতে না পারিব? ফলতঃ আপন আপন অবস্থানুসারে সকলেরই সন্তানোৎপাদনপ্রবৃত্তি সংযত রাখিবার চেষ্টা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। উপায়হীন লোকের বহুসন্তান হইলে সে কখনই উহাদিগের ভরণপোষণ করিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং হয় উহারা উপযুক্ত আহারাদির অভাবে অকালমৃত্যুর গ্রাসে পতিত হয়, নতুবা পরের গলগ্রহ হইয়া সমাজের দারিদ্র্যবর্দ্ধন করিয়া থাকে।

অতএব সকলেরই এরূপ সংস্কার হওয়া উচিত যে প্রতিপালনক্ষম না হইয়া সন্তানোৎপাদন করা, বা আপন আপন উপায়দ্বারা যত সন্তানের প্রতিপালন হইতে পারে তদপেক্ষা অধিক সন্তান উৎপাদন করা এই দুইটীই দারিদ্র্যের প্রধান কারণ। এরূপ হইলে মূলধনের অপেক্ষা লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হয়, ও শ্রমের বেতন কমিয়া গিয়া দেশে দারিদ্র্য উপস্থিত হইয়া থাকে। যদি সকলেরই এরূপ সংস্কার হয়, তাহা হইলে সকলেই সন্তানোৎপাদনবিষয়ে সাবধান হইয়া চলে। শ্রমজীবীরা সকলেই প্রায় বুঝিতে পারে যে প্রয়োজন অপেক্ষা তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হইলে তাহাদের বেতন কমিয়া যায়, আর সংখ্যা কমাইতে পারিলেই বেতন বাড়িয়া থাকে। ফলতঃ এই জন্যই ব্যবসায়ী লোকদিগের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষবুদ্ধি হয়। কিন্তু লোকসংখ্যা কমাইবার প্রকৃত উপায় কি তাহা শ্রমজীবীদিগের মধ্যে কেহই অবগত নহে। অতএব এরূপ

কার্য্য যে নিতান্ত অন্যায়, উহার জন্যই যে তাহাদের বেতন-বর্দ্ধন হইতে পায় না, উহাই যে দারিদ্র্যের একমাত্র কারণ, এই সকল বিষয় স্পষ্টরূপে শ্রমজীবীদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া সকল সমাজেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহা সম্পন্ন করা সহজ ব্যাপার নহে। যদি ঐরূপ কার্য্য যে নিতান্ত অন্যায় এরূপ সংস্কার সকল সমাজেই বদ্ধমূল হয়, যদি সকলেই মদ্যপান, বেশ্যাবৃত্তি প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মের ন্যায় অন্যায় বহুসন্তানোৎপাদন করাকেও ঘৃণা করিতে থাকে, তাহা হইলে কালক্রমে আপনিই এই মহানিষ্টের নিবারণ হইয়া যায়। তখন প্রবল সাধারণ মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে কাহারও সাহস হয়না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোন সমাজেই এরূপ সংস্কার অদ্যাপি বদ্ধমূল হয় নাই। সকলেই মদ্যপায়ী প্রভৃতি পাপাত্মাদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকেন, কিন্তু অন্যায়রূপে বহুসন্তানোৎপাদনপূর্ব্বক যাহারা দেশে দারিদ্র্য আনয়ন করে তাহাদিগকে ঘৃণা করা দূরে থাকুক, উপায়হীন বহুসন্তান ব্যক্তিকে সকলেই দয়া করিয়া সাহায্য করিয়া থাকে। এটী কতদূর অন্যায় কিঞ্চিৎ বুঝিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে।

এই সকল কারণে নরওয়ে প্রভৃতি ইউরোপের অনেক দেশে এরূপ আইন আছে, যদ্দ্বারা পরিবারপ্রতিপালনের নিমিত্ত উপার্জ্জনক্ষম না হইলে কেহই বিবাহ করিতে পায়না। ইংলণ্ডে যদিও এরূপ কোন আইন নাই, কিন্তু সামাজিক নিয়ম এত প্রবল, যে উপার্জ্জনক্ষম না হইলে কোন ভদ্রলোকই বিবাহ করেন না। এক্ষণে ছোটলোকেরাও অনেকাংশে ভদ্রলোকদিগের অনুকরণ করিতে শিখিতেছে। সুতরাং ইউরোপের অন্তর্গত প্রায় তাবৎ দেশেরই আমাদের দেশ অপেক্ষা পরিশ্রমের বেতন অধিক।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে বিবাহপদ্ধতি অতিশয় জঘন্য।

বহুকাল পূর্ব্বে আমাদের দেশে বিবাহপদ্ধতি এখনকার অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট ছিল। মনুসংহিতাতে এরূপ শাসন আছে, যাহার ৩০ বৎসর বয়স সে ১২ বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করিবে। আর যাহার ২৪ বৎসর বয়স সে ৮ বৎসরের কন্যা বিবাহ করিবে। যিনি ইহা অপেক্ষা অল্পবয়সে বিবাহ করিবেন তিনি ধর্ম্মে পতিত হইবেন। ইহাদ্বারা বোধ হইতেছে যে, যৎকালে মনুর ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তখন কেহই ২৪ বৎসর অপেক্ষা অল্পবয়সে বিবাহ করিতে পাইতনা। যদি ১৬ বৎসর বয়স ন্যূনকল্পে স্ত্রীলোকদিগের সন্তান হইবার প্রকৃত কাল ধরা যায়, তাহা হইলে যাহারা ২৪ বৎসর বয়সে বিবাহ করিত তাহারা ৩১।৩২ বৎসর বয়সের সময় সন্তানোৎপাদন করিত, আর যাহারা ৩০ বৎসরে বিবাহ করিত তাহাদের কাহারও ৩৪ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে সন্তান উৎপাদন করিবার সম্ভাবনা ছিল না। ৩০ বৎসর বয়সের মধ্যে সকলেই প্রায় উপার্জ্জনক্ষম হইত, সুতরাং কাহাকেও পরিবার প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া দেশের দারিদ্র্য বাড়াইতে হইতনা। বোধ হয় সুবিজ্ঞ সংহিতাকার এই উদ্দেশেই বিবাহের ঐরূপ কালনির্ণয় করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই এক্ষণে ঐ প্রাচীন নিয়ম অনুসারে বিবাহ হইবার প্রথা একবারে উঠিয়া গিয়াছে। অধুনা অতি অল্প বয়সেই আমাদের দেশে বিবাহ হইয়া থাকে। সুতরাং উপার্জ্জনের ক্ষমতা জন্মিতে না জন্মিতেই লোকের সন্তান জন্মিতে আরম্ভ হয়। কাজে কাজেই ইহারা কোন কালেই উপযুক্তরূপে সন্তান প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয়না। বিবাহ আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে একটী প্রধান সংস্কার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। পুত্র জন্মিলে মানুষে পুন্নামক নরক হইতে ত্রাণ পাইতে পারে, যাহার পুত্র না হয় তাহাকে উক্ত ঘোরনরকে পতিত হইতে হয়। মনে কর এই সকল বিষয় স্বীকার করা গেল, কিন্তু তাহা বলিয়াই যে অল্পবয়সে বিবাহ করিতে হইবে এমত কথা কি? পুত্র জন্মাইয়া যদি প্রতিপালন করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে পুত্র জন্মাইবার ফল কি? প্রত্যুত ইহা দ্বারা দেশের দারিদ্র্যদুঃখ বর্দ্ধন করা ভিন্ন আর কিছুই হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে অদ্যাপি এরূপ সংস্কার হয় নাই। কি ধনী, কি মধ্যবিত্ত, কি দরিদ্র, সকলেই পুত্র

পৌত্র দৌহিত্রাদির মুখদর্শন করিতে পারিলেই আপনাকে চরিতার্থ মনে করিয়া থাকে। এই উদ্দেশে অনেক পুত্রের বিদ্যাশিক্ষাপ্রভৃতি গুরুতরকার্য্যের বিষয়ে মনোযোগ না করিয়াও অগ্রেই উহার বিবাহ দিয়া থাকে। পুত্রাদি জন্মগ্রহণ করিয়া যে কি খাইবে তাহার কিছুমাত্র ঠিক নাই তথাপি পুত্রাদি জন্মাইতে হইবে। ভরণ পোষণের বিষয় অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হইবে। আমাদের দেশে লোকের বাল্যকালে বিবাহ দিবার ইচ্ছা এত প্রবল, যে অনেককে বিবাহ শব্দের অর্থগ্রহ হইতে না হইতেই বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইতে হয়। সুতরাং পিতা পিতামহ প্রভৃতির প্রতিপাল্য থাকিতে থাকিতেই ইহাদিগের সন্তান হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে, এবং অল্পদিনের মধ্যেই বহুপরিবারের ভারগ্রস্ত হইতে হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যে বয়সে একজনের বিবাহ পর্য্যন্ত হয় না, আমাদের দেশে সেই বয়সে লোকের পুত্রদৌহিত্রাদি জন্মিয়া থাকে। আবার বহুপুত্র হওয়া লোকে এতদূর প্রার্থনা করিয়া থাকে, যে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বহুপুত্রপ্রসব সৌভাগ্যের লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হয়। বহুপুত্র জন্মিলে গর্ভধারিণীর যে কি কষ্ট তাহা প্রত্যেক মাতাই বুঝিতে পারেন, কিন্তু সৌভাগ্যের লক্ষণ বলিয়া স্ত্রীলোকেরা ঐ কষ্ট কথঞ্চিৎ সহ্য করিয়া থাকে। যদি উপায়হীন অবস্থায় বহুপুত্র জন্মান নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকেরাও ঐ মতের পোষকতা করিবে, ও পুত্রোৎপাদন বিষয়ে আপনারাও সাবধান হইতে পারিবে। এক্ষণে প্রতিপন্ন হইতেছে যে আমাদের দেশে বিবাহপদ্ধতির দোষে দেশীয় মূলধন হইতে যৎসংখ্যক লোকের অনায়াসে প্রতিপালন হইতে পারে, তদপেক্ষা লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে ও এই জন্যই ধনী ও মধ্যবিত্ত লোকদিগের অবস্থা ক্রমে ক্রমে মন্দ হইয়া আসিতেছে ও দরিদ্র লোকদিগের দারিদ্র্যদুঃখ অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এই সময় ইহা নিবারণের উপায় না হইলে কালক্রমে আমাদিগকে ভয়ানক দারিদ্র্য দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।

কিন্তু কি উপায়ে এই ভাবী অনিষ্টের নিবারণ হইতে পারে তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এই অনিষ্টোপাত নিবারণ

করিতে হইলে প্রথমতঃ ভদ্রলোকদিগের সাবধান হওয়া উচিত। ভদ্রলোকদিগের মধ্যে নিতান্ত অল্পবয়সে বিবাহপ্রথা রহিত করিয়া দেওয়া উচিত, ও আপন আপন অবস্থানুসারে সন্তানোৎপাদনপ্রবৃত্তির সংযম করা আবশ্যক। শ্রমজীবী অশিক্ষিত লোকেরা ভদ্রলোকদিগের অনুকরণ করিয়া থাকে, সুতরাং ভদ্রলোকেরা সাবধান হইলে দরিদ্রেরা আপনা হইতেই সাবধান হইয়া উঠিবে। দ্বিতীয়তঃ—শ্রমজীবী লোকদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে তাহাদিগের সংখ্যার উপর তাহাদিগের বেতনের হ্রাসবৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সংখ্যা কম হইলেই তাহাদিগের বেতনবৃদ্ধি হইয়া অবস্থার উন্নতি হইতে থাকিবে। ইহা যে তাহারা একবারে বুঝেনা, এরূপ কখনই বলা যায়না। প্রত্যুত ইহারা সকলেই বুঝিতে পারে যে সে ব্যক্তি যে কার্য্যে পরিশ্রম করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে, সেই প্রকার কর্ম্মকারী লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইলেই বেতন কমিয়া যায়। কিন্তু আপনারা বহুসন্তানোৎপাদন করিলে, তৎকর্ম্মকারী লোকসংখ্যা বর্দ্ধনদ্বারা আপনাদিগের ও আপন সন্তানদিগেরই দারিদ্র্য বর্দ্ধন করা হইবে, ইহা তাহারা বুঝিতে পারেনা। অতএব এইটীই তাহাদিগকে বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু কি উপায়ে শ্রমিকদিগকে এই বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে? এইটী বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত দুইটী উপায় অবলম্বন করা উচিত। এই উভয়ের একটী দ্বারা তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হইবে, ও তাহারা সন্তানোৎপাদনপ্রবৃত্তি সংযত করিতে পারিবে। আর অপরটীদ্বারা তাহাদের দারিদ্র্যনিবারণের সূত্রপাত করা হইবে। প্রথমতঃ—শ্রমজীবীলোকদিগের সন্তানগণ যাহাতে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে তাহার উপায়বিধান করা কর্ত্তব্য। শ্রমিকদিগকে কি কি

বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, কি প্রণালীতে উহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত, এসকল বিষয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এই সকল বিষয়ের বিচার করা এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে, তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যেরূপ জ্ঞান জন্মিলে তাহারা কিরূপে সংসার চালাইতে হয় বুঝিতে পারিবে, কিরূপে আপন আপন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হয়, কিরূপে আপনাদিগের বেতনবর্দ্ধনের উপায় অনুসন্ধান করিতে হয়, যেরূপ জ্ঞান জন্মিলে এই সকল বিষয়ে বিলক্ষণ অধিকার জন্মিতে পারে তাহাদিগকে এইরূপ মোটামুটী শিক্ষা দেওয়াই কর্ত্তব্য। দরিদ্র শ্রমিকদিগকে শিক্ষাদান বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা উচিত, রাজকোষ হইতে যদি অর্থ দিতে হয় তাহাও কর্ত্তব্য। সকল দেশের ধনীদিগেরও নিজ নিজ দেশের দরিদ্রদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য অর্থানুকূল্য করা বিধেয়। এরূপ করিলে তাঁহারা যে কেবল দরিদ্র অধিবাসীদিগের উপকার করিবেন এরূপ নহে, ইহাদ্বারা সমুদয় দেশের দারিদ্র্যনিবারণেরও প্রকৃত উপায় করা হইবে। আর তাঁহারা দিন দিন দরিদ্রদিগের ভরণপোষণার্থ ভিক্ষা বা অন্যান্য প্রকারে যে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন দরিদ্রেরা শিক্ষিত হইলে ক্রমে সেই সকল অর্থ চিরকালের জন্য বাঁচিয়া যাইবে।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে বহুপুত্র উৎপাদন করিয়া উহাদিগকে ভরণপোষণ করিতে অসমর্থ হওয়া, অথবা প্রতিপালনের সামর্থ্য না থাকিলেও বহুপুত্র উৎপাদন করা অতিশয় ঘৃণাস্পদ ও নিন্দনীয় কার্য্য, শ্রমিকদিগের মনে এরূপ সংস্কার জন্মিয়া দিতে হইলে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। কিন্তু কেবল শিক্ষার উপর নির্ভর করিলে কখনই অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারেনা, কারণ নিতান্ত দুঃস্থ ও দরিদ্রদিগকে সুখস্বচ্ছন্দে

জীবনযাপন করিবার উপায়বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া সহজ ব্যাপার নহে। যেরূপ অন্ধদিগকে পথ বলিয়া দিলে তাহারা স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া যাইতে পারেনা, তাহাদিগের হাত ধরিয়া লইয়া যাইতে হয়, সেইরূপ যাহারা চিরকাল দুর্দশা, দারিদ্র্য ও অভাবের ক্রোড়ে প্রতিপালিত, যাহারা কখনই সুখস্বচ্ছন্দের আস্বাদ পায় নাই, মোটা ভাত মোটা কাপড় ভিন্ন অন্য কোন প্রকার সুখের সহিত যাহাদের কখনই পরিচয় হয় নাই, এবম্ভূত হতভাগ্য দরিদ্রদিগকে সুখস্বচ্ছন্দের পথ মাত্র দেখাইয়া দিয়া নিরস্ত হইলে উহারা কখনই তাহার নিকট পৌঁছিতে পারেনা। যেমন অন্ধদিগকে হাত ধরিয়া উহাদের অভিপ্রেত স্থানে লইয়া যাইতে হয়, সেইরূপ দরিদ্রদিগকেও হাত ধরিয়া সুখের মন্দিরে উপস্থিত করিয়া দিতে হয়। যেরূপ শিক্ষার বিষয় পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, সেইরূপ শিক্ষার সহিত অন্ততঃ এক পুরুষের নিমিত্তেও যাহাতে উহারা সুখস্বচ্ছন্দের আস্বাদ পায় এরূপ উপায়বিধান করা উচিত। যদি উহাদিগকে সুখে জীবিকানির্ব্বাহ করিবার উপায় বলিয়া দেওয়া যায় ও উহার সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও সুখের আস্বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে উহারা যাহাতে চিরকাল ঐরূপ অবস্থায় থাকিতে পারে ও উত্তরোত্তর আপনাদিগকে অধিকতর উন্নত করিতে পারে, তদ্বিষয়ে আপনারাই যত্নবান হইবে, তখন আর উহাদিগের পুনর্ব্বার অধোগতি হইবার কিছুমাত্র আশঙ্কা থাকিবে না। আইন বা ঐক্যবন্ধনদ্বারা শ্রমজীবীদিগের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে উহা চিরস্থায়ী হয় না ইহা পূর্ব্বেই নির্ণীত হইয়াছে, কিন্তু এই উপায়ে শ্রমজীবীদিগের অবস্থার উন্নতি হইলে উহা চিরস্থায়ী হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শ্রমিকদিগের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে দুইটী উপায় অবলম্বন করা উচিত।

১ম। দেশের যে যে স্থানে নিয়োগ করিবার প্রয়োজন অপেক্ষা লোক সংখ্যা অধিক হইয়াছে, সেই সেই স্থান হইতে কিয়দংশ লোক লইয়া যে যে স্থানে লোকের বসতি নাই বা অল্পমাত্র লোকের বসতি আছে,এরূপ স্থানে বাস করাইতে হয়। এরূপ করিলে তাহারা যে স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে, তথাকার লোকসংখ্যা কমিয়া যায় বলিয়া সেখানকার বেতন-বৃদ্ধি হইয়া উঠে, আর তাহারা যে স্থানে গমন করে তথায় লোকাভাব বা লোকের অল্পতাপ্রযুক্ত যে সকল লাভজনক কার্য্য চলিবার সুবিধা ছিলনা, তৎসমুদয় সম্পন্ন হইতে আরম্ভ হয়। অতএব এরূপ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে যে অর্থব্যয় করিতে হয় তাহাও নিষ্ফল হইয়া যায় না।

২য়। দেশের সকল ভূমিই জমিদারদিগের সহিত বন্দোবস্ত না করিয়া, তাহার যে অংশ বন ও জঙ্গলে আচ্ছন্ন, বা এরূপ অনুর্ব্বরা যে বিশেষ পরিশ্রম না করিলে উহাতে কিছু-মাত্র ফসল জন্মিতে পারে না, তৎসমুদয় প্রজাদিগের সহিত বিনা খাজনায় বন্দোবস্ত করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। যে সকল প্রজার এরূপ কিছু সংস্থান আছে, যে উহারা প্রথমবার আবাদ খরচ চালাইতে পারে ও যত দিন ফসল উৎপন্ন না হয়, তত দিন পরিবার প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয়, অথবা যাহারা এরূপ সচ্চরিত্র যে তাহাদিগকে অন্য লোকে টাকা ধার দিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে এরূপ প্রজার সহিত সর্ব্বাগ্রে ঐ জমির বন্দোবস্ত করা উচিত। তাহা হইলে উহাদের দেখাদেখি অন্যান্য শ্রমজীবীরাও কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিবে ও সচ্চরিত্র হইতে যত্নবান হইবে। এরূপ স্থলে আবশ্যকমতে গবর্ণমেণ্টও কিছু কিছু টাকা ধার দিতে পারেন। ইহাতে গবর্ণ-মেণ্টের কিছুই ক্ষতি নাই। ঐ সকল জমি আবাদ হইয়া উহা

হইতে কৃষকদিগের লাভ হইতে আরম্ভ হইলেই গবর্ণমেণ্ট কিছু কিছু খাজনা ধার্য্য করিতে পারেন ও ক্রমে বাড়াইবারও সম্ভাবনা হয়। এই রূপেই আবার ধার দেওয়া টাকা সুদ সমেত আদায় হইতে পারে। আমাদের দেশে সুন্দরবন অঞ্চলে যে সকল ভূমি আছে, তাহাতে অনায়াসেই এইরূপ বন্দোবস্ত হইতে পারে, এই জন্যই কয়েক বৎসর অবধি এইরূপ ও অন্যান্য প্রকারে সুন্দরবনে আবাদ আরম্ভ হইয়াছে। এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে শ্রমজীবীদিগের আশা করিবার পদার্থ জন্মে, ও উহাদের অনুকরণ করিবার বিষয় উপস্থিত হয়। যাহারা ঐ রূপ জমি প্রাপ্ত হয় তাহারা আপন আপন অবস্থা উন্নত করিতে থাকে, আর অন্যান্য সকলেই উহাদের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং কিছুদিন এইরূপ চলিলে শ্রমজীবীদিগের সকলেরই অবস্থার উন্নতি হয় ও দেশ হইতে দারিদ্র্যদুঃখ অপসারিত হইবার সূত্রপাত হয়: আমাদের দেশের এক্ষণে যেরূপ অবস্থা তাহাতে বোধ হয় এইরূপ উপায় অবলম্বন করিলেই দেশের মঙ্গল হইতে পারিবে, ও শ্রমের বেতন বৃদ্ধি হইয়া দারিদ্র্যের নিবারণ হইতে পারিবে। আমাদের দেশে এখনও অপরিমিত স্থান আছে। অতএব এখনও আমাদের বিদেশে উপনিবেশ সংস্থাপনের আবশ্যকতা হয় নাই। তবে যখন আরও লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইয়া প্রয়োজন অপেক্ষা শ্রমজীবীদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি হইবে তখনই ঐরূপ উপনিবেশ সংস্থাপনের আবশ্যকতা হইয়া উঠিবে। আপাততঃ যে কোন প্রকারে কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি দ্বারা মূলধন বাড়াইতে পারিলেই শ্রমের বেতন বর্দ্ধিত হইবে ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকিবে। তবে প্রয়োজন অপেক্ষা লোকসংখ্যা অল্প রাখিবার যে যে উপায় পূর্ব্বে নির্ণীত হইয়াছে, তৎসমুদয় মনে রাখা ও তদনুসারে কার্য্য

করা আবশ্যক,কারণ তাহা হইলে কখনই অসম্ভবরূপে বাড়িতে পারিবে না। বাড়িলেও বিদেশে উপনিবেশ সংস্থাপনরূপ উপায়দ্বারা উহা কমাইতে কাহারও আপত্তি থাকিবে না।

কিন্তু যখন দেশের সমুদয় অংশেই বসতি হইয়া যাইবে, সকল ভুমিই আবাদ হইয়া উঠিবে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে দেশের এক অংশ হইতে অপর অংশে উপনিবেশ সংস্থাপনের উপায় থাকিবে না, তখন দেশের মূলধন হইতে লোকের প্রতি-পালন হইতে পারে তদপেক্ষা শ্রমজীবীর সংখ্যাবৃদ্ধি হইলে কি উপায়ে উহা কমাইতে পারা যাইবে? দেশের এরূপ অবস্থা হইলে ভিন্নদেশে উপনিবেশ সংস্থাপন ভিন্ন লোকসংখ্যা কমাইবার ও শ্রমের বেতনবর্দ্ধন করিবার অন্য উপায় হইতে পারে না। তখন কাজে কাজেই বহুজনাকীর্ণ দেশ হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প জনাকীর্ণ বা একবারে লোকশূন্য কোন দূর-দেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে হইবে। এরূপ হইলে লোকসংখ্যা কমিয়া যাওয়াতে মাতৃভুমিরও বেতনবর্দ্ধন হইয়া দারিদ্র্যনিবারণ হইতে পারিবে। আর উপনিবেশেরও নূতন স্থান পাওয়াতে ধনোৎপাদনের সুবিধা হইয়া উঠিবে। বৈদে-শিক উপনিবেশ সংস্থাপনদ্বারা মাতৃভূমি ও উপনিবেশ উভ-য়েরই কিরূপ উপকার হইতে পারে পূর্ব্বে তৎসমুদয় সবিস্তরে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে আর উহার পুনরুল্লেখ করি-বার আবশ্যকতা নাই। তবে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে যে, ইংলণ্ড ও উহার উপনিবেশ সকলের উপর নেত্রপাত করিলে উপনিবেশ সংস্থাপনের যে কি গুণ তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে। দারিদ্র্যনিবারণের যে সকল উপায় এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমুদয় কার্য্যকর হইলে দেশের দারিদ্র্যদুঃখ নিবারণ হইয়া যাইতে পারিবে। তখন কাহাকেও

আর অকালমৃত্যুর করালগ্রাসে পতিত হইতে হইবেনা, কাহাকেও দুর্ভিক্ষমহামারী প্রভৃতি যমদূতের ভীষণমূর্ত্তি দর্শন করিতে হইবেনা, কাহাকেও নিরন্ন ভিক্ষুকদিগের উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবেনা। ফলতঃ তখন অকালমৃত্যু মহামারী দুর্ভিক্ষ চৌর্য্যবৃত্তি প্রভৃতি সমাজের কণ্টক অপসারিত হইয়া সমাজ নূতন শোভা ধারণ করিবে ও মনুষ্য দুঃখের সমুদ্র হইতে উদ্ধৃত হইয়া সুখের সাগরে সন্তরণ দিতে থাকিবে।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে পৃথিবী অপরিসীম নহে, ইহার সীমা নির্দ্ধারিত আছে। কিন্তু লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সীমা নাই, নদীস্রোত যেরূপ নিরন্তর নিম্নাভিমুখে ধাবমান, লোকসংখ্যা সেইরূপ বৃদ্ধির অভিমুখে ধাবমান। সুতরাং কখন না কখন এরূপ সময় উপস্থিত হইবে, যখন উপনিবেশ সংস্থাপন প্রভৃতি নানাবিধ কারণে পৃথিবীর সমুদয় স্থানেই বসতি হইয়া যাইবে। সকল ভূমিই আবাদ হইয়া যাইবে। কোথাও নূতন বাসস্থান বা নূতন আবাদের স্থান থাকিবে না। এরূপ সময় যে কতদূর অন্তরে আছে তাহার নির্ণয় করা যায় না, তবে কখন না কখন যে এরূপ সময় উপস্থিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এরূপ সময় উপস্থিত হইলে কিরূপে কোন দেশের অতিরিক্ত লোকসংখ্যা কমাইতে পারা যাইবে তাহার অনুমান করা যাইতে পারে। সকল দেশের লোকসংখ্যা কিছু সমান হইতে পারে না, সুতরাং এরূপ সময়েও যেখানকার লোকসংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক তথা হইতে কিয়ৎসংখ্যক লোক লইয়া যেখানকার লোকসংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প তথায় বাস করান যাইতে পারিবে। আর যদি এরূপ অবস্থাই হইয়া উঠে যে এক দেশ হইতে লোক লইয়া অপর দেশে বাস করাইবার স্থান না থাকে, তাহা হইলে কিছুকাল এরূপ থাকিবার পর অনুপযুক্ত আহার অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস প্রভৃতি কারণে বোধ হয় মহামারী প্রভৃতি উৎপাত উপস্থিত হইয়া সমুদায় পৃথিবীতেই বিস্তৃত হইয়া পড়িবে, ও সর্ব্বত্রের লোকসংখ্যা একবারেই কমিয়া যাইবে। বোধ হয় কখন না

কখন এইরূপ ভয়ানক সময় উপস্থিত হইবে এই আশঙ্কা করিয়াই আমাদের শাস্ত্রকারেরা প্রলয়কালের কথা বলিয়া থাকিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিনিময়—মূল্য ও পণ।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে বিনিময় সমাজবন্ধনের মূলস্বরূপ। বিনিময়ের প্রথা প্রচলিত হওয়াতেই পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সমাজবন্ধন হয়, আবার এই প্রথা প্রবল হওয়াতেই ভিন্ন ভিন্ন সমাজের পরস্পর সংস্রব হইতে আরম্ভ হয়। এইরূপে বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়। ক্রমে এই প্রথা অধিকতর প্রবল হওয়াতে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে, ও দেশের সুখসমৃদ্ধি-বৃদ্ধি হইয়া মনুষ্য উন্নতির সোপানে আরূঢ় হয়। ইংলণ্ড আমাদের দেশ হইতে প্রায় তিন হাজার ক্রোশ দূরে অবস্থিত, কিন্তু আমরা এত দূরে (কলিকাতায়) থাকিয়াও অনায়াসেই তথাকার পরিশ্রমোৎপন্ন দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতেছি। আবার ইংলণ্ডের লোকেরা অতদূরে থাকিয়াও আমাদের দেশের সামগ্রীসকল ব্যবহার করিতেছেন। বিনিময়প্রথার প্রবল প্রচারই এইরূপ সুখের একমাত্র কারণ। যদি বিনিময়ের প্রথা প্রচলিত না হইত তাহা হইলে বিলাতী জিনিস ব্যবহার করা দূরে থাকুক, আমরা ইংলণ্ডের নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পাইতাম কি না বলা যায়না। ফলতঃ বিনিময়ের প্রথা প্রচলিত না থাকিলে আমরা কখনই সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিতে পারিতাম না। বন্য পশু-

কখন এইরূপ অভাবের সময় উপস্থিত হইবে এই আশঙ্কা করিয়াই আমাদের শাস্ত্রকারেরা প্রলয়কালের কথা বলিয়া থাকিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিনিময়—মুদ্রা ও পণ।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে বিনিময় সমাজবন্ধনের মূল-স্বরূপ। বিনিময়ের প্রথা প্রচলিত হওয়াতেই পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সমাজবন্ধন হয়, আবার এই প্রথা প্রবল হওয়াতেই ভিন্ন ভিন্ন সমাজের পরস্পর সংস্রব হইতে আরম্ভ হয়। এইরূপে বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়। ক্রমে এই প্রথা অধিকতর প্রবল হওয়াতে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে, এ দেশের সুখসমৃদ্ধি-বৃদ্ধি হইয়া মনুষ্য উন্নতির সোপানে আরূঢ় হয়। ইংলণ্ড আমাদের দেশ হইতে প্রায় তিন হাজার ক্রোশ দূরে অবস্থিত, কিন্তু আমরা এত দূরে (কলিকাতায়) থাকিয়াও অনায়াসেই তথাকার পরিশ্রমোৎপন্ন দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতেছি। আবার ইংলণ্ডের লোকেরা অতদূরে থাকিয়াও আমাদের দেশের সামগ্রীসকল ব্যবহার করিতেছেন। বিনিময়প্রথার প্রবল প্রচারই এইরূপ সুখের একমাত্র কারণ। যদি বিনিময়ের প্রথা প্রচলিত না হইত তাহা হইলে বিলাতী জিনিস ব্যবহার করা দূরে থাকুক, আমরা ইংলণ্ডের নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পাইতাম কি না বলা যায়না। ফলতঃ বিনিময়ের প্রথা প্রচলিত না থাকিলে আমরা কখনই সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিতে পারিতাম না। অতএব পণ-

দিগের ন্যায় আমাদিগকেও বৃক্ষাদির ফলমূল খাইয়া, বৃক্ষের বল্কল পরিধান করিয়া, চিরকাল বৃক্ষকোটরে বা কদর্য্য পর্ণ-কুটীরে কাল কাটাইতে হইত সন্দেহ নাই।

পৃথিবীর আদিম অবস্থায় বিনিময়ের প্রথা প্রচলিত ছিলনা। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আপনার বা আপন আপন পরিবারের আবশ্যক-সামগ্রী সমুদয়ের জন্য আপনার উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হইত। কেহ কাহারও সাহায্য করিত না। তৎকালে প্রত্যেক গৃহস্থকেই জীবিকানির্ব্বাহের উপযুক্ত তাবৎসামগ্রীই স্বহস্তে প্রস্তুত করিতে হইত। সুতরাং তখন কৃষিবাণিজ্য কিছুই প্রচলিত ছিলনা। লোকে কথঞ্চিৎ উদরপূরণ করিয়া জীবনধারণ করিত। ক্রমে ঐরূপে পশুবৎ জীবনযাপন করা লোকের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে. ও লোকে আপন আপন পরিশ্রমোৎপন্ন দ্রব্যাদি অপরের সহিত বিনিময় করিতে আরম্ভ করে। কালক্রমে যেমন নূতন নূতন অভাব উপস্থিত হইয়া উঠে, অমনি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সেই সেই অভাবের নিবারণার্থ ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করে, ও এইরূপেই সমাজে পৃথক পৃথক ব্যবসায়ের সৃজন হয়। যে কৃষিকার্য্য করে সে আপন পরিশ্রমোৎপন্ন শস্যাদি হইতে আপনার প্রয়োজনমত রাখিয়া উদ্বৃত্ত অংশ দিয়া উহার পরিবর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে তাহাদিগের পরিশ্রমোৎপন্ন অন্যান্য আবশ্যক সামগ্রী লইতে আরম্ভ করে। যে বস্ত্র নির্ম্মাণ করে সে আবার বস্ত্রের পরিবর্ত্তে ধান্যাদি খাদ্যসামগ্রী ও বাক্স সিন্দুক প্রভৃতি অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্য তত্তদ্ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে লইতে থাকে। ফলতঃ যখন বিনিময়ের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, তখন হইতেই লোকের সুবিধা হইতে আরম্ভ হয়। কাহাকেও আর নিজ ব্যবহারের উপযুক্ত সমুদয় সামগ্রীই স্বহস্তে প্রস্তুত করিতে হয় না। সকলেই বিশেষ বিশেষ ব্যবসায় অবলম্বনপূর্ব্বক আপন আপন পরিশ্রমোৎপন্ন দ্রব্যাদির বিনিময়ে অন্যান্য ব্যবসায়ীর পরিশ্রমোৎপন্ন দ্রব্যাদি পাইতে থাকে। ক্রমে লোকসংখ্যার বৃদ্ধিসহকারে বিনিময়ের প্রথা বাড়িতে থাকে, ও সমাজ বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হয়। এইরূপে বিনিময়ের

প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে অনেক সুবিধা হইল বটে, কিন্তু ইহার বৃদ্ধিও বিস্তার হইয়া উঠিলে আবার স্বচ্ছন্দে বিনিময় চলিবার একটী বিশেষ অসুবিধা লক্ষিত হয়। এতদিন পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ীরা নিজের পরিশ্রমদ্বারা উৎপন্নসামগ্রীর পরিবর্ত্তে অপরের পরিশ্রমোৎপন্ন সামগ্রী লইত। কিন্তু এইরূপ প্রথা থাকাতে কালক্রমে এরূপ হইয়া উঠে যে প্রয়োজন হইলেই আবশ্যকমত সামগ্রী পাওয়া কঠিন হয়। যে ব্যক্তি কৃষক তাহার বস্ত্রের প্রয়োজন হইলে সে আপন পরিশ্রমোৎপন্ন শস্যাদি দিয়া বস্ত্রনির্ম্মাতার নিকট বস্ত্র লইতে পারে বটে, কিন্তু যৎকালে কৃষকের বস্ত্র লইবার প্রয়োজন হয়, তখন বস্ত্রনির্ম্মাতার শস্য লইবার প্রয়োজন না থাকিতেও পারে, সুতরাং এরূপ স্থলে কৃষকের প্রয়োজনের সময় বস্ত্র পাওয়া কঠিন হয়। আবার এরূপ হইতে পারে যে যখন কৃষকের বস্ত্রের প্রয়োজন হইয়াছে, তখন বস্ত্রনির্ম্মাতার কৃষিজ দ্রব্যের প্রয়োজন না হইয়া বাক্স বা সিন্দুকের প্রয়োজন হইয়াছে, সে বাক্স বা সিন্দুক পাইলেই কাপড় দিতে পারে। তখন কৃষককে আবার অনুসন্ধান করিতে হইবে কোন্ সূত্রধরের কৃষিজদ্রব্যের প্রয়োজন হইয়াছে, যদি কাহারও হইয়া থাকে তাহা হইলেই কৃষক উহাকে ধান্যাদি দিয়া ঐ ধান্যাদির পরিবর্ত্তে বাক্স লইয়া ঐ বাক্সের পরিবর্ত্তে, আবার তন্তুবায়ের নিকট বস্ত্র লইতে পারে, কিন্তু যদি তৎকালে সূত্রধরের ধান্যাদি লইবার প্রয়োজন না থাকে তাহা হইলেই কৃষকের সর্ব্বনাশ। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ যে যতদিন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দ্রব্যাদির বিনিময় সাধিত হইত ততদিন লোকের কতই অসুবিধা সহ্য করিতে হইয়াছিল। আবার কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে দিয়া অন্যান্য দ্রব্য কি পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে, কালক্রমে ইহাও নির্ণয় করা কঠিন হইল। কিছুদিন এই সকল অসুবিধা সহ্য করিবার পর সকলেরই উহা নিবারণ করিবার চেষ্টা হইল, এবং সকলে একমত হইয়া কোন একটী দ্রব্য এরূপ স্থির করিল যে ঐ নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যের বিনিময়ে তাবৎ দ্রব্যই পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপেই মনুষ্যসমাজে অর্থের ব্যবহার প্রচলিত হইল। অর্থ বিনিময়ের সর্ব্বসাধারণ মধ্যবর্ত্তী, অর্থাৎ অর্থের পরিবর্ত্তে তাবৎ দ্রব্যই পাওয়া যায়। কৃষক ধান্যাদি

বিক্রয় করিয়া অর্থ লইতে পারে, আবার ঐ অর্থের পরিবর্তে প্রয়োজন হইলেই তন্তুবায়ের নিকট বস্ত্র লইতে পারে, অর্থ পাইলে তন্তুবায়ের বস্ত্র দিবার কিছুমাত্র আপত্তি থাকে না, কারণ তন্তুবায় বুঝিতে পারে যে অর্থদ্বারা সে আপনার প্রয়োজনমত দ্রব্যাদি ইচ্ছা হইলেই লইতে পারিবে। এইরূপ অর্থের ব্যবহার প্রচলিত হওয়াতে বিনিময়কার্য্যের কতদূর উন্নতি হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ইহার প্রবল প্রচার হওয়াতে দেশ বিদেশে বাণিজ্য চলিতে আরম্ভ হয়, ও পৃথিবীর এক প্রান্তের অধিবাসীরাও এক পরিবারের ন্যায় অপর প্রান্তের অধিবাসীদিগকেও সাহায্য করিতে সমর্থ হইয়া উঠে। অর্থ-ব্যবহার প্রচলিত হওয়াতে আর একটী মহৎ উপকার হইয়াছে। পূর্ব্বে দ্রব্যের মূল্যনির্দ্ধারণ হওয়া কঠিন হইত, কিন্তু অর্থের ব্যবহার প্রচলিত হওয়াতে উহা অতিশয় সহজ হইয়া উঠিয়াছে। দ্রব্যাদির মূল্যনির্দ্ধারণ না হইলে এক দ্রব্যের সহিত অন্যদ্রব্যের বিনিময় চলিতে পারে না, আবার মূল্যনির্দ্ধারণ কঠিন হইলেও বিনিময় কার্য্যের বিলক্ষণ অসুবিধা হয়। অর্থের বিনিময়ে দ্রব্য লওয়াকে ক্রয় ও দ্রব্যের বিনিময়ে অর্থ লওয়াকে বিক্রয় কহে। আমরা ক্রয় বিক্রয় ব্যাপার অতি সহজে সম্পন্ন করিয়া থাকি, কিন্তু অর্থের ব্যবহার প্রচলিত না হইলে ক্রয় বিক্রয়ের কার্য্য কোনরূপেই চলিত না। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ বিনিময় প্রথাদ্বারা দেশের কি না উপকার হইয়াছে? বিনিময় ধনবিভাগের মূল। যেরূপ কলের গাড়ি ও রেল এই উভয়কে আশ্রয় করিয়া বাষ্পের শক্তি কার্য্যকর হয় সেইরূপ বিনিময়কে আশ্রয় করিয়া ধনবিভাগের নিয়মগুলিও কার্য্যকর হইয়া থাকে। খাজনা বেতন ও লাভ তিনটীই এক প্রকার বিনিময়। জমিদার কৃষককে ভূমিব্যবহার করিতে দেন, ও ঐ ব্যবহারের বিনিময়ে খাজনা লইয়া থাকেন। শ্রম-জীবী পরিশ্রমের বিনিময়ে বেতন পাইয়া থাকে, ও ব্যবসায়ী পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে লাভ পায়।

অতএব প্রতিপন্ন হইল যে বিনিময় ধনবিভাগের নিয়ত সহকারী। কিন্তু বিনিময়ক্রিয়া সাধিত করিতে হইলে সমুদয় দ্রব্যেরই মূল্য বা দর, ও পণ বা দাম নির্ণয় করা উচিত। অত-

এর মূল্য কাহাকে কহে, পণ কাহার নাম, কিরূপ নিয়ম অনুসারে মূল্য ও পণের হ্রাসবৃদ্ধি ও তারতম্য হইয়া থাকে এক্ষণে তৎসমুদয় সবিস্তরে নির্ণয় করা যাইতেছে।

পদার্থের যে শক্তি বা গুণ থাকাতে উহার বিনিময়ে অন্যান্য পদার্থ পাওয়া যাইতে পারে, তাহাকেই উহার মূল্য কহে। একটী দ্রব্যের পরিবর্ত্তে অন্যান্য তাবৎ দ্রব্যের মধ্যে কোনটী অধিক সংখ্যায় বা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, আর কোনটী বা অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যায় বা অল্পপরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। মনে কর এক মণ চাউলের পরিবর্ত্তে আধ মণ লবণ পাওয়া যায়, অতএব এস্থলে একমণ চাউলের মূল্য আধ মণ লবণ অর্থাৎ চাউলের মূল্য লবণের মূল্যের অর্দ্ধেক। আবার মনে কর এক মণ চাউলের বিনিময়ে দুই মণ মটর পাওয়া যায়, অতএব এস্থলে এক মণ চাউলের মূল্য দুই মণ মটর, অর্থাৎ চাউলের মূল্য মটরের মূল্যের দ্বিগুণ। এইরূপে অন্যান্য তাবৎ দ্রব্যের সহিত তুলনা করিয়া চাউলের কিরূপ মূল্য তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে। অর্থাৎ নির্দ্দিষ্টপরিমাণ কিছু চাউলের পরিবর্ত্তে কোন দ্রব্য কত পাওয়া যাইতে পারে ইহা নির্ণয় করিলেই চাউলের মূল্য নির্ণীত হইতে পারে। মনে কর এক মণ চাউলের পরিবর্ত্তে যেরূপ আধ মণ লবণ ও দুই মণ মটর পাওয়া যায়, সেইরূপ উহার পরিবর্ত্তে দশ সের তৈল, দুই সের ঘৃত, আধ মণ ময়দা, দশ গজ কাপড় প্রভৃতি পাওয়া যাইতে পারে। চাউলের যে গুণ বা শক্তি থাকাতে কিছু নির্দ্দিষ্টপরিমাণ চাউলের পরিবর্ত্তে অন্যান্য তাবৎ দ্রব্যই অল্প বা অধিক কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে তাহাকেই চাউলের মূল্য কহে। সমুদায় দ্রব্যের পক্ষেই এই নিয়ম। এক্ষণে প্রতিপন্ন হইতেছে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত তুলনাদ্বারাই কেবল

কোন দ্রব্যের কি মূল্য তাহা স্থির করা যাইতে পারে। নতুবা একটীমাত্র দ্রব্য অবলম্বন করিয়া অন্যান্য দ্রব্যের সহিত তুলনা না করিলে কখনই উহার মূল্যের নির্ণয় হইতে পারেনা। যদি কোন দ্রব্যের মূল্য অন্য একটী দ্রব্যের সহিত তুলনায় পূর্ব্বাপেক্ষা কম হইয়া যায়, তাহা হইলে এই বুঝিতে হইবে, যে পূর্ব্বে প্রথম দ্রব্যের যে পরিমাণ বা সংখ্যার পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় দ্রব্যের যে পরিমাণ বা সংখ্যা পাওয়া যাইত, এক্ষণে তাহা অপেক্ষা অল্প পরিমাণ বা সংখ্যা পাওয়া যাইবে। সুতরাং এস্থলে ইহাও বুঝিতে হইবে যে যখন ঐ প্রথম দ্রব্যের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প হয়, তখনই ঐ দ্বিতীয় দ্রব্যের মূল্যও প্রথম দ্রব্যের সহিত তুলনায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। কারণ পূর্ব্বে দ্বিতীয় দ্রব্যের যে পরিমাণ বা সংখ্যার পরিবর্ত্তে প্রথম দ্রব্যের যে পরিমাণ বা সংখ্যা পাওয়া যাইত, এক্ষণে তদপেক্ষা অধিক পাওয়া যাইবে।

মনে কর এক্ষণে এক মণ চাউলের পরিবর্ত্তে আধমণ লবণ পাওয়া যাইতেছে। অতএব এক্ষণে চাউলের মূল্য লবণের অর্দ্ধেক, আর লবণের মূল্য চাউলের দ্বিগুণ। কিন্তু চাউলের বাজার পূর্ব্বাপেক্ষা নরম হইল, সুতরাং এক্ষণে আর একমণ চাউলের বিনিময়ে পূর্ব্বের ন্যায় আধ মণ লবণ পাওয়া যাইবে না। মনে কর এক্ষণে ১ মণ চাউলের বদলে কেবল ১০ সের লবণ পাওয়া যাইবে, অতএব এস্থলে চাউলের মূল্য অর্দ্ধেক কমিয়াছে বলিতে হইবে, অর্থাৎ চাউলের মূল্য এক্ষণে লবণের মূল্যের অর্দ্ধেক না থাকিয়া চারি ভাগের এক ভাগ হইয়া যাইতেছে, আর লবণের মূল্য বাড়িয়া চাউলের মূল্যের দ্বিগুণ হইতে চতুর্গুণ হইয়া উঠিতেছে।

অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে কোন একটী দ্রব্যের মূল্য যে হিসাবে কমিয়া যায়, তাহার সহিত বিনিময়ে তাবৎ দ্রব্যের মূল্যই সেই পরিমাণে বাড়িয়া উঠে। আবার কোন দ্রব্যের

মূল্য যে পরিমাণে বাড়িয়া উঠে, তাহার সহিত বিনিময়ে তাবৎ দ্রব্যের মূল্যই সেই পরিমাণে কমিয়া যায়। সুতরাং একটী দ্রব্যের মূল্য কমিয়া যাইলেই এই বুঝিতে হইবে, যে উহার সহিত বিনিময়ে তাবৎ দ্রব্যের মূল্যই বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেইরূপ একটী দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া উঠিলেই এই বুঝিতে হইবে যে তাহার সহিত বিনিময়ে তাবৎ দ্রব্যেরই মূল্য কমিয়া গিয়াছে। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে তাবৎ দ্রব্যেরই মূল্য কখনই যুগপৎ বাড়িয়া উঠিতে পারেনা। সকল দ্রব্যের মূল্যই এককালে বাড়িয়া উঠিতে পারে এরূপ মনে করা কেবল ভ্রমমাত্র তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

দ্রব্যের মূল্য কাহার নাম, তাহা স্থির হইল, কিন্তু দ্রব্যের পণ কাহাকে বলে? মূল্য ও পণ এই উভয়ের পরস্পর প্রভেদ কি? পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে বিনিময়কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত প্রায় সকল সমাজের লোকেই একমত হইয়া কোন না কোন একটী বিশেষ দ্রব্য এরূপ নির্দ্ধারিত করিয়া লইয়াছে যে উহার পরিবর্ত্তে অন্যান্য তাবৎ দ্রব্যই পাওয়া যাইতে পারে। ইংলণ্ড ভারতবর্ষ প্রভৃতি সকল সভ্য সমাজের অধিবাসীরা সোণা, রূপা, বা তামার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড মুদ্রিত করিয়া লইয়া উহাই বিনিময়ের সর্ব্বসাধারণ দ্বারস্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। বহুকাল পূর্ব্বে আমাদের দেশে ঐ কার্য্যের নিমিত্ত কেবল কড়িই ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে কড়ির ব্যবহার অনেক কমিয়া গিয়াছে। আফ্রিকার অনেক অসভ্যস্থানে অদ্যাপি কেবল কড়িই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিনিময়ের সুবিধার নিমিত্ত উপরি উক্ত প্রকারে নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যকে অর্থ বলা যায়।

যে সমাজে যেরূপ পদার্থই অর্থরূপে ব্যবহৃত হউক না কেন, প্রত্যেক সমাজেই স্বতন্ত্রগুণের ব্যবহৃত অর্থদ্বারা তথাকার বিনিময়কার্য্য অনা-

য়াসেই সম্পাদিত হয়। কিন্তু এক সমাজের ব্যবহৃত অর্থ অন্যান্য সমাজে অর্থরূপে ব্যবহৃত হয় না। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের সহিত পরস্পর কারবার চালাইবার অসুবিধা হইয়া থাকে। একণে এই সকল অসুবিধা নিবারণের উদ্দেশে হুণ্ডী বরাতচিঠী, বিল অব এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহারা বাস্তবিক অর্থ নহে, কিন্তু অর্থ প্রদানের অঙ্গীকারমাত্র, কিন্তু ইহাদের দ্বারা অর্থের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে, বলিয়া ইহারাও অর্থরূপে পরিগণিত। আবার এক সমাজের মধ্যে ও বিনিময়ক্রিয়ার অধিকতর সুবিধার নিমিত্ত ব্যাঙ্ক-নোট, প্রমিসরী নোট প্রভৃতি কাগজ মুদ্রার প্রচার হইয়াছে। এই সকলগুলিও অর্থপ্রদানের অঙ্গীকার মাত্র। কিন্তু ইহাদের দ্বারাও অর্থের কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় বলিয়া ইহাদিগকেও অর্থ বলা যায়। এই সকল বিষয় অর্থের পরিচ্ছেদে সবিস্তারে বর্ণিত হইবেক।

দ্রব্যের মূল্য কাহাকে বলে তাহা পূর্ব্বেই নির্ণীত হইয়াছে, আর অর্থ কাহাকে বলে তাহাও উপরে নির্ণীত হইল। এই দুইটী বিষয় অবগত হইলে দ্রব্যের পণ (Price) কাহার নাম তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। যেরূপ কোন দ্রব্যকে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত তুলনা করিলে উহার মূল্য বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ কোন দ্রব্যকে অর্থের সহিত তুলনা করিলেই তাহার কি পণ স্থির করিতে পারা যায়। কোন দ্রব্যের কিছু নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বা সংখ্যার বিনিময়ে কত অর্থ পাওয়া যায় তাহার নির্ণয় করাই দ্রব্যের পণ নির্দ্ধারণ। অতএব বুঝিতে হইবে দ্রব্যের যে পরিমাণ বা সংখ্যার পরিবর্ত্তে যত অর্থ পাওয়া যায়, তাহাই ঐ দ্রব্যের সেই পরিমাণ বা সংখ্যার পণ। কোন দ্রব্যকে তাহার সহিত বিনিময়ে অন্যান্য তাবৎ দ্রব্যের সহিত তুলনা করিলে উহার মূল্য স্থির হয়। আর কোন দ্রব্যকে কেবল অর্থের

সহিত তুলনা করিলে উহার পণ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে পণ মূল্যের একটী বিশেষ স্থলমাত্র। মূল্য ও পণ এই উভয়ের মধ্যে স্বরূপগত বিভিন্নতা কিছুই নাই। কেবল সামান্যবিশেষ ভাব আছে এই মাত্র। মনে কর ১ মণ চাউলের পরিবর্ত্তে দুইটী টাকা পাওয়া যায়। এস্থলে একমণ চাউলকে অর্থের সহিত তুলনা করা যাইতেছে, সুতরাং অর্থের সহিত তুলনায় এক মণ চাউলের মূল্য ২ টাকা ইহা সর্ব্বাংশেই যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু সুবিধার নিমিত্ত এইটীকে এক প্রকারের মূল্য না বলিয়া চাউলের পণ বলা গিয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে তাবৎ দ্রব্যেরই পরস্পর বিনিময় প্রায় সর্ব্বদাই অর্থ অবলম্বনপূর্ব্বক সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহাকেই ক্রয় বিক্রয় বলা যায়। ক্রয় বিক্রয় ভিন্ন অন্যপ্রকার বিনিময় এখন আর প্রায় প্রচলিত নাই। এই জন্যই অর্থাৎ অর্থের সহিত বিনিময় অনুক্ষণ আবশ্যক বলিয়া এইটীকে চুনিয়া লইয়া উহার একটী স্বতন্ত্র সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। মূল্য ও পণ এই উভয়ের পরস্পর প্রভেদ বিশেষরূপে মনে রাখা কর্ত্তব্য, নতুবা অর্থনীতির নিয়মসকল পরস্পর বিষম্বাদী বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে সকল দ্রব্যের মূল্য এক কালে বাড়িয়া উঠিতেও পারেনা, কমিয়া যাইতেও পারেনা। কিন্তু সকল দ্রব্যের পণ যুগপৎ বাড়িতেও পারে আবার কমিয়া যাইতেও পারে। এই দুইয়ের একটীও অসম্ভব নহে। যদি অধিক সর্ব্বরাহ প্রভৃতি কোন কারণে যে সকল বহুমূল্য ধাতু অর্থরূপে ব্যবহৃত হয়, তৎসমুদয়ের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্তনিয়মে উহার সহিত তুলনায় অন্যান্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হইয়া উঠে। কাজে

কাজেই কোন নির্দ্দিষ্টপরিমাণ বা নির্দ্দিষ্টসংখ্যক অর্থের বিনিময়ে তাবৎ বিনিময় পদার্থেরই পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিমাণ বা সংখ্যা পাওয়া যাইবে, অতএব এরূপ স্থলে তাবৎ দ্রব্যেরই পণ এককালে কমিয়া যায় বলিতে হইবে। আবার যদি অল্প সর্ব্বরাহ ইত্যাদি কারণে সোণারূপা প্রভৃতি ধাতুর মূল্যবৃদ্ধি হইয়া উঠে, তাহা হইলে উহার সহিত তুলনায় অন্যান্য তাবৎ দ্রব্যেরই মূল্য কমিয়া যাইবে, অর্থাৎ যত অর্থের বিনিময়ে অন্যান্য তাবৎ দ্রব্য যত পাওয়া যাইত, এক্ষণে সেই অর্থের বিনিময়ে অন্যান্য দ্রব্য তদপেক্ষা অধিক পাওয়া যাইবে। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে সকল দ্রব্যেরই পণ যুগপৎ কমিয়া যাইতে পারে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের দেশে মুদ্রার এত প্রবলপ্রচার হয় নাই, সুতরাং অন্যান্য দ্রব্যের সহিত তুলনায় অর্থের মূল্য এখন অপেক্ষা অধিক ছিল অতএব এক্ষণে যে অর্থ দিয়া যে দ্রব্য পাওয়া যায়, তৎকালে তদপেক্ষা অল্প অর্থে এখন অপেক্ষা অধিক দ্রব্যাদি পাওয়া যাইত। এক্ষণে অর্থের অধিকতর প্রচার হওয়াতে, উহার মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বকালে যে অর্থ দিয়া যে দ্রব্য পাওয়া যাইত, এক্ষণে সেই অর্থদ্বারা তদপেক্ষা অনেক কম পাওয়া যায়। পূর্ব্বে যে অর্থে যাহা পাওয়া যাইত এক্ষণে তাহা লইতে হইলে তদপেক্ষা অধিক অর্থ দিতে হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের দেশে চাউলের মণ এক টাকা অপেক্ষাও অল্প ছিল। এক টাকায় আধমণ তৈল ক্রয় করিয়াছেন এরূপ লোক কেহ কেহ অদ্যাপি জীবিত থাকিতে পারেন। কিন্তু এক্ষণে টাকার অধিকতর প্রচার হওয়াতে পূর্ব্বাপেক্ষা কতই পরিবর্ত্ত হইয়াছে বলা যায়না।

ইষ্টসাধনতা [প্রয়োজনীয়তা বা অভিলষণীয়তা] ও দুষ্প্রাপ্যতা এই দুইটী কারণের সমবায়ে দ্রব্যের মূল্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে সামগ্রী যুগপৎ ইষ্টসাধন, ও দুষ্প্রাপ্য তাহারই মূল্য জন্মে। এই দুই কারণের একটীরও অভাবে দ্রব্যের মূল্য হয় না। সূর্য্যের উত্তাপ, আলোক, জল, ও বায়ু এই কয়েকটী দ্রব্যের বিলক্ষণ প্রয়োজনীয়তা আছে। এই সকল দ্রব্য আমাদের জীবনধারণের পক্ষে বিলক্ষণ উপযোগী। জল বায়ু প্রভৃতির অভাবে মনুষ্য কখনই জীবন ধারণ করিতে পারেনা। কিন্তু ইহাদিগের দুষ্প্রাপ্যতা নাই। এই সকল দ্রব্য অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে, ইহাদিগের উপর সকলেরই সমান অধিকার। এই জন্যই এই সকল সামগ্রীর মূল্য হয়না। যাহা ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে, তাহার বিনিময়ে লোকে অর্থ দিবে কেন? অর্থাৎ দুর্লভ নহে বলিয়া ইহাদের বিনিময়ে কোন প্রকার দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যই পাওয়া যায়না। কিন্তু কোন কোন স্থানে জল দুষ্প্রাপ্য, কাজে কাজেই লোকে অর্থ দিয়া জল ক্রয় করিয়া থাকে। যেখানে বায়ু বা আলোকের প্রবেশ নাই এরূপ কোন স্থানে উহা লইয়া যাইতে হইলে ব্যয় করিতে হয়। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, যে যদিও ঐ সকল সামগ্রী সামান্যতঃ দুষ্প্রাপ্য নহে, তথাপি যখন কোন না কোন কারণে উহা দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে তখনই উহার মূল্য হয়, দুষ্প্রাপ্য হইলেই উহাদের বিনিময়ে অর্থও পাওয়া যায়। অতএব বোধ হইতেছে, যে যতদিন ঐ সকল দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা ছিলনা, ততদিন উহাদের বিনিময়ত্বও উদ্ভূত হইতে পারে নাই। দুষ্প্রাপ্যতানিবন্ধন কখন কখন জলপ্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য হইয়া থাকে, কিন্তু সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে

ঐ সকল স্থলে জলপ্রভৃতির পরিবর্ত্তে যে অর্থ দিতে হয়, তাহা বাস্তবিক উহাদের মূল্য নহে, কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য যোগাইতে অন্য লোকের যে পরিশ্রম লাগে সেই পরিশ্রমের মূল্য এই মাত্র। অতএব বুঝিতে হইবে যে দুষ্প্রাপ্যতানিবন্ধন সাক্ষাৎসম্বন্ধে না হইলেও পরম্পরাসম্বন্ধে দ্রব্যের মূল্য হইয়া থাকে।

যে সকল দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা আছে কিন্তু কিছুমাত্র প্রয়োজনীয়তা নাই তৎসমুদয়ের মূল্য হইতে পারেনা। দ্রব্য যতই দুষ্প্রাপ্য হউক না কেন উহাদ্বারা আমাদের প্রয়োজনসাধন না হইলে আমরা কখনই উহার পরিবর্ত্তে অর্থ দিতে চাহিনা। পৃথিবীর মধ্যে অনেকানেক দুষ্প্রাপ্য পদার্থ আছে। ভূগর্ভে নানারূপ দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনে আইসেনা বলিয়া লোকে উহা উত্তোলন করেনা, ও উহার বিনিময়ে অর্থ দিতে চাহেনা। কিন্তু যদি কালক্রমে উহারা আমাদের প্রয়োজনে আইসে তাহা হইলে আবার উহাদের মূল্য হইতে পারিবে। শরীরের সৌন্দর্য্যসাধন, বা অন্যপ্রকার প্রয়োজনসাধন যে কোন প্রকারেই হউক দ্রব্য প্রয়োজনীয় হইতে পারে। ফলতঃ যে কোন প্রকারেই হউক ইষ্টসাধন হইলেই দ্রব্য অভিলষণীয় হয়। এই অভিলষণীয়তাই দ্রব্যের মূল্য হইবার কারণ।

দুষ্প্রাপ্যতা ও অভিলষণীয়তা এই দুই কারণে দ্রব্যের মূল্য হইয়া থাকে। কিন্তু কেবল দুষ্প্রাপ্যতার তারতম্য অনুসারেই দ্রব্যের মূল্যের তারতম্য হয়। অর্থাৎ অভিলষণীয় দ্রব্যসমুদায়ের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত অধিক দুষ্প্রাপ্য, তাহার মূল্য ও অপেক্ষাকৃত অধিক হয়। আবার যাহা অপেক্ষাকৃত অল্প দুষ্প্রাপ্য তাহার মূল্যও অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া থাকে। লোহা,

সোণা বা রূপা অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। ছুরী, কাঁচী, কোদাল প্রভৃতি যেসকল দ্রব্য আমাদের অনুক্ষণ প্রয়োজনে আইসে, তৎসমুদয় লোহাদ্বারা নির্ম্মিত হয়। ষ্টীম এনজীন প্রভৃতি দ্রব্যদ্বারা আমাদের কত উপকার হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায়না। এই সকল দ্রব্যও লোহাদ্বারা নির্ম্মিত। সোণারূপাদ্বারা এই সকল প্রস্তুত করিলে উহাদ্বারা কিছুই কার্য্য হইতে পারেনা। অতএব সোণা রূপা অপেক্ষা লোহা যে অধিক প্রয়োজনীয় তাহাতে আর সংশয় কি? কিন্তু সোণারূপা অপেক্ষা লোহার অধিক প্রয়োজনীতা থাকিলেও লোহা অপেক্ষা সোণারূপার মূল্য অনেক অধিক। ইহার কারণ, লোহা অপেক্ষা স্বর্ণ বা রৌপ্য অধিক দুষ্প্রাপ্য। লৌহ অনায়াসেই পাওয়া গিয়া থাকে। আবার কোন কোন দেশে লৌহ অতিশয় দুষ্প্রাপ্য, তথাকার লোকেরা আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক মূল্য দিয়াও লৌহ লইয়া থাকে। অতএব স্থির হইতেছে যে দুষ্প্রাপ্যতার তারতম্য অনুসারেই মূল্যের তারতম্য ও হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে দ্রব্য অন্যান্য দ্রব্য অপেক্ষা অধিক দুষ্প্রাপ্য তাহার মূল্যও অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা অধিক, আর যাহা তাহা নহে, তাহার মূল্যও অপেক্ষাকৃত অল্প। আবার কোন দ্রব্য এক্ষণে যেরূপ দুষ্প্রাপ্য আছে, কালক্রমে উহা তদপেক্ষা অধিক বা অল্প দুষ্প্রাপ্য হইতে পারে। যদি দুষ্প্রাপ্যতা বাড়িয়া উঠে তাহা হইলে দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হয়, আর যদি দুষ্প্রাপ্যতা কমিয়া যায় তাহা হইলে মূল্যও কমিয়া যায়। কিন্তু দুষ্প্রাপ্যতার হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তার হ্রাসবৃদ্ধি হয়না। কোন দ্রব্য এক্ষণে যেরূপ দুষ্প্রাপ্য যদি তাহা অপেক্ষা অধিক দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে, তাহা হইলেও উহার প্রয়োজনীয়তা যেরূপ ছিল তাহাই

থাকিবে। আর দুষ্প্রাপ্যতা কমিলেও প্রয়োজনীয়তা কমিয়া যায় না, উহা যেরূপ ছিল তাহাই থাকে। আমাদের দেশে লোহা এক্ষণে যেরূপ পাওয়া যায়, যদি ইহা অপেক্ষা অধিক দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে, তাহা হইলে লোহার মূল্য বাড়িতে পারে বটে, কিন্তু লোহাদ্বারা এখনও যেরূপ প্রয়োজন সাধিত হইতেছে, তখনও অবিকল তাহাই হইবে, মূল্যবৃদ্ধির সহিত উহার প্রয়োজনীয়তা কখনই বাড়িয়া উঠিবেনা।

লোহা অপেক্ষা তামা অধিক দুষ্প্রাপ্য, সুতরাং লোহা অপেক্ষা তামার মূল্য অধিক। সোনা রূপা উভয়ই লোহা ও তামা অপেক্ষা অধিক দুষ্প্রাপ্য, সুতরাং লোহা ও তামা উভয় অপেক্ষাই সোনা রূপার মূল্য অধিক। আবার রূপা অপেক্ষা সোনা অধিক দুষ্প্রাপ্য, অতএব সোনার মূল্য রূপার অপেক্ষা অধিক। যে মূল্য দিয়া যে পরিমাণে রূপা পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা ১০। ১১ গুণ মূল্য দিলে সেই পরিমাণে সোনা পাওয়া যায়। পৃথিবীতে সকল দ্রব্য অপেক্ষা হীরার মূল্য অধিক, কারণ হীরা সকল দ্রব্য অপেক্ষাই অধিক দুষ্প্রাপ্য। এক্ষণে স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইল যে দুষ্প্রাপ্যতার ন্যূনাতিরেক অনুসারে দ্রব্যের মূল্য কম বা বেশী হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন দুষ্প্রাপ্যতা ও অভিলষণীয়তা ভিন্ন বিনিমেয়তাও মূল্য হইবার আর একটী কারণ। যে দ্রব্য অন্যের সহিত বিনিময় করা যায় না তাহার মূল্যও হইতে পারে না। কিন্তু এটী যুক্তিসঙ্গত কথা নহে। দুষ্প্রাপ্যতা ও অভিলষণীয়তা থাকিলেই বিনিমেয়তা হইয়া দ্রব্যের মূল্য হইয়া থাকে। দ্রব্যের যে গুণ থাকিলে উহা অন্যান্য দ্রব্যের সহিত বিনিময় করা যাইতে পারে তাহাকেই মূল্য কহে ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। সুতরাং বিনিমেয়তা কিরূপে মূল্যের কারণ হইবে? দুষ্প্রাপ্যতা ও অভিলষণীয়তা থাকিলে সকল দ্রব্যই বিনিমেয় হইয়া উঠে। তবে কতকগুলি সাক্ষাৎসম্বন্ধে, আর কতকগুলি পরম্পরাসম্বন্ধে বিনিমেয়। স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিনিমেয়। আর পরিশ্রম স্বাস্থ্য প্রভৃতি পরম্পরা-

সম্বন্ধে বিনিমেয়। অর্থাৎ সুস্থশরীর না হইলে লোকে পরিশ্রম করিতে পারেনা, সুস্থশরীরে পরিশ্রম করিয়া যে দ্রব্য উৎপন্ন করা যায়, তাহাই সাক্ষাৎসম্বন্ধে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত বিনিময় করা যাইতে পারে। এই জন্য পণ্ডিতেরা পরিশ্রম স্বাস্থ্য প্রভৃতিকে ধনের মধ্যে গণনা করিয়াছেন।

আমাদের অভিলষণীয় তাবৎ দ্রব্য পাইতে হইলেই আমাদিগকে পরিশ্রম করিতে হয়। পরিশ্রমব্যতিরেকে কোন দ্রব্যই পাওয়া যায় না। যে দ্রব্যের অধিক মূল্য তাহা পাইতে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিশ্রম লাগিয়া থাকে। ইহাতেই অনেকে মনে করেন পরিশ্রমের জন্যই দ্রব্যের মূল্য জন্মে। কিন্তু এটী ভ্রম। অধিক পরিশ্রমপূর্ব্বক প্রস্তুত করিতে হয় বলিয়াই যে দ্রব্যের অধিক মূল্য হয়, এরূপ কখনই বলা যায় না। প্রস্তুত সামগ্রী অধিক মূল্যে বিক্রয় করিবার আশয়েই লোকে অধিক পরিশ্রম করিয়া থাকে। পরিশ্রমের বিভাগদ্বারা যে কত উপকার হয় তাহা পূর্ব্বে নির্ণীত হইয়াছে, শ্রমবিভাগের ফলে আলপিন নির্ম্মাণ করিবার কারখানায় এক ব্যক্তির সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ৫০০। ৬০০ আলপিন প্রস্তুত হইয়া থাকে। আবার যদি কোন ব্যক্তি কাহারও সাহায্য না লইয়া স্বয়ংই আলপিন গড়িতে থাকে, তাহা হইলে সে সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়াও কেবল ১০টী মাত্র আলপিন প্রস্তুত করিতে পারে। কারখানায় এক জনের সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ৫০০। ৬০০ আলপিন প্রস্তুত হয়, আর বিনাসাহায্যে পরিশ্রম করিলে এক জনের সমস্ত দিনের পরিশ্রমে কেবল ১০টী মাত্র আলপিন প্রস্তুত হইয়া থাকে। উভয় স্থলেই পরিশ্রম সমান, কিন্তু ৫০০ আলপিনের মূল্য কখন ১০টী আলপিনের সমান হয় না। প্রথম ব্যক্তির ৫০০ আলপিনের মূল্যে দ্বিতীয় ব্যক্তির ১০টী মাত্র আলপিন কখনই বিক্রীত হয় না। কিন্তু যদি পরিশ্রমই মূল্যের নিয়ামক হইত তাহা হইলে সমান পরিশ্রমে উৎপন্ন তাবৎ দ্রব্যেরই সমান মূল্য হইতে পারিত। আবার মনে কর এক ব্যক্তি দৈবাৎ একটী ঝিনুকের ভিতর একটী মুক্তা পাইল। সুতরাং এস্থলে উহার মুক্তা পাইতে কিছুই পরিশ্রম লাগিল না। যদি পরিশ্রমই মূল্যের কারণ হইত, তাহা হইলে

এস্থলে ঐ মুক্তাটীর কিছুই মূল্য হইত না, কিন্তু তাহা না হইয়া সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়াও যে মুক্তাটি পাওয়া যায়, আর যেটী দৈবাৎ পাওয়া গিয়া থাকে, উভয়ই সমান মূল্যে বিক্রীত হয়। অতএব প্রতিপন্ন হইল, পরিশ্রম দ্বারা দ্রব্যের মূল্য হয় না, কিন্তু দ্রব্যের মূল্য আছে বলিয়াই লোকে তজ্জন্য পরিশ্রম করিয়া থাকে।

দ্রব্যের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি দুই প্রকারে হইতে পারে। ১ম।—অধিকসর্ব্বরাহ প্রভৃতি কারণে কোন দ্রব্যের নিজের মূল্য কমিয়া যাইতে পারে। ২য়।—উহার সহিত বিনিময়ের দ্রব্যাদির মূল্য বাড়িয়া উঠিতে পারে। যদি কোন দ্রব্যের নিজের মূল্য কমিয়া যায়, তাহা হইলে উহার সহিত বিনিময়ের তাবৎ দ্রব্যই উহার বিনিময়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প পাওয়া যাইবে। কিন্তু যদি উহার নিজের মূল্য একরূপ থাকিয়া অন্যান্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হয় তাহা হইলে যে সকল দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হয়, উহার যাইবে। কেবল তৎসমুদয়ই পূর্ব্বাপেক্ষা অল্পপরিমাণে পাওয়া যাইবে। আর যে যে দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি নাই তৎসমুদায় সমভাবেই থাকিবে।

এইরূপ অল্প সর্ব্বরাহ প্রভৃতি কারণে কোন দ্রব্যের নিজের মূল্য বাড়িয়া উঠিতে পারে, অথবা উহার সহিত বিনিময়ের অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য কমিয়া যাইতে পারে। সুতরাং উহার মূল্য বাড়িয়া উঠে। যদি উহার নিজের মূল্য বাড়িয়া উঠে তাহা হইলে উহার পরিবর্ত্তে উহার সহিত বিনিময়ের তাবৎ দ্রব্যই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকপরিমাণে পাওয়া যায়, আর যদি উহার সহিত বিনিময়ের দ্রব্যাদির মূল্য কমিয়া উহার মূল্যবৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে যে কয়েকটী দ্রব্যের মূল্য কমিয়াছে, উহার পরিবর্ত্তে সেই সমুদায়ই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকপরিমাণে পাওয়া যাইবে, আর যাহাদের মূল্য কমে নাই তাহাদের সহিত উক্ত

দ্রব্যের সম্পর্ক সমভাবেই থাকিবে। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সকল দ্রব্যেরই মূল্য দ্বিবিধ, একটী স্বভাবসিদ্ধ ও একটী অন্যান্য দ্রব্যের সহিত তুলনা করাতেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু সাংসারিক কার্য্যে প্রথমটীর তাদৃশ আবশ্যকতা নাই।

মূল্য ও পণ এই উভয়ের পরস্পর কিরূপ প্রভেদ তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। পণ মূল্যের একপ্রকার বিশেষ মাত্র। কিন্তু এই পণ ধরিয়াই ক্রয় বিক্রয়, ধার কর্জ্জ, প্রভৃতি তাবৎ বিনিময়ক্রিয়াই সম্পাদিত হয়। মূল্য ধরিয়া প্রায় কোন কার্য্য হয়না। অতএব কি কি কারণে পণের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, কি কি কারণে একটী দ্রব্যের পণ অন্যান্য দ্রব্য অপেক্ষা অল্প বা অধিক হয়, তৎসমুদয় বিশেষরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক। এক্ষণে এই সকল বিষয় সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

পণ্যদ্রব্যের পণনির্দ্ধারণ করিতে হইলে সমুদয় দ্রব্যকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা উচিত। ১ম।—কতকগুলি দ্রব্য এরূপ আছে, যে তৎসমুদয় লইবার প্রয়োজন যতই বাড়ুক না কেন, তাহাদের সর্ব্বরাহ কোন উপায়েই বাড়ান যাইতে পারেনা। উহাদের সর্ব্বরাহ এককালে সীমাবদ্ধ। আকবর বাদসাহ তাঁহার সাম্রাজ্যকালে এক প্রকার মোহর প্রস্তুত করিয়া চালাইয়াছিলেন। এক্ষণে সকলেই ঐ মোহর পাইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু আকব্বরী মোহর এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। কারণ এখন আর আকব্বরী মোহর অধিকপরিমাণে সর্ব্বরাহ করিবার উপায় নাই। যত থান আকব্বরী মোহর বিদ্যমান আছে, লোকের লইবার ইচ্ছা যতই কেন প্রবল হউকনা, উহা আর বাড়াইবার যো নাই। কলিকাতার বড় বাজারে দোকান পাট করিবার নিমিত্ত স্থান পাওয়া দুর্ঘট। কারণ প্রয়োজন যতই বাড়ুক না কেন, বড় বাজারে যত স্থান আছে তাহা আর বাড়ান যাইতে পারেনা। সুতরাং এইরূপ দ্রব্যাদির পণ একটী স্বতন্ত্র নিয়মে

নির্দ্ধারিত হয়। অন্যান্য দ্রব্যে পণ যেরূপ নিয়মে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, এইরূপ দ্রব্যের পণ কখনই সেই রূপ নিয়মে নির্দ্ধারিত হইতে পারেনা। অনেকে বলিয়া থাকেন যে এরূপ স্থলেও প্রয়োজন বাড়িলেই দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হয়, ও প্রয়োজন কমিলেই মূল্য কমিয়া যায়। কিন্তু এটী ঠিক কথা নহে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে দুষ্প্রাপ্যতা ও ইষ্টসাধনতা এই দুইটী কারণের সমবায়েই দ্রব্যের মূল্য হইয়া থাকে। যে সকল দ্রব্য লোকের ব্যবহারে আইসে, দুষ্প্রাপ্যতার হ্রাসবৃদ্ধিনিবন্ধন তৎসমুদয়ের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। সুতরাং খরিদদার কোন দ্রব্য খরিদ করিবার সময়, উহা কিরূপ ব্যবহারে আসিবে তাহার উপর বড় মনোযোগ করেনা। কিন্তু কোন্ দ্রব্য কিরূপ দুষ্প্রাপ্য তাহা লইয়াই মূল্যনির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। উপরে যেরূপ দ্রব্যের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে এই নিয়মে তৎসমুদয়ের মূল্যনির্দ্ধারণ হইতে পারেনা! কারণ উহাদের দুষ্প্রাপ্যতা নিশ্চিত, উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধি ও নাই, সুতরাং গ্রাহকদিগের ইষ্টসাধনতার তারতম্য অনুসারেই ঐরূপ দ্রব্যের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। অর্থাৎ কোন একটী বিশেষ দ্রব্য যে ব্যক্তি যেরূপ ব্যবহারে আসিবে মনে করে, সে সেইরূপ পণে উহা লইয়া থাকে।

মনে কর এক খান আকবরী মোহরের তিন জন খরিদদার উপস্থিত। রাম, শ্যাম, ও হরি। হরি উহার জন্য ২২ টাকা দিতে পারে, উহার অধিক দিতে প্রস্তুত নহে। শ্যাম উহার নিমিত্ত ২৩ টাকা পর্য্যন্ত দিতে পারে। পরিশেষে রাম ৩০ টাকা পর্য্যন্ত দিয়া ঐ খানটী ক্রয় করিল। এস্থলে হরির মতে উহার ব্যবহারের মূল্য ২২ টাকা, শ্যামের মতে ২৩ টাকা। কিন্তু রামের মতে উহার ব্যবহারের মূল্য উভয় অপেক্ষাই অধিক অর্থাৎ ২৩ হইতে ৩০ টাকার মধ্যে। একণে প্রতিপন্ন হইতেছে যে এস্থলে মোহর খানটীর প্রকৃত মূল্য ২৩ হইতে ৩০ টাকার

মধ্যে। কারণ যদি উহার মূল্য ২২ টাকার অপেক্ষাও কমিয়া যায়, তাহা হইলে উহার সর্ব্বরাহ যেরূপ, তাহার অপেক্ষাও প্রয়োজন অধিক হইয়া পড়ে। অর্থাৎ এরূপ হইলে অন্যান্য অনেক লোকে উহা লইবার নিমিত্ত আগ্রহ করিতে পারে। অতএব বুঝা গেল এরূপ স্থলে মূল্য কমিলেই প্রয়োজন বাড়িয়া উঠে। আবার যদি এই মোহরের মূল্য ৩০ টাকা অর্থাৎ উর্দ্ধসংখ্যার অপেক্ষাও বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে উহা লইবার প্রয়োজন একবারেও যাইতে পারে, কারণ তাহা হইলে কেহই উহা লইতে ইচ্ছা করে না। অতএব এরূপ স্থলে মূল্য বৃদ্ধি হইলে প্রয়োজন কমিয়া যায়, বা একবারে নষ্ট হইয়া যায়। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে এরূপ স্থলে প্রয়োজন পণের উপর নির্ভর করে। সুতরাং এইরূপ দ্রব্যের পণ এপ্রকার হওয়া আবশ্যক যে উহাদের লইবার প্রয়োজন ও সর্ব্বরাহ সমান হয়, নতুবা ওরূপ দ্রব্য কখনই বিক্রয় হইতে পারে না।

২ য়।—অনেক দ্রব্য এরূপ আছে যে তাহাদিগের সর্ব্বরাহ যত ইচ্ছা বাড়ান যাইতে পারে। কিন্তু যদি তাহাদিগের সর্ব্বরাহ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাড়াইতে হয়, তাহা হইলে উহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূলধনও পরিশ্রম লাগিয়া থাকে, অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় করিলে উহাদের সর্ব্বরাহ পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়ান যাইতে পারে। অতএব এইরূপ দ্রব্যের প্রয়োজন যেরূপ বৃদ্ধি হয়, পণও সেইরূপে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, প্রয়োজন কমিলে আবার পণ কমিয়া যায়।

কৃষিজ ও খনিজ এই উভয়বিধ দ্রব্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত। চাষ করিয়া যাহা ফসল উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে খাজনা বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা হইতে চাষের খরচ, মূলধনের সুদ ও তত্ত্বাবধানশ্রমের পুরস্কার এই সমুদয় পোষাইয়া যায়। ইহার উপর অধিক থাকে ভালই, না থাকিলেও কৃষকের লোকসান নাই। এই সকল না পোষাইলেই কৃষকের ক্ষতি হয়,

সুতরাং এরূপ স্থলে কেহই চাষ করিতে চাহেনা। এইরূপ পোঁষাইলেই কৃষিকার্য্যে চলনসই লাভ হইল বলিতে হইবে।

ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যে কৃষিজ শস্যাদি দ্রব্যের এরূপ পণ হওয়া উচিত যে কৃষক গড়ে চলনসই লাভ পাইতে পারে। কোন দেশের লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইলেই তথায় কৃষিজ দ্রব্যাদিরও প্রয়োজন বাড়িয়া উঠে। সুতরাং কৃষকদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প উর্ব্বরা ভূমি আবাদ করিতে হয়, কাজেই চাষের ব্যয় অধিক হইতে থাকে। এরূপ স্থলে চাষদ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যাদির মূল্য বাড়াইয়াই কৃষকেরা ব্যয়-বাহুল্য পোষাইয়া লয়, নতুবা তাহাদের লোকসান হয়। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দেশের লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইলেই কৃষিজ দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এইরূপ হইলে, হয় যন্ত্রাদি ব্যবহার দ্বারা পরিশ্রমের লাঘব করিয়া চাষের ব্যয় কমাইতে হয়, নতুবা বিদেশ হইতে শস্যাদি আমদানী করিয়া উহার পণ কমাইতে হয়। চাষের খরচ বাড়িলে যেরূপ ফসলের মূল্যবৃদ্ধি হয় সেইরূপ চাষের খরচ একরূপ থাকিয়া খাজনা বাড়িলেই দ্রব্যাদির পণবৃদ্ধি হইয়া থাকে, কারণ এরূপ স্থলেও শস্যাদির মূল্যবৃদ্ধি না হইলে কৃষকের ক্ষতি হয়। মোট উৎপন্ন হইতে চাষের ব্যয় ও ভূমির খাজনা বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহাই কৃষকের লাভ হইত। খরচ সমান থাকিয়া খাজনা বাড়িয়া উঠিলে কৃষককে আপন লাভ হইতেই ঐ খাজনার বাড়তি জমিদারকে দিতে হয়, কাজেই শস্যাদির মূল্য না বাড়াইলে কৃষকের বিলক্ষণ লোকসান হইয়া থাকে। খাজনা বাড়িলে শস্যের পণ কমিতে পারে বটে, কিন্তু খাজনা কমিলে বা একবারে উঠিয়া গেলেও শস্যের পণ কমিবার কোন নিশ্চয় নাই। পূর্ব্বে যে অপকৃষ্ট ভূমির কথা বলা হইয়াছে, তাহার খাজনা নামমাত্র, কিন্তু তাহার উৎপন্ন হইতেও কৃষকের অবশ্যই চলনসই লাভ হইয়া থাকে, তাহা না হইলে কখনই ওরূপ ভূমির চাষ হইত না। মনে কর কয়েক বৎসরের জন্য ভূমির খাজনা একবারে উঠিয়া গেল, জমিদারেরা প্রজাদিগকে রেহাই দিলেন। এরূপ হইলে কি কৃষকেরা ঐরূপ অপকৃষ্ট ভূমির চাষ করা একবারে উঠাইয়া

দিতে পারে? কখনই নহে। কারণ লোকসংখ্যার বৃদ্ধিদ্বারা শস্যাদির প্রয়োজন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হওয়াতেই ওরূপ অপকৃষ্ট ভূমি আবাদ করিবার আবশ্যকতা হইয়াছিল। এক্ষণে খাজনা উঠিয়া যাওয়াতে কিছু সেই প্রয়োজনের লাঘব হইতে পারেনা। পূর্ব্বে যত ভূমির আবাদ করিতে হইত এক্ষণেও তাহাই করিতে হয়, অতএব চাষের খরচও পূর্ব্বমতই থাকে। তবে আর কি জন্য ফশলের পণ কমিবে? চাষের ব্যয় না কমিলে কখনই ফশলের দাম কমিতে পারে না। যদি খাজনা কমিলে বা একবারে উঠিয়া গেলে ফশলের মূল্য কমিয়া যায়, তাহা হইলে সকল কৃষককেই অপকৃষ্ট ভূমির আবাদ করা পরিত্যাগ করিতে হয়। নতুবা কৃষকদিগের বিলক্ষণ লোকসান হয়। কারণ এইরূপ ভূমি হইতে খাজনা দিয়াও যাহা লাভ থাকে, খাজনা না দিতে হইলেও অবিকল তাহাই লাভ থাকে। কিন্তু এরূপ ভূমির চাষ কখনই পরিত্যাগ করা যাইতে পারেনা। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, খাজনা উঠিয়া গেলে ফশলের মূল্য কিছুতেই কমিতে পারেনা। এক্ষণে স্থির হইল যে কৃষিজ দ্রব্যের মূল্য অবশ্যই এরূপ হওয়া উচিত যে কৃষক গড়ে চলনসই লাভ পাইতে পারে। এই নিমিত্তই প্রয়োজনবৃদ্ধি হইলে ব্যয়ের বাহুল্যপ্রযুক্ত ফশলের মূল্য বাড়াইতে হয়।

যেরূপ নিয়মনুসারে কৃষিজ দ্রব্যের পণ নির্দ্ধারিত হয়, খনিজ ও আকরিক দ্রব্যের পণও অবিকল সেইরূপ নিয়মানুসারেই নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই এবিষয়ের যাথার্থ্য স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে।

৩।—অনেকানেক দ্রব্য এরূপ আছে যে উৎপাদনব্যয় একরূপ রাখিয়াও তাহাদের সর্ব্বরাহ যত ইচ্ছা বাড়ান যাইতে পারে। অর্থাৎ উহাদের সর্ব্বরাহ বাড়াইতে হইলে উহার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনব্যয়ও বাড়িয়া উঠে না। তাবৎ শিল্পজাত দ্রব্যই এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

অনেকে মনে করেন যে শিল্পজাত ও কৃষিজ এই উভয় প্রকার দ্রব্যই

একরূপ। ইহাদের পরস্পর কিছুই প্রভেদ নাই। ইহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে যথার্থ কথাও বটে। তাবৎ শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যই হয় কৃষিজ, নয় খনিজ। যেরূপ ধান্য কৃষিকার্য্যদ্বারা উৎপন্ন হয়, সেইরূপ কাপড় ও কৃষিকার্য্য হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা যথার্থ বটে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। কৃষিজ ও খনিজ দ্রব্যের মূল্য মোটামালের মূল্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, কিন্তু শিল্পদ্রব্যের পক্ষে এরূপ নিয়ম নহে। শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য যে যে উপকরণে সংঘটিত হয় মোটামালের মূল্য তৎসমুদয়ের অতি সামান্য অল্পমাত্র অংশ। পাট ও তুলা হইতে কাপড় প্রস্তুত করিতে হইলে পাট ও তুলার উপর কত প্রক্রিয়া করিতে হয়। এই সকল প্রক্রিয়া সম্পান্ন করিতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী লোকের প্রয়োজন। ইহাদের সকলকেই বেতন দিতে হয়। আবার ঐ সকল প্রক্রিয়া সাধনজন্য মূলধন ব্যয় করিয়া নানাবিধ যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে হয়। এই সকল ব্যয় পোষাইয়া লইতে হয় বলিয়াই মোটামাল ও শিল্পজাত দ্রব্য ইহাদের পণের পরস্পর এত বিভিন্নতা হইয়া থাকে। ফলতঃ শিল্পদ্বারা কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে মোটামালের উপর এত প্রক্রিয়া ও ব্যয় করিতে হয়, যে গণনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে মোটামালের মূল্য শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যের অতি সামান্যমাত্র অংশ হইয়া উঠে। অতএব বোধ হইতেছে যে মোটামালের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে উহা হইতে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের মূল্যের কখনই হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারেনা। মোটামালের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যাইলে তদুৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য না কমিতেও পারে। কারণ অন্যান্য ব্যয় সমান থাকাতে উক্তরূপ ব্যয়লাঘবের দ্বারা কিছুমাত্র উপকার হয় না। আবার যদি অধিক পরিমাণে কোন শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে মোটামালের ও আবশ্যকতা হয়। অধিক পরিমাণে কৃষিজ বা খনিজ দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইলেই পূর্ব্বোক্তনিয়ম অনুসারে উহাদিগের মূল্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু অন্যান্য নানাবিধ ব্যয় সমান থাকাতে উক্ত বৃদ্ধিদ্বারা শিল্পদ্রব্যের মূল্যের কিছুমাত্র বৃদ্ধি হইতে পারেনা। বরং

বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতিপন্ন হইবে যে অধিক পরিমাণে কোন শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করিতে হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা ব্যয়লাঘব হইবারই সম্ভাবনা। কারণ অধিক পরিমাণে কোন শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে শ্রমসমবায় ও যন্ত্রাদি ব্যবহার দ্বারা শ্রমের কার্য্যকারিতা বাড়াইতে হয়, শ্রমের কার্য্যকারিতা বাড়িয়া উঠিলেই আবার পূর্ব্বাপেক্ষা অল্পপরিশ্রমে অপেক্ষাকৃত অধিক দ্রব্য উৎপন্ন হইতে থাকে, সুতরাং গড়ে উৎপাদনের ব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যাইবারই কথা, বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নহে। কখন কখন শিল্পদ্রব্যের অধিক প্রয়োজন হওয়াতে তত্তৎকার্য্যের শ্রমিকদিগের বেতনবৃদ্ধি হইয়া থাকে, সুতরাং এরূপ হইলে লোকসান পোষাইবার নিমিত্ত ব্যবসায়ীদিগকে দ্রব্যাদির মূল্য বাড়াইতে হয়। কিন্তু এরূপ মুল্যবৃদ্ধি বহুকাল স্থায়ী হইতে পারেনা। লাভের পরিচ্ছেদে কথিত হইয়াছে যে, সকল ব্যবসায়েরই এক একটী লাভের হার নির্দ্দিষ্ট আছে। কোন কারণে লাভ বাড়িয়া উঠিলে আবার কমিয়া গিয়া সেই নির্দ্দিষ্ট হারে পরিণত হয়। এইরূপ কমিয়া যাইলেও আবার বাড়িয়া উঠিয়া নির্দ্দিষ্ট হারে উপস্থিত হয়, অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে এইরূপে শ্রমিকদিগের বেতনবৃদ্ধিদ্বারা যে দ্রব্যাদির মুল্যবৃদ্ধি হয় তাহা কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারেনা। কোন ব্যবসায়ে অধিক লাভ দেখিলে ব্যবসায়ীরা উহাতে অধিক মুলধন ফেলিতে থাকে, সুতরাং মুলধনের প্রতিযোগিতাদ্বারা সেই বর্দ্ধিত লাভ কিছুদিনের মধ্যেই আবার কমিয়া যায়। ইহাদ্বারা স্থির হইতেছে যে নিম্নলিখিত দুইটী নিয়ম অনুসারে তাবৎ শিল্পদ্রব্যেরই মুল্যের নির্দ্ধারণ হইয়া থাকে।

১ম। শিল্প দ্রব্যের পণ অবশ্যই এরূপ হইবে, যে গড়ে উহাদ্বারা ব্যবসায়ের উৎপাদন ব্যয় পোষাইয়া যায়। উৎপাদনব্যয় বলিতে তিনটী পদার্থ বুঝিতে হইবে। ১ম মোটামালের পণ, ২য় পরিশ্রমের বেতন, ৩য় ব্যবসায়ের নির্দ্দিষ্ট লাভ অর্থাৎ ব্যবসায়ীর তত্ত্বাবধানশ্রমের বেতন, মূলধনের সুদ, ও সম্ভাবিত ক্ষতির পূরণ।

২য়। যদি দ্রব্যের পণ বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে উহার প্রয়োজন কমিয়া যায়। আর যদি পণ কমিয়া যায় তাহা হইলে আবার প্রয়োজন বাড়িতে পারে। অতএব এই সকল দ্রব্যের পণ এরূপ হওয়া উচিতযে সর্ব্বরাহ ও প্রয়োজন সমান হইতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিনিময়—অর্থ, মুদ্রা ও অর্থের মূল্য।

অর্থ কাহাকে বলে ; কি উদ্দেশে ও কি প্রকারে অর্থের প্রচার প্রথম আরম্ভ হয়, অর্থব্যবহারদ্বারা সমাজের কিরূপ উপকার হইয়াছে, অর্থের ব্যবহার প্রচলিত না থাকিলে সমাজের কিরূপ দুর্দ্দশা হইত, পূর্ব্বপরিচ্ছেদে এই সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অর্থের ব্যবহার কিরূপ, কিরূপ দ্রব্য অর্থস্বরূপে ব্যবহৃত হইলে অনায়াসেই বিনিময়ক্রিয়া সাধিত হইতে পারে, ঐ সকল দ্রব্যের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করা এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে অর্থই বিনিময়ের সর্ব্বসাধারণ মধ্যবর্ত্তী। অর্থাৎ অর্থের পরিবর্ত্তে সকল দ্রব্যই পাওয়া যাইতে পারে। যখন অর্থের ব্যবহার প্রচলিত ছিলনা, তৎকালে বিনিময়ক্রিয়ার যৎপরোনাস্তি অসুবিধা ছিল। এই সকল অসুবিধা নিবারণের উদ্দেশে সকল সমাজের অধিবাসীরাই একমত হইয়া কোন একটী বিশেষ দ্রব্য বিনিময়ের সর্ব্ব-

সাধারণ মধ্যবর্ত্তিস্বরূপ নির্দ্ধারিত করে। এইরূপ করাতে বিনিময়কার্য্য সুখসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। কোন্ দ্রব্য অর্থস্বরূপে ব্যবহার করিতে হইবে তাহার কিছুই নিশ্চয় নাই। যে প্রকারের দ্রব্য হউক না কেন, যদি উহা সাধারণের ঐকমত্যে বিনিময়ের সর্ব্বসাধারণ মধ্যবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, তাহা হইলে উহাদ্বারা অর্থব্যবহারের সমুদয় প্রয়োজনই সাধিত হইতে পারে। যদি সোণা বা রূপার মুদ্রা অর্থের স্বরূপ ব্যবহার না করিয়া লোহা বা অন্যান্য যে কোন দ্রব্য ঐরূপে ব্যবহৃত হইত, তাহা হইলে উহা হইতেই অর্থের প্রয়োজন সাধিত হইতে পারিত সন্দেহ নাই! কিন্তু কোন্ দ্রব্য অর্থরূপে ব্যবহার করিলে বিনিময়কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয়, তাহা নির্ণয় করা যায়। যে সমাজে যে দ্রব্য ঐরূপে নির্ণীত হয়, সেই সমাজে সেই দ্রব্যদ্বারাই অর্থের সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে ও ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি তাবৎ সভ্য সমাজেই সোণা রূপা ও তামা এই তিন প্রকার ধাতুর মুদ্রাই অর্থরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অন্যান্য দ্রব্য ব্যবহার না করিয়া এই কয়েকটী বহুমূল্য ধাতু অর্থরূপে ব্যবহার করিবার কি কি সুবিধা তাহা পরে বর্ণিত হইবেক। চীনদেশের লোকেরা কতকগুলি চা একত্র করিয়া জমাট করে, পরে উহা পিটিয়া ঘুঁটি প্রস্তুত করিয়া থাকে, ঐ ঘুঁটিই তাহারা অর্থরূপে ব্যবহার করে। আফ্রিকার কোন কোন প্রদেশের অধিবাসীরা এইরূপে কড়ি ব্যবহার করিয়া থাকে। পূর্ব্বে আমাদের দেশেও কড়িই ব্যবহৃত হইত, এক্ষণে কড়ির ব্যবহার অনেক কমিয়া গিয়াছে। ফলতঃ যে প্রকার দ্রব্যই হউক না কেন যাহা সাধারণের ঐকমত্যে অর্থস্বরূপে নির্দ্ধারিত হয়, তাহা দ্বারাই বিনিময় কার্য্য চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু সোণা

রূপা তামা এই তিনটী ধাতুর ব্যবহার দ্বারাই বিনিময় কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয়। এই জন্যই সকল সভ্য সমাজে উহাই অর্থরূপে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য দ্রব্যের পরিবর্ত্তে সোণারূপা প্রভৃতি বহুমূল্য ধাতু অর্থরূপে ব্যবহার করিবার কি সুবিধা, অর্থব্যবহারের কি কি প্রয়োজন, তাহা পার্য্যালোচনা করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে। অর্থের দ্বারা দুইটী কার্য্য সম্পাদিত হয়। ১ ম অর্থই মূল্যের নিয়ামক। ২ য় অর্থ ই বিনিময়ের সর্ব্বসাধারণ মধ্যবর্ত্তী। দ্রব্যের মূল্যনির্দ্ধারণ অর্থ দ্বারাই হইয়া থাকে। কাহার কত ধন আছে ইহা নির্ণয় করিতে হইলেও অর্থব্যবহারের প্রয়োজন। কারণ তাহা না হইলে কাহার কত ধন আছে নির্ণয় করা কঠিন হইত। অমুকের এত টাকা আছে বলিলে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি তাহার কত ধন আছে, কিন্তু অর্থের ব্যবহার প্রচলিত না থাকিলে কাহার কত ধন আছে নির্ণয় করিতে হইলে তাহার অধিকৃত সমুদয় দ্রব্যের তালিকা করিতে হইত। নতুবা কিছুতেই ধনের পরিমাণ নির্ণীত হইতে পারিত না। অতএব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে দ্রব্যের মূল্যনির্দ্ধারণ করিতে হইলে এমত একটী পদার্থ বিনিময়ের মধ্যবর্ত্তী স্থির করিয়া রাখিতে হয়, যে উহার পরিবর্ত্তে তাবৎ দ্রব্যই পাওয়া যাইতে পারে ও উহার সহিত তুলনা করিয়াই তাবৎ দ্রব্যের মূল্যনির্দ্ধারিত হয়। এরূপ না করিলে কোনরূপেই দ্রব্যের মূল্যনির্দ্ধারণ হইতে পারে না। এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে কিরূপ দ্রব্য মধ্যবর্ত্তিস্বরূপ অবলম্বন করিলে ঐ দুইটী কার্য্য সহজে ও চিরস্থায়িরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। দ্রব্যের কি কি গুণ থাকিলে উহাকে অর্থ স্বরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে ইহা নির্ণীত হইলেই কোন্ দ্রব্য অর্থ-রূপে ব্যবহার করা উচিত তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবেক।

১ ম যে দ্রব্যকে বিনিময়ের সর্ব্বসাধারণ মধ্যবর্ত্তিস্বরূপে ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা সর্ব্বদাই অভিন্ন ও একরূপ থাকা আবশ্যক। নতুবা বিনিময়কার্য্যের বিলক্ষণ অসুবিধা হয়, আর দ্রব্যের মূল্যনির্দ্ধারণ ও দুর্ঘট হইয়া উঠে।

যদি এক বৎসর ১ ভরি রূপায় এক টাকা প্রস্তুত হয়, পর বৎসর বার আনা রূপায় টাকা হয়, আবার পর বৎসর চৌদ্দ আনা রূপায় হয়, তাহা হইলে দ্রব্যের মূল্যনির্দ্ধারণ করা সহজে সম্পন্ন হইতে পারেনা। অতএব যেমন দূরত্ব ও ওজনের হিসাব চিরকাল সমান থাকা উচিত সেইরূপ অর্থের পরিমাণও চিরকাল সমান রাখা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে তামা ও রূপাই সচরাচর অর্থরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সোণার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অল্প। ১ ভরি রূপায় একটী টাকা হয়। এক ভরি সোণায় একটী মোহর হয়। একটী মোহরের মূল্য ১৬ বা ১৭ টাকা অর্থাৎ সোণা অদ্যাপি অর্থরূপে বিশেষ প্রচারিত হয় নাই, সুতরাং সোণার দর অনুসারে স্বর্ণমুদ্রার ও দর হইয়া থাকে। আদ ভরি তামায় ১টী পয়সা হয়, ৪ পয়সার এক আনা, ৪ আনায় এক সিকি, ৪ সিকিতে এক টাকা, এইরূপে রূপা ও তামার ওজন ও মূল্য একরূপ স্থির রাখিয়া টাকা ব্যবহার চলিতেছে।

কিন্তু যদি এই নিয়মের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয়, তাহা হইলেই বিনিময় ও মূল্য নির্দ্ধারণ উভয়েরই অসুবিধা হইয়া উঠে। কিন্তু সোণারূপা প্রভৃতি মহামূল্য ধাতু ব্যতিরেকে অন্য দ্রব্য অর্থ রূপে ব্যবহার করিলে আর এই সুবিধা থাকিতে পারে না। কারণ ধান গম প্রভৃতি তাবৎ কৃষিজ ও কাপড় চোপড় প্রভৃতি তাবৎ শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যই বৎসর বৎসর ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন বৎসর কম হয়, আবার কোন বৎসর অধিক হয়। যদি এই সকল দ্রব্য অর্থরূপে ব্যবহার হইত তাহা হইলে উহাদের এক পরিমাণ কখনই অর্থ রূপে ব্যবহৃত হইতে পারিতনা। কিন্তু সোণারূপা প্রভৃতি

ধাতুর উৎপত্তি এক রূপ নির্দ্ধারিত, অতএব উহাদের এক রূপ পরিমাণ সর্ব্বদাই অর্থ রূপে বজায় রাখা যায়। আবার যে দ্রব্য অর্থ রূপে ব্যবহার করিতে হয়, তাহার মূল্যও একরূপ থাকা উচিত। তাহা না হইলে কার্য্যের বড়ই অসুবিধা হয়। আবার যে দ্রব্যকে অর্থ স্বরূপে ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার মূল্য যতদূর সম্ভব নির্দ্ধারিত থাকা আবশ্যক। কারণ এরূপ না হইলে অর্থের একরূপতা থাকিতে পারে না। বার বার যে দ্রব্যের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হয়, এরূপ দ্রব্য অর্থরূপে ব্যবহার করিতে হইলে মূল্য নির্দ্ধারণ ও বিনিময় উভয়েরই বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটে। এই জন্যই ধান গম প্রভৃতি কৃষিজ দ্রব্যাদি ব্যবহার না করিয়া সোণা রূপা প্রভৃতি বহুমূল্য ধাতু ব্যবহার করা উচিত। কারণ সোণা রূপা ইহাদের মূল্য একরূপ নির্দ্ধারিত, অল্প কালের মধ্যে প্রায়ই পরিবর্ত্তিত হয়না। কিন্তু কৃষিজ দ্রব্যাদির মূল্য দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইতেছে। অতএব সোণারূপা ব্যবহার না করিয়া কৃষিজ দ্রব্যাদি অর্থ রূপে ব্যবহার করিলে উহাদের মূল্যের পরিবর্ত্তের সঙ্গে সঙ্গে অর্থেরও পরিবর্ত্ত হইত। অর্থ দিন দিন নূতন নূতন হইত, ইহার একরূপতা কখনই থাকিতে পারিত না। উপরে যে কয়েকটী গুণের বিষয় উল্লিখিত হইল অর্থরূপে ব্যবহার্য্য দ্রব্যের সেই সেই গুণ না থাকিলে দ্রব্যের মূল্যনির্দ্ধারণ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। তবে বিনিময় কার্য্য কথঞ্চিৎ চলিলেও চলিতে পারে। অর্থ রূপে ব্যবহার্য্য দ্রব্যের যে সমস্ত গুণ না থাকিলে উহা দ্বারা বিনিময় কার্য্য কখনই চলিতে পারেনা নিম্নে তৎসমুদয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে। ১ ম।—যে যে দ্রব্য অর্থ রূপে ব্যবহার করিতে হইবেক, তৎসমুদয়ের মূল্য থাকার প্রয়োজন। যে দ্রব্যের কিছুমাত্র মূল্য নাই, তাহা কখনই অর্থ স্বরূপে ব্যব-

হত হইতে পারেনা। চেষ্টা করিলেও উহা বিফল হইয়া যায়। অতএব যে দ্রব্যের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাহাই অর্থস্বরূপে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এক ভরি রূপায় একটী টাকা হয়, একটী টাকার পরিবর্ত্তে যে দ্রব্য পাওয়া যায়, এক ভরি রূপাতেও তাহাই পাওয়া গিয়া থাকে, অতএব সোণা বা রূপার মূল্য আছে স্পষ্টই বোধ হইতেছে। আমাদের দেশে মুসলমানদিগের সাম্রাজ্যকালে এক ভরি খাঁটি রূপায় একটী টাকা হইত ও এক ভরি খাঁটি সোণায় একটী মোহর হইত, এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট সোণারূপার সঙ্গে কিছু কিছু খাদ মিশাইয়া লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং এক্ষণকার টাকা বা মোহর সাবেক টাকা বা মোহরের অপেক্ষা অল্পমূল্য ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ১৬ বা ১৭ টাকায় এক মোহর হয়, কিন্তু এখনকার টাকা দিয়া সাবেক মোহর ক্রয় করিতে হইলে ১৬। ১৭ টাকায় এক মোহর পাওয়া যায় না, উহা অপেক্ষা কিছু অধিক দিতে হয়। যদি এরূপ নিয়ম হয়, যে তামার আধুলি ও রূপার আধুলি এক মূল্য হইবে তাহা হইলে এরূপ নিয়ম কখনই চলিতে পারেনা। কারণ তামার মূল্য সোণারূপা হইতে অনেক কম, সুতরাং এরূপ হইলেও লোকে কখনই এক ভরি রূপা বা সোণার পরিবর্ত্তে যাহা দিতে পারে, এক ভরি তামার পরিবর্ত্তে কখনই তাহা দিবেনা। অন্যান্য তাবৎ সামগ্রী অপেক্ষাই সোণা রূপার মূল্য অধিক, এই জন্যই অন্যান্য দ্রব্য ব্যবহার না করিয়া সোণা রূপাই অর্থরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্যাঙ্কনোট প্রভৃতি কাগজ মুদ্রার কিছুমাত্র মূল্য নাই। তবে উহাদ্বারা অর্থের কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে? ইহার কারণ আছে। সোণা বা রূপার সহিত তুলনায় কাগজের কিছুমাত্র মূল্য

নাই বটে, কিন্তু মূল্য ধরিয়া কাগজমুদ্রা অর্থরূপে ব্যবহৃত হয় না। কাগজমুদ্রা অর্থপ্রদানের অঙ্গীকারমাত্র, যে অঙ্গীকার করে ঐ কাগজ তাহার নিকট দিলেই সে টাকা দেয়, এই জন্যই কাগজমুদ্রাদ্বারা অর্থের কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। যদি ঐ অঙ্গীকারের প্রতি লোকের কিছুমাত্র সন্দেহ হয়, তাহা হইলে কেহ উহা লইতে চাহেনা। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট কাগজমুদ্রার অঙ্গীকার পূরণ করিতে পারিবেন কিনা লোকের মনে এরূপ সন্দেহ জন্মে, ফলতঃ এই জন্যই তৎকালে কোম্পানির কাগজের দর অতিশয় কমিয়া যায়। বহনসৌকর্য্যই কাগজ মুদ্রার সর্ব্বপ্রধান সুবিধা। আবার যে যে দ্রব্য অর্থ স্বরূপে ব্যবহার করিতে হইবে, তৎসমুদয় এরূপ হওয়া উচিত যে অল্প পরিমাণে ও অল্প আকারে অধিক মূল্য ধারণ করিতে পারে, ও যত ইচ্ছা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইতে পারে। এরূপ না হইলে বিনিময়কার্য্যের সুবিধা হয় না। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে সোণারূপা প্রভৃতি বহুমূল্য ধাতু ব্যতিরেকে অন্য কোন দ্রব্যেরই এরূপ গুণ থাকিতে পারে না। হীরা প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তর যদিও অল্প আকারে অধিক মূল্য ধারণ করিতে পারে, কিন্তু ইহাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে বিভাগ করার সুবিধা নাই, ইহার উপর মুদ্রা বসিতে পারে না, আর ইহাদের মূল্যের ও একরূপতা নাই, কারণ নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন মূল্যের হীরা দেখা যায়, কিন্তু সোণারূপার মূল্য প্রায়ই একরূপ। অতএব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইল, যে যে সকল দ্রব্য অর্থরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে তন্মধ্যে সোণা রূপাই সর্ব্বাংশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ধাতুমুদ্রা ভগ্ন হয় না, শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, নষ্ট না

হইয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইতে পারে, অল্পাকারে অধিক মূল্য বহন করিতে পারে, এবং এক আকার সমুদয় খণ্ডই তুল্যমূল্য হয়। সোণা রূপা ভিন্ন কোন দ্রব্যেরই এই সকল গুণ নাই সুতরাং সোণারূপাই প্রায় সকল দেশেই অর্থ-রূপে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ভিন্ন তামাও অর্থরূপে ব্যবহৃত হয়, অল্প দেনা পরিশোধ করিতে হইলে তাম্রমুদ্রার প্রয়োজন হয়। কারণ সোণা বা রূপা নিতান্ত ক্ষুদ্র আকারে পরিণত করিবার সুবিধা নাই। এক পয়সা মূল্যের সোণা বা রূপা মুদ্রার আকারে পরিণত করিলে নিতান্ত ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে, সুতরাং ইহা দ্বারা কার্য্যের তাদৃশ সুবিধা হয় না। এই জন্যই অল্প দেনা পরিশোধ করিবার নিমিত্ত তাম্রমুদ্রার আবশ্যকতা। আবার অধিক দেনা পরিশোধ করিতে হইলে সোণা রূপার মুদ্রা ব্যবহার করাই সুবিধা। একটী গরুর দাম পয়সায় দিতে হইলে ভারী বোঝা বহন করিতে হয়, কিন্তু এক জন স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রায় ১০টী গরুর মূল্য অনায়াসে বহন করিতে পারে।

সকল দেশে এক ধাতু অর্থরূপে ব্যবহৃত হয় না। ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে সোণাই অর্থরূপে ব্যবহৃত; ইংলণ্ডে রূপা ও তামার মুদ্রা ও প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু উহা সোণার সহকারী মাত্র। ইংলণ্ডে যত ইচ্ছা তত দেনা রূপা বা তামার মুদ্রায় দিবার নিয়ম নাই। পাঁচ সিলিং অর্থাৎ ২॥০ টাকা পর্য্যন্ত তামার মুদ্রা দিতে পারা যায়, আবার ৪০ শিলিং অর্থাৎ ২০ টাকা পর্য্যন্ত রূপার মুদ্রায় দেওয়া চলে। ইহা অপেক্ষা অধিক দিতে হইলেই সোণার মুদ্রার প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে রূপা ও তামা উভয়বিধ মুদ্রাই অর্থরূপে প্রচলিত, তাহার ব্যবহার রূপার সহকারী মাত্র নহে, কারণ আমাদের দেশে যত ইচ্ছা দেনা হউক না কেন, পয়সার দিবার নিষেধ নাই, তবে অধিক পয়সা দিতে হইলে, কিছু বাঁটা দিতে হয়। আমাদের দেশে সোণার মুদ্রা অদ্যাবধি অর্থরূপে প্রচলিত হয় নাই।

সোণা রূপা তামা প্রভৃতি ধাতু অর্থরূপে ব্যবহার কার উচিত, ইহা এক্ষণে স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইলে। কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট আকার বা পরিমাণে উহার মূল্য নির্দ্ধারণ না করিয়া অমনি ব্যবহার করিলে বিনিময় কার্য্যের অসুবিধা হয়। অতএব একটি নির্দ্দিষ্ট আকার ও পরিমাণ রৌপ্য তাম্র বা স্বর্ণ খণ্ডের এই নির্দ্দিষ্ট মূল্য, ইহা আইন দ্বারা নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক। একটী নির্দ্দিষ্ট হইলে উহার সহিত তুলনায় অপরাপর গুলিরও মূল্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে। এই জন্যই সোণা রূপা ও তামার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাকতি করিয়া উহার উপর উহার মূল্য ও রাজার নাম মুদ্রিত করা হয়, ফলতঃ এই জন্যই ইহাদিগকে মুদ্রা কহা যায়। যে কারখানায় মুদ্রা নির্ম্মিত হইয়া থাকে তাহার নাম টাকশাল। ইহা দ্বারা একপ বোধ হইতে পারে যে টাকা প্রস্তুত করা বা উহার মূল্য নির্দ্ধারণ করা গবর্ণমেণ্টেরই কার্য্য.আর কাহারও উহাতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। কিন্তু একপ মনে করা ভ্রম। অন্য লোকে প্রস্তুত মুদ্রা করিলে যে কার্য্য চলিতে পারে না একপ কখনই বলা যায় না; তবে গবর্ণমেণ্ট টাকার সহিত কিছু কিছু নির্দ্দিষ্ট খাদ দিয়া লাভ করিবার প্রত্যাশায় উক্ত কার্য্য আপন হস্তে রাখিয়া থাকেন। যে সে কেহ মুদ্রা নির্ম্মাণ করিতে পারিলে ইচ্ছামত খাদ মিশাইয়া গ্রাহকদিগকে ঠকাইতে পারে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের হাতে টাকা প্রস্তুত করিবার ভার থাকাতে ওরূপ হইবার সম্ভাবনা কিছুমাত্র নাই। এই দুই কারণেই রাজা বা গবর্ণমেণ্টের হাতে টাকা চালাইবার ভার অর্পিত থাকা উচিত। মুদ্রার মূল্য নির্দ্ধারণ করাও গবর্ণমেণ্টের কার্য্য নহে। যদি কোন গবর্ণমেণ্ট অন্যায়রূপে মুদ্রার মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া দেন তাহা হইলে কেহই উক্ত মুদ্রা গ্রহণ করে না। মুদ্রার আকারে যে দ্রব্যের যে মূল্য তাহা প্রচার করাই গবর্ণমেণ্টের কার্য্য।

অর্থই সমুদায় দ্রব্যের মূল্যনির্দ্ধারণ করিবার একমাত্র উপায়, কারণ অর্থের সহিত তুলনা করিয়াই তাবৎ দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ হইয়া থাকে। কিন্তু অর্থের মূল্য কিরূপে নির্দ্ধারিত হইতে পারে। অর্থের কখন কি মূল্য হয় তাহা কিরূপে বুঝা যাইতে পারে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে সুদের চলিত হারই অর্থের মূল্যের নিয়ামক। অর্থাৎ যখন গবর্ণমেণ্টের সুদ বৃদ্ধি হয়, তখন অর্থেরও মূল্যবৃদ্ধি হয়, আবার গবর্ণমেণ্টের সুদ কমিলেই অর্থের মূল্য ও কমিয়া যায়। কিন্তু এরূপ বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। অর্থের পরিবর্ত্তে অন্যান্য দ্রব্য যে পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহার দ্বারাই অর্থের মূল্য নির্দ্ধারণ হইয়া থাকে। যখন অন্যান্য দ্রব্যের পণ বৃদ্ধি হয়, তখনই অর্থের মূল্য কমিয়া যায়। আবার যখন অন্যান্য দ্রব্যের পণ কমিয়া যায় তখনই অর্থের মূল্য বাড়িয়া উঠে। ফলতঃ অর্থের যে শক্তি থাকাতে উহার বিনিময়ে অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে, তাহাকেই অর্থের মূল্য কহে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিনিময়—বাণিজ্য।

ক্রয় বিক্রয় বা অন্যপ্রকার দ্রব্য বিনিময় ব্যবসায়কে বাণিজ্য কহে। বাণিজ্য বিনিময় ক্রিয়ার ফলস্বরূপ। বিনিময় ব্যবহার প্রচলিত না হইলে কোন প্রকারেই বাণিজ্যের উদ্ভব হইতে পারিত না। বাণিজ্য প্রচলিত না হইলে পৃথিবীর এত-দূর শ্রীবৃদ্ধি কখনই হইত না। অভাবনিবারণই বাণিজ্যের উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তির যে দ্রব্য আছে, সে তাহার পরিবর্ত্তে অন্যের নিকট অন্যান্য আবশ্যকসামগ্রী লইতে পারে। যে দেশে যে দ্রব্যের অভাব আছে, সেই দেশের অধিবাসীরা স্বদেশসুলভ অন্যান্য দ্রব্যের বিনিময়ে দেশান্তর হইতে সেই সেই দ্রব্য আনয়ন করিতে পারে। ফলতঃ এইরূপে অভাব-

নিরাকরণার্থই পৃথিবীর সকল প্রদেশেই বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়। পরে অর্থের ব্যবহার প্রচলিত হওয়াতে বাণিজ্যের সুবিধা হয়। বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতেই আবার দেশের উন্নতি হইয়া থাকে। বাণিজ্যই দেশের উন্নতিসাধনের একমাত্র উপায়। বাণিজ্য প্রচলিত না হইলে সকল দেশকেই আদিমকালের অসভ্যতাতে কালযাপন করিতে হইত। কোন দেশই পার্থিব সুখের স্বাদগ্রহ করিতে সমর্থ হইত না। বাণিজ্য দ্বারা যে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল সাধিত হইয়া থাকে, ইহা সপ্রমাণ করা অতিশয় সহজ। ইংলণ্ড প্রভৃতি বাণিজ্য ব্যবসায়ী দেশসমূহের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অনায়াসেই এ বিষয়ের যথার্থ্য বুঝিতে পারা যাইবে।

ইংলণ্ডদেশ প্রাচীনকালে অতিশয় অসভ্য ছিল। তথাকার অধিবাসীরা পশুচর্ম্ম পরিধান করিত। যদৃচ্ছালব্ধ ফলমূল ও পশুমাংস আহার করিয়া জীবনধারণ করিত। মৃত্তিকায় গহ্বর নির্ম্মাণ করিয়া ঐ গহ্বরে বা পর্ণকুটীরে বাস করিত। কালক্রমে ইংলণ্ডের লোকেরা বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করে। বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সহকারে ইংলণ্ডের অবস্থার উন্নতি হইতে থাকে। এক্ষণে ইংলণ্ড পৃথিবীর মধ্যে যাবতীয় সভ্যসমাজের শিরোমণি স্বরূপ হইয়াছে। পৃথিবীর সকল স্থানেই ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজত্ব। কেবল বাণিজ্যের প্রভাবেই ইংলণ্ড এইরূপ উন্নতি অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান সাম্রাজ্য। এই ভারতবর্ষও কেবল বাণিজ্যের ফলেই ইংলণ্ডের হস্তগত হইয়াছে। ইংলণ্ডীয়েরা প্রথম বাণিজ্যসূত্রেই ভারতবর্ষে আগমন করেন। পরে ক্রমশঃ সমুদয় ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া ইহার অধীশ্বর হইয়াছেন। যদি বাণিজ্যের প্রথা প্রচলিত না থাকিত তাহা হইলে ইংলণ্ড ভারতবর্ষের নাম পর্য্যন্ত অবগত হইতেন কিনা সন্দেহ। বাণিজ্য হইতে যে পৃথিবীর কত মহোপকার সাধিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। অধিক কি, বাষ্পীয় শকট বাষ্পীয় পোত, তাড়িত বার্ত্তাবহ প্রভৃতি যাবতীয় কল্যাণকর ব্যাপার

সমুদায়ই সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধে বাণিজ্যের একমাত্র ফল, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কালে সভ্যতায় পৃথিবীর তাবৎ দেশ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। ভারতবর্ষের সভ্যতা পরম্পর বিভাগ করিয়া লইয়াই রোম গ্রীস প্রভৃতি যাবতীয় প্রাচীন সমাজ ও ইংলণ্ড প্রভৃতি নব্য সমাজ সকল সভ্যতার সোপানে আরূঢ় হয়েন। আমাদের সেই প্রাচীন সভ্যতাও কেবল বাণিজ্যের ফলে হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয়েরা তৎকালে স্থলপথে ও জলপথে মিসর, গ্রীস, রোম, ইংলণ্ড প্রভৃতি অনেকানেক দেশের সহিত বাণিজ্য করিতেন এবং ঐ সকল দেশীয়েরাও ভারতবর্ষের নিকট সভ্যতার শিক্ষা পাইতেন। ফলতঃ ভারতের তদানীন্তন সভ্যতা কেবল বাণিজ্যের ফলস্বরূপ ছিল, তাহাতে আর সংশয় কি? যত দিন ভারতবর্ষে বাণিজ্য প্রথা প্রচলিত ছিল ততদিন ভারত স্বাধীন ছিলেন, ও ইহার বিদ্যাচর্চা শিল্পনৈপুণ্য প্রভৃতি তাবৎ বিষয়ই দেশ বিদেশে বিখ্যাত ছিল। কিন্তু কালক্রমে ভারতবর্ষীয়েরা বাণিজ্য ব্যবসায় ত্যাগ করে, তৎপরে মুসলমানেরা ভারত রাজ্য অধিকার করিয়া ইহার প্রাচীন সভ্যতা একবারে বিলুপ্ত করিয়া দেয়। তখন ভারতবর্ষীয়দিগকে অশেষবিধ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয় ও ভারতের সুখসূর্য্য একবারে অস্তমিত হইয়া যায়। কালক্রমে আবার সৌভাগ্যবশতঃ আমরা ইংরাজদিগের অধীন হইয়াছি। ইংলণ্ডের সভ্যতা আমাদিগকে উন্নত করিয়া তুলিতেছে, বোধ হয় আবার কালক্রমে আমরা বাণিজ্য ব্যবসায়ের উন্নতিসাধন করিয়া আমাদের প্রাচীন সভ্যতা পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিব। আর ইংলণ্ডও এরূপ অবস্থা হইলে আমাদিগকে পুনর্ব্বার স্বাধীন করিয়া দিবেন। কতকালে যে এরূপ দিন উপস্থিত হইবে তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। তবে বাণিজ্যের স্রোত অনিবারিতরূপে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে কখন না কখন যে এরূপ দিন উপস্থিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব আমাদের দেশের এক্ষণে স্থলপথে ও জলপথে দেশবিদেশের সহিত বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত ও এইরূপ বাণিজ্যের যাহাতে উন্নতি হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার ভুরি ভুরি প্রমাণ অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল ইহাও নানাপ্রকারে সপ্রমাণ করা যায়। বেদ আমাদিগের সর্ব্বপ্রধান শাস্ত্র। চারি বেদের মধ্যে ঋগ্‌বেদ আবার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। খ্রীষ্টের কতকাল পূর্ব্বে যে এই বেদ লিখিত হইয়াছিল তাহার নির্ণয় নাই। তবে ঋগ্‌বেদ যৎকালে লিখিত হইয়াছিল, তৎকালে যে ভারতবর্ষে বাণিজ্যের প্রবল প্রচার ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঋগ্‌বেদের মধ্যে সমুদ্র, সমুদ্রযান, দ্রব্যের মূল্য, এই সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে। তাহাতে বোধ হয় তৎকালের ভারতবর্ষীয়েরা বাণিজ্যব্যবসায়ী ছিলেন।* ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা আসিয়াখণ্ডের যে স্থানকে মনুষ্যদিগের আদিম বাসভূমি বলিয়া নির্ণয় করেন, মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, যে ইক্ষ্বাকু সন্তানেরা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া ঐ স্থানে বাস করিয়াছিলেন। ঐ স্থানের প্রকৃত নাম উত্তর কুরু। এক্ষণে উহার নাম রুসীয় তাতার হইয়াছে। রাজতরঙ্গিণীর চতুর্দ্দশতরঙ্গে লিখিত আছে, কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য দিগ্‌বিজয়প্রসঙ্গে বুখারা হইতে উত্তর কুরু প্রদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। খৃঃ অষ্টম শতাব্দে এই ললিতাদিত্যের সময়। † উত্তর কুরু প্রদেশের নৈঋত কোণে কৃষ্ণসাগরের পূর্ব্ব-উপকূলে কলচিস নামক স্থানে অদ্যাপি হিন্দুদিগের বসতি আছে। তুরস্ক দেশীয় বসোরা নগরে গোবিন্দ রায় ও কল্যাণ রায় নামক দুই বিষ্ণুমূর্ত্তি সংস্থাপিত আছে। ‡ বালী ও জাবাদ্বীপে বহুকাল অবধি হিন্দুদিগের বসতি আছে। পারস্যের অন্তর্গত হিন্দুলাজ নগরে হিন্দুদিগের প্রতিষ্ঠিত অনেক দেবমূর্ত্তি আছে। অনেক শৈব সন্ন্যাসীরা অদ্যাপি তথায় গমন করিয়া থাকেন। ‖ পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয়েরা

---

* ১ মণ্ডল। ৬ অনুবাক। ২ সূক্ত।
,, ,, ৭ ,, ৩ ,, ।

† ভূঃখারাঃ শিখরশ্রেণীর্যাস্তঃ সত্বক্তা বাজিনঃ। উত্তরা কুরবঃ ইত্যাদি।

‡ Asiatic Researches Vol. x. page 1 7.

‖ Asiatic Researches Vol 4. and Ephinstone's India.

আমেরিকা খণ্ডেও উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন তাহাও অসম্ভব নহে। পুরাণানুসারে বলি রাজা ও পুরুবংশীয় এক জন রাজার পাতালে বাস দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ আমেরিকায় বলিবিয়া ও পুরুবিয়া নামক দুইটী দেশ আছে। বোধ হয় পুরুভূমি ও বলিভূমি এই দুই শব্দের অপভ্রংশে পিরুবিয়া ও বলিবিয়া এই দুইটী নাম উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। আবার পুরুবিয়া ও বলিবিয়া দেশীয় রাজারা আপনাদিগকে সূর্য্য-বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। তাঁহাদিগের প্রধান মহোৎসবের রামসীতোয়া এই নাম ছিল। ইহাদ্বারা বোধ হয় প্রাচীনকালে ভারত-বাসীদিগের আমেরিকা পর্য্যন্ত গতিবিধি ছিল।* ইহা অনেকেই অবগত আছেন যে প্রাচীনকাল হইতেই কাম্বোজবাসী হিন্দুরা আফ্রিকার পূর্ব্ব "জোঙ্কর দ্বীভ" সুখতর দ্বীপে বাস করিতেছেন। হিন্দুরা অর্ণবপোতা-রোহণে ইউরোপখণ্ডের নানাস্থানে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেন। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে ইহার একটী নিশ্চয় প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ঐ সালে ইংলণ্ডের কোন স্থানে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে একখানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত তাম্রফলক প্রাপ্ত হওয়া যায়। ম্যাকসমুলর প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাহা পাঠপূর্ব্বক স্থির করিয়াছেন যে খৃষ্টের প্রায় ২২০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয়েরা বাণিজ্যার্থ ইংলণ্ডে যাতায়াত করিতেন। ঐ লিপি অদ্যাপি ইংলণ্ডের মিউজিয়মে রহিয়াছে।

এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইবে যে অতি প্রাচীনকালে ভারতবাসীরা বাণিজ্যব্যবসায়ী ছিলেন। কালক্রমে বাণিজ্যব্যবসায় উঠিয়া যাওয়াতেই ভারতবর্ষের এত দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। আবার ভারতবর্ষে যদি পুনর্ব্বার প্রাচীনকালের ন্যায় বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা পুনরুদিত হইতে পারিবে।

বাণিজ্য দুই প্রকার। অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য। কোন দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের অধিবাসীরা পরস্পর যে বাণিজ্য করিয়া থাকে তাহাকে অন্তর্বাণিজ্য কহে। আর ভিন্ন ভিন্ন

* Asiatic Researches Vol I. P. 426.

দেশের অধিবাসীরা পরস্পর যে বাণিজ্য চালাইয়া থাকে তাহার নাম বহির্বাণিজ্য। ভিন্ন দেশ হইতে যে মাল আনীত হয় তাহাকে আমদানী কহে। আর ভিন্ন দেশে যে মাল চালান হয় তাহার নাম রপ্তানি।

অন্তর্বাণিজ্যদ্বারা এক দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের প্রত্যেকের যেরূপ উপকার হইয়া থাকে, বহির্বাণিজ্যদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রত্যেকের প্রায় সেইরূপ উপকার হয়। অতএব বহির্বাণিজ্যদ্বারা ভিন্ন দেশের কিরূপ উপকার হয়, কিরূপেই বা সেই উপকার হইয়া থাকে এক্ষণে তৎসমুদয় স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইতেছে। বিদেশের সহিত বাণিজ্যদ্বারা সকল দেশেরই সমূহ উপকার হইয়া থাকে। সকল দেশে সকল প্রকার দ্রব্য পাওয়া যায় না। দেশের জলবায়ু আবহওয়া প্রভৃতি এরূপ হইতে পারে যে তথায় কোন বিশেষ দ্রব্য কোন রূপেই উৎপন্ন হইতে পারেনা। হয় ত সেই দেশের অধিবাসীরা কোন বিশেষ দ্রব্য প্রস্তুত করিবার কৌশলবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ হইতে পারে। আবার এরূপ হওয়াও অসম্ভব নহে যে, ভূমির অবস্থানুসারে কোন দেশে কোন বিশেষ কৃষিজদ্রব্য জন্মিতে পারে না। প্রাকৃতিক কারণ বশতঃ কোন কোন শিল্পদ্রব্যের উপকরণ সামগ্রী কোন দেশে একবারে না থাকিলেও থাকিতে পারে। ফলতঃ নানাবিধ কারণে সকল দেশে সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য পাওয়া যায় না। সকল দেশেই কোন না কোন আবশ্যক দ্রব্যের অভাব হওয়া অনিবার্য্য। সকল দেশেই যেরূপ কতকগুলি দ্রব্যের অভাব হইয়া থাকে, সেইরূপ আবার আর কতকগুলি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে, যে তথাকার প্রয়োজন সম্পন্ন হইয়াও অনেক উদ্বৃত্ত হয়। এরূপ স্থলে যে দেশে যে দ্রব্যের অভাব

আছে, বাণিজ্যদ্বারা তাহা অনায়াসেই নিবারণ হইয়া যায়। যে দেশে যে দ্রব্য নাই অথবা অল্পপরিমাণে পাওয়া যায়, সেই দেশের অধিবাসীরা স্বদেশসুলভ কোন দ্রব্যের পরিবর্ত্তে অন্যান্য দেশ হইতে তাহা আনয়নপূর্ব্বক আপনাদিগের অভাবনিরাকরণ করিতে পারে। এরূপ হওয়াতে উভয় দেশে-রই উপকার হইয়া থাকে। কারণ উভয় দেশেই কোন না কোন দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। উভয় দেশের লোকেরাই সেই সেই দ্রব্যের পরিবর্ত্তে আপন আপন দেশে যে যে দ্রব্যের অভাব আছে, পরস্পরের নিকট তাহা লইয়া স্ব স্ব অভাব নিরাকরণ করিতে সমর্থ হয়। বিদেশের সহিত বাণিজ্য করাতে ব্যবসায়ীদিগের বিলক্ষণ লাভও হইয়া থাকে। সুতরাং সকলেই ব্যবসায়দ্বারা লাভ করিবার প্রত্যাশায় পরিশ্রম ও মূলধনের উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিতে যত্নবান হয়। এইরূপে দেশের ও মূলধনবৃদ্ধি হইয়া কালক্রমে দেশ ধনশালী হইয়া উঠে।

মনে কর ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ এই দুই দেশের মধ্যে পরস্পর বাণিজ্য চলিতেছে। ইংলণ্ডে বিস্তর লৌহ ও পাথরিয়া কয়লা পাওয়া যায়। আর ইহা এত হিমপ্রধান দেশ যে ঐ লৌহ গলাইতে হইলে যত অধিক ইচ্ছা উত্তাপ দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং ইংলণ্ডে ছুরী কাঁচী প্রভৃতি নানাবিধ লৌহময় সামগ্রী প্রস্তুত করিবার যৎপরোনাস্তি সুবিধা আছে। আবার ভারতবর্ষের জলবায়ু ও ভূমির উর্ব্বরতাগুণ এরূপ যে এখানে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে চাউল, পাট, চিনি, তূলা প্রভৃতি কৃষিজ দ্রব্য জন্মিয়া থাকে। ইংলণ্ডের ভূমি এত সুবিধার নহে যে তথায় চাউল পাট প্রভৃতি দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে পারে। আবার ইংলণ্ড অপেক্ষা ভারতবর্ষে লৌহ ও কয়লা অনেক কম উৎপন্ন হয়। আর এখানে লৌহ গলাইতে হইলেও যত অধিক ইচ্ছা উত্তাপ দিবার যো নাই। সুতরাং ভারতবর্ষে ছুরী কাঁচী প্রভৃতি লৌহময় দ্রব্য নির্ম্মাণ

করিবার পক্ষে ইংলণ্ডের ন্যায় সুবিধা নাই। কিন্তু ইংলণ্ডের চাউল ও পাটের প্রয়োজন যেরূপ, ভারতবর্ষে ছুরী কাঁচির প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা ন্যূন নহে। এরূপ স্থলে ঐ উভয়বিধ দ্রব্য বদলাবদলী করিতে পারিলে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয়েরই উপকার হয়। ইংলণ্ড চাউল পাট প্রভৃতি পাইতে পারে, ভারতও ছুরী কাঁচী প্রভৃতি পাইতে পারে। মনে কর ভারতবর্ষে এক মণ লোহা সংগ্রহ করিতে ২০ টাকা ব্যয় পড়ে। কিন্তু ইংলণ্ডে এক মণ লোহায় ৫ টাকার অধিক ব্যয় পড়ে না। সুতরাং ভারতবর্ষে লোহার মূল্য ইংলণ্ড অপেক্ষা ৪ গুণ অধিক। আবার ইংলণ্ডে এক মণ চাউল প্রস্তুত করিতে ৫ টাকা ব্যয় পড়ে, কিন্তু ভারতবর্ষে এক মণ চাউলের ব্যয় ২ টাকা মাত্র। অতএব লোহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে ভারতবর্ষে ১ মণ লোহায় ১০ মণ চাউল পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইংলণ্ডে ১ মণ লোহায় এক মণ মাত্র চাউল পাওয়া যায়। এরূপ স্থলে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ যদি লোহা ও চাউল পরস্পর পরিবর্ত্ত করে, তাহা হইলে উভয় পক্ষেরই লাভ হইতে পারে। ইংলণ্ড ঘরে ১ মণ লোহার পরিবর্ত্তে এক মণ মাত্র চাউল পাইতে পারে, সুতরাং যদি ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে এক মণ লোহা দিয়া উহার পরিবর্ত্তে ৫ মণ চাউল পায়, তাহাতে ইংলণ্ডের বিলক্ষণ লাভ হয়। আবার এরূপ করাতে ভারতবর্ষের ও লাভ। কারণ ভারতবর্ষকে ঘরে ১০ মণ চাউলের পরিবর্ত্তে ১ মণ লোহা লইতে হইত, কিন্তু ইংলণ্ডের সহিত পরিবর্ত্ত করাতে ৫ মণ মাত্র চাউলের বিনিময়ে ১ মণ লোহা পাইতেছে। ইংলণ্ডীয়েরা নিজদেশে ৫ টাকায় ১ মণ মাত্র চাউল পাইত, কিন্তু এক্ষণে ৫ টাকায় ৫ মণ পাইতেছে, আবার ভারতবর্ষীয়েরা নিজদেশে ২০ টাকায় ১ মণ মাত্র লোহা পাইত, কিন্তু এক্ষণে ২০ টাকায় ২ মণ লোহা পাইতেছে। অতএব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইবে যে এইরূপ বাণিজ্যদ্বারা উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ লাভ হইতেছে।

সচরাচর যে দ্রব্য সস্তা তাহাই বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে, আর যাহা আক্রা তাহাই বিদেশ হইতে আমদানী

করিতে হয়। এরূপ করাতে উভয় দেশেরই লাভ হয়। ইহা দ্বারা এরূপ বুঝা উচিত নহে যে সস্তা দ্রব্য রপ্তানী ও মহার্ঘ দ্রব্য আমদানী না করিলে আর লাভ করা যায় না। বাণিজ্য-দ্বারা লাভ করিতে হইলে এই মাত্র প্রয়োজন যে, যে দুই দেশের মধ্যে দ্রব্যাদি বিনিময় হইয়া থাকে, তাহাদের পরস্পর এরূপ দ্রব্য বিনিময় করা আবশ্যক, যে উহাদের মূল্য পরস্পর তুলনা করিলে তারতম্য দৃষ্ট হইতে পারে। এরূপ হইলেই বাণিজ্যদ্বারা লাভ হইতে পারে, নতুবা লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই।

মনে কর ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এই উভয় দেশের মধ্যে লৌহ ও গম লইয়া বাণিজ্য হইতেছে। ইংলণ্ড ফ্রান্সে লৌহ পাঠাইয়া উহার পরিবর্ত্তে গম লইতেছে। মনে কর ফ্রান্সে, লোহা উৎপন্ন করিতে হইলে টন প্রতি ৩০ পাউণ্ড ব্যয় পড়ে, আর তথায় ১ স্যাক গমের মূল্য ১॥ পাউণ্ড। অতএব ফ্রান্সে ১ টন লৌহের মূল্য ১০ পাউণ্ড ও এক স্যাক গমের মূল্য ১ পাউণ্ড। সুতরাং ইংলণ্ডে ১ টন লৌহের মূল্য ১০ স্যাক গম। অতএব দেখ এস্থলে, ইংলণ্ডে লোহা ও গম উভয়ই অপেক্ষাকৃত সস্তা, আর ফ্রান্সে লোহা ও গম দুই অপেক্ষাকৃত দুর্মূল্য। ইংলণ্ড অপেক্ষা ফ্রান্সে লোহার মূল্য তিনগুণ অধিক, আর গমের মূল্য ১॥ গুণ অধিক। অতএব লোহা ও গম এই দুই দ্রব্যের ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে কিরূপ মূল্য, তাহা তুলনা করিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে উহাদের মূল্যের তারতম্য আছে। অতএব এস্থলে এই উভয় দ্রব্যের বিনিময়ে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড উভয় দেশেরই লাভ হইতে পারে। মনে কর ইংলণ্ড ১ টন লোহার পরিবর্ত্তে ফ্রান্সের নিকট ১৫ স্যাক গম লইল। এক্ষণে বুঝিয়া দেখ এইরূপ কেনা বেচা দ্বারা উভয়েরই পাঁচ স্যাক গম লাভ হইতেছে। কারণ ইংলণ্ড ঘরে ১ টন লোহার পরিবর্ত্তে ১০ স্যাক গম পাইতেছিল, এক্ষণে ১৫ স্যাক পাইতেছে, অতএব ইংলণ্ডের পাঁচ স্যাক গম লাভ হইল। আবার ফ্রান্সকে ঘরে ১ টন লোহার পরিবর্ত্তে ২০ স্যাক গম দিতে হইত, কিন্তু এক্ষণে কেবল

১৫ স্যাক মাত্র দিতে হইতেছে, সুতরাং ফ্রান্সের ও ৫ স্যাক গম বাঁচিয়া গেল। কিন্তু এরূপ না হইয়া যদি ফ্রান্সে ১ টন লৌহের দাম ৩০ পাউণ্ডই থাকিত ও এক স্যাক গমের দাম ১॥ পাউণ্ড না হইয়া ৩ পাউণ্ড হইত, অর্থাৎ যদি ফ্রান্সে লোহা ও গম উভয়ের মূল্যই ইংলণ্ডের অপেক্ষা তিন গুণ অধিক হইত তাহা হইলে লোহা ও গমের বাণিজ্যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে কাহারও লোকসান বই লাভ হইতে পারিত না। এই বিষয়টী বিশেষরূপে বুঝিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে ইংলণ্ড ১ মণ লৌহের পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষের নিকট ৫ মণ চাউল লইতে পারে, আবার ভারতবর্ষও ৫ মণ চাউলের পরিবর্ত্তে ইংলণ্ডের নিকট ১ মণ লোহা লইতে পারে। এরূপ করিবার দ্বারা উভয় পক্ষেরই লাভ হয়। কিন্তু ইংলণ্ড ১ মণ লোহার পরিবর্ত্তে ৫ মণ অপেক্ষা অধিক চাউল পাইবে না, আর ভারতবর্ষও ৫ মণ চাউলের পরিবর্ত্তে ১ মণ অপেক্ষা অধিক লৌহ পাইবেনা। এরূপ কোন নিয়ম নাই। রপ্তানী দ্রব্যের কত পরিমাণ বা সংখ্যার পরিবর্ত্তে আমদানী দ্রব্যের কত পরিমাণ বা সংখ্যা পাওয়া যাইতে পারে, ইহা কেবল প্রয়োজন ও সরবরাহের তারতম্য অনুসারেই নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। যে দেশ হইতে যে দ্রব্য দেশান্তরে রপ্তানি হয়, যদি ঐ দেশ যে পরিমাণে ঐ দ্রব্য সরবরাহ করিতে পারে, তদপেক্ষা ভিন্নদেশে উহার প্রয়োজন অধিক হয়, তাহা হইলে ঐ রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইতে পারে। আর যদি প্রয়োজন অপেক্ষা সরবরাহ অল্প হয় তাহা হইলে উহার মূল্য কমিয়া যাইতে পারে।

বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা যে লাভ হয়, উহা যে কেবল ব্যবসায়ীরাই পাইয়া থাকে এরূপ নহে। যে দেশ হইতে যে দ্রব্য রপ্তানি করিয়া লাভ হয়, সেই দেশের যাবতীয় লোক উক্ত দ্রব্য ব্যবহার করে, তাহাদের সকলেরই সমানরূপে লাভ হইয়া থাকে। কারণ রপ্তানির পরিবর্ত্তে যে দ্রব্য আমদানী হয়, তাহা সকলেই স্বদেশ অপেক্ষা অল্প মূল্যে ক্রয় করিতে পারে, এবং এইরূপে ব্যবসায়ের লাভ দেশের তাবৎ অধিবাসীরাই

ভোগ করিতে সমর্থ হয়। বিদেশের সহিত বাণিজ্যের যেরূপ নিয়ম পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রতি কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিলে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইবে, যে বিদেশ হইতে যে সামগ্রীর আমদানী করা যায়, যে দেশে আমদানী হয়, তথায় উহার মূল্য কমিয়া যায়, আর যে দ্রব্য রপ্তানী করা যায় তাহার মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া উঠে। এক্ষণে এরূপ বলা যাইতে পারে, যে যদিও বিদেশীয় বাণিজ্যদ্বারা উপরিউক্ত প্রকারে দেশের উপকার সাধিত হয় বটে, কিন্তু উহার সঙ্গে কয়েকটী অপকার ও হয়। প্রথম যে দ্রব্য রপ্তানী করিতে হয়, তাহার মূল্যবৃদ্ধি হওয়াতে সকলকেই বর্দ্ধিত মূল্যে ঐ দ্রব্য ক্রয় করিতে হয়, সুতরাং ক্রেতাদিগের ইহাতে অসুবিধা হইয়া থাকে। দ্বিতীয় যদিও যে দ্রব্যের আমদানী হয় তাহা অল্প মূল্যে ক্রয় করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু যাহাদিগের ঐ আমদানীর দ্রব্যের তাদৃশ প্রয়োজন নাই তাহাদিগের উক্ত বাণিজ্য দ্বারা কি উপকার হয়? মনে কর, ধান রপ্তানী করিয়া বিলাত হইতে মদ আমদানী করা হইতেছে। যাহারা মদ ব্যবহার করে না তাহাদের উহাতে লোকসান ভিন্ন লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। তৃতীয়তঃ কোন দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করিলে সাধারণে উহা পূর্ব্বাপেক্ষা অল্পমূল্যে ক্রয় করিতে পারে বটে, কিন্তু স্বদেশে যাহারা উক্ত দ্রব্যের ব্যবসায় করিত, আমদানী দ্বারা মূল্য কমাতে তাহাদের ক্ষতি হইয়া থাকে। কারণ সেই দ্রব্যের উৎপাদনব্যয় সমান থাকে, অথচ ব্যবসায়ীদিগকে উহা পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে হয়। নূতন নূতন বিদেশের সহিত বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিলে কিছুদিন ঐ রূপ অপকার সহ্য করিতে হয় বটে, কিন্তু কিছুদিন বাণিজ্য চলিতে চলিতে উহা অন্তর্হিত হইয়া যায়। কারণ

কোন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করিতে হইলে উহা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিতে হয়। অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিতে হইলেই শ্রমের বেতন বৃদ্ধি হইয়া উঠে। সুতরাং শ্রমের বেতন বৃদ্ধি দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত লোকসান পোষাইয়া যায়; অতএব লোকে স্বদেশোৎপন্ন দ্রব্য ও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে পারে। আর বিদেশ হইতে আমদানী করাতে যে দ্রব্যের মূল্য কমিয়া যায়, আমদানী করিবার পূর্ব্বে স্বদেশে যাহারা ঐ দ্রব্যের ব্যবসায় করিত, তাহাদিগের ও ক্ষতি হয় না। কারণ বিদেশ হইতে আমদানী হওয়াতে উক্ত দ্রব্য স্বদেশে পূর্ব্বের ন্যায় পরিমাণে উৎপন্ন করিবার প্রয়োজন থাকেনা। ব্যবসায়ীরা উহা হইতে মূলধন অপসারিত করিয়া অন্যান্য লাভজনক কার্য্যে নিক্ষেপ করিতে পারে, আর পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিমাণে উৎপন্ন করিতে হইলে ঐ দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় ও পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যাইতে পারে। সুতরাং পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইবে যে বিদেশীয় বাণিজ্য দ্বারা উপকার ভিন্ন অপকারের সম্ভাবনা নাই।

কোন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করিতে হইলে বা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইলে বহনীখরচ পড়িয়া থাকে। মুটে ভাড়া, জাহাজ ভাড়া প্রভৃতি সমুদয় বহনীখরচ। এই বহনীখরচ যে দেশ হইতে রপ্তানী হইতেছে আর যে দেশে আমদানী হইতেছে উভয় দেশেই ভাগ করিয়া লয়। অর্থাৎ বহনী খরচ ধরিয়াও দ্রব্যের মূল্যের কিঞ্চিৎ হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। দুই দেশের মধ্যে এক একটী বিশেষ দ্রব্য অবলম্বন করিয়া বাণিজ্য করিলে যেরূপ উপকার হয়, অনেক দেশের সহিত বহুবিধ দ্রব্য অবলম্বন করিয়া বাণিজ্য করিলেও অবিকল সেইরূপ উপকার হইয়া থাকে। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে বাণিজ্য দ্বারা দেশ বিদেশের অশেষবিধ উপকার হয়।

বাণিজ্য স্বাধীন ও একচেটিয়া দুই প্রকার হইতে পারে। স্বাধীন ব্যবসায় যাহার ইচ্ছা সকলেই করিতে পারে, ও ইহা-দ্বারা দেশের তাবৎ লোকেরই উপকার হয়। একচেটিয়া ব্যবসায় কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বা রাজার হস্তগত, আর কেহই উক্ত ব্যবসায় করিতে পারেনা, সুতরাং ঐ ব্যবসায় দ্বারা যাহা লাভ হয় তাহা সাধারণের ভোগ্য নহে। এরূপ একচেটিয়া বাণিজ্য উঠাইয়া দিয়া বাণিজ্যকার্য্যে সকলকেই স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। আমাদের দেশে লবণ মাদকদ্রব্য প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া।

এই পরিচ্ছেদে দ্রব্যের বিনিময়ে অন্যান্য দ্রব্য লওয়ার বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বাণিজ্যকার্য্যে দ্রব্যের বিনিময়ে অন্যান্য দ্রব্য লইবার প্রথা একবারে উঠিয়া গিয়াছে। ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ দ্রব্যের বিনিময়ে ক্রেতাদিগের নিকট অর্থ লইয়া থাকে, আবার ঐ অর্থের পরিবর্ত্তে আপনাদিগের আবশ্যকমত দ্রব্য ক্রয় করিয়া লয়। যাহারা স্বদেশ হইতে কোন দ্রব্য লইয়া বিদেশে বাণিজ্য করিতে যায়, তাহারা আপন আপন দ্রব্যের পরিবর্ত্তে বিদেশীয়দিগের নিকট অর্থ লইয়া থাকে, আবার ঐ অর্থের পরিবর্ত্তে বিদেশ হইতে আপন আপন ইচ্ছানুরূপ দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিয়া স্বদেশে বিক্রয় করে। কিন্তু বিদেশে অর্থ পাঠাইয়া দেওয়া বা তথা হইতে লইয়া আসায় ব্যয় প্রভৃতি অনেক অসুবিধা আছে। অনেক স্থলে উহা হওয়াও অসম্ভব হইয়া উঠে। সুতরাং যাহাতে কোন দেশ হইতে বিদেশে অর্থ বাহির হইয়া না যায়, অথচ বাণিজ্য-কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারে, বাণিজ্যব্যবসায়ীরা এইরূপ একটী উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহাদ্বারা বাণিজ্য কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয়। বাজার-সম্ভ্রম ও পসার অর্থাৎ বিশ্বাসই

এই কৌশলের নিদান। ইহাদ্বারা দেশবিদেশে বাণিজ্য চলিতে পারে, কিন্তু কোন দেশ হইতেই অর্থ বাহির হইয়া বিদেশে যায় না। এই কৌশলটীকে বিল অফ একশ্‌চেঞ্জ বা বরাত চিটী ও হুণ্ডী কহে।

মনে কর বঙ্গদেশ ও ইংলণ্ডের পরস্পর বাণিজ্য চলিতেছে। পামর নামক এক জন বিলাতী ব্যবসাদার ধনপৎসিং নামক এক জন বাঙ্গালী ব্যবসায়ীকে ১০,০০০ টাকার বিলাতী কাপড় বিক্রয় করিলেন। এবং কারলাইল নামক আর এক জন ইংরাজ মহাজন, হরিদাস নামক একজন বাঙ্গালী ব্যবসাদারের নিকট ১০,০০০ টাকার রেশম খরিদ করিলেন। এস্থলে ধনপৎসিংহের নিকট পামর সাহেবের দশ হাজার টাকা পাওনা হইতেছে, আর কারলাইল সাহেবের নিকট হরিদাসের ১০০০০ টাকা পাওনা হইতেছে। এস্থলে ধনপৎ পামরকে বিলাতী কাপড়ের মূল্য দশ হাজার টাকা নগদ দিতে পারেন, ও কারলাইল ও হরিদাসকে রেশমের জন্য ১০ হাজার টাকা নগদ দিতে পারেন, এইরূপে সকলের দেনা পাওনা শোধবোধ হইতে পারে। কিন্তু ব্যবসায়ীরা ঐরূপ উপায় অবলম্বন না করিয়া নিম্নলিখিত কৌশলক্রমে আপনাদের দেনা পাওনা চুকাইয়া থাকেন। ইহাতে ব্যবসায়ও চলিয়া যায়, আর এক দেশের অর্থও অপর দেশে যায় না। মনে কর হরিদাস কারলাইলকে বলিলেন, মহাশয় আপনি আপনার নিকটে আমার প্রাপ্য ১০ হাজার টাকা আমাকে না দিয়া বিলাতবাসী পামর সাহেবকে দিবেন। আবার পামর সাহেবও ধনপৎকে বলিলেন, মহাশয় আপনি আপনার নিকট আমার প্রাপ্য ১০ হাজার টাকা আমাকে না দিয়া হরিদাসকে দিবেন। এই নিয়ম অনুসারে দেনা পাওনা চুকান হইল। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ এই কৌশলদ্বারা পামর সাহেবও আপনার টাকা পাইলেন, আবার হরিদাসও রেশমের দাম পাইলেন, কিন্তু ইংলণ্ড হইতে টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন হইল না, আর বাঙ্গালা হইতেও বিলাতে টাকা পাঠাইতে হইল না। সুতরাং টাকা পাঠাইবার ব্যয় ও বিপদ সমুদয় বাঁচিয়া গেল। অথচ টাকা পাঠাইলে যেরূপ কার্য্য হইত ইহাতেও অবিকল তাহাই হইল।

আমদানী মালের মূল্য রপ্তানী মালের মূল্যের সহিত ঠিক সমান হইলেই এইরূপ বিল বা বরাত বিশেষ কার্য্যকর হয়। কিন্তু কোনটীর মূল্য অপরটী অপেক্ষা অধিক হইলে সমান অংশ ঐ রূপে কাটাইয়া দিয়া অতিরিক্ত অংশ অর্থরূপে পাঠাইতে হয়। আবার ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ে পরামর্শ না করিলেও কেবল বিলের দ্বারাই কার্য্য সমাধা হইতে পারে। মনে কর ধনপৎ পামরের কর্ম্মাধ্যক্ষকে এরূপ একখানি অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দিলেন, যে তিনি বা তাঁহাকে বিশ্বাস করে এরূপ কোন ব্যবসায়ীর নিকট কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উহা দাখিল করিলেই কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় তৎক্ষণাৎ ১০,০০০টাকা পাইবেন। আবার কারলাইল হরিদাসকে এরূপ একখানি অঙ্গীকারপত্র দিলেন, যে হরিদাস বিলাতে কারলাইলের আফিসে, বা কারলাইলকে যাঁহারা বিশ্বাস করেন এরূপ কোন ব্যবসাদারের নিকট ঐ বিল দাখিল করিবামাত্র ১০০০০ টাকা পাইবেন। ইহা-দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে পামরের বিলখানি বাঙ্গালা দেশে ভাঙ্গাইতে হইবে, আর হরিদাসের বিলখানি বিলাতে ভাঙ্গাইতে হইবে। এক্ষণে মনে কর, পামরের কর্ম্মাধ্যক্ষ আপন বিলখানি নামসহি করিয়া হরিদাসকে দিলেন, ও উহার পরিবর্ত্তে হরিদাস আবার আপন বিলখানি স্বাক্ষর করিয়া পামরের কর্ম্মাধ্যক্ষকে দিলেন, ইহাতে উভয়েরই সুবিধা হইল, পামর বিলাতে বসিয়াই আপন টাকা পাইলেন, আর হরিদাস বিলাতে না গিয়াও রেশমের মূল্য পাইলেন। এইরূপ অঙ্গীকারকে বিল অব্ একসচেঞ্জ কহে। কিন্তু এইরূপে বদল না করিয়াও কার্য্য চলিতে পারে। কারণ কতকগুলি লোক বিল ভাঙ্গাইবার ব্যবসা করিয়া থাকেন। ইঁহারা বিল লইয়া টাকা দেন ও উহার পরিবর্ত্তে কিছু কিছু কমিশন লইয়া থাকেন ও পরিশেষে যাঁহারা

বিল দিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট টাকা আদায় করিয়া লয়েন। বিল এইরূপে অনেক হাত ফিরিয়া তবে যাহাদের বিল তাহাদের নিকট পোঁছিতে পারে ও তাহাদিগকে টাকা দিতে হয়। এক্ষণে মনে কর পামর ও হরিদাস উভয়ে একত্র হইয়া ঐরূপে নিজ নিজ বিল পরিবর্ত্ত না করিয়াও ঐরূপ ব্যবসায়ীদিগের নিকট বিল দাখিল করিয়া টাকা লইতে পারেন। পামর বিলাতে ভাঙ্গাইয়া লয়েন, আর হরিদাস আপন দেশে ভাঙ্গাইয়া লয়েন। বিলাতের বিলব্যবসায়ীরা পরিশেষে ধনপতের নিকট ঐ বিলের টাকা আদায় করিয়া লয়েন, ও বাঙ্গালার বিল-ব্যবসায়ীরা কারলাইলের নিকট উঁহার বিলের টাকা আদায় করিয়া থাকেন। কিন্তু আদায় হইবার পূর্ব্বে ঐ সকল বিল অনেক হাত ফিরিতে পারে ও অনেকবার উহাদের দ্বারা অর্থের কার্য্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু বিশ্বাসই এইরূপ বিল চালাইবার মূল। পরস্পর বিশ্বাস না থাকিলে কেহ কাহারও বিল লইতে পারে না। কিন্তু এই প্রকারে বিলদ্বারাই বিদেশের বাণিজ্য প্রায় সম্পূর্ণরূপে চলিয়া থাকে। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে বিশ্বাসই বাণিজ্যের মূলাধার। এই বিষয় পরের পরিচ্ছেদে পুনর্ব্বার লিখিত হইবেক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিনিময়—পসার বা বাজার-সম্ভ্রম।*

যে ব্যক্তি অন্যকে অর্থ বা অপর কোন দ্রব্য কর্জ্জ দেয়

---

* সংস্কৃতে "প্রসর" শব্দের অর্থ বিস্তার। অতএব বোধ হয় এই প্রসর শব্দের অপভ্রংশেই বাঙ্গালা "পসার" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকিবে।

তাহাকে উত্তমর্ণ কহে। যে অন্যের নিকট কর্জ্জ গ্রহণ করে, তাহার নাম অধমর্ণ। সুতরাং অন্যের নিকট প্রাপ্য অর্থাদিকে উত্তম ঋণ বা পাওনা কহে, আর অন্যকে দেয় অর্থাদিকে অধম ঋণ বা দেনা বহে। উত্তমর্ণের সহিত অধমর্ণের যে সম্বন্ধ তাহার নাম পসার বা সম্ভ্রম, অতএব পসার বা সম্ভ্রম কেবল বিশ্বাসের কার্য্য, অর্থাৎ যে ধার লইতে চাহে, তাহার প্রতিবিশ্বাস না থাকিলে কেহই তাহাকে ধার দিতে সম্মত হয়না। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যে অধমর্ণের প্রতি উত্তমর্ণের যে বিশ্বাস তাহারই নাম পসার বা সম্ভ্রম। মনে কর একব্যক্তির এত অধিক ধন আছে, যে উহার সমুদয় অংশই তাহার নিজের প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত আবশ্যক হয়না। আর নিজ প্রয়োজন সাধনকরিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা মূলধনস্বরূপে কোন ব্যবসায়ে খাটা-ইতেও ঐ ব্যক্তির ইচ্ছা নাই। আবার যদিই বা ইচ্ছা থাকে তথাপি তাহার ব্যবসায় চালাইবার কিছুমাত্র সুবিধা নাই। আবার মনে কর আর এক ব্যক্তির মূলধনের অভাব আছে। সেই ব্যক্তি মূলধন পাইলে কোন নূতন কারবার চালাইতে আরম্ভ করিতে পারে, অথবা নিজের যদি কোন কারবার থাকে তাহা হইলে উহার মূলধন বাড়াইতে পারিলে লাভ বাড়িয়া উঠে। এরূপ স্থলে এই দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে এরূপ বলিতে পারে যে আপনার যে মূলধন বৃথা পড়িয়া রহিয়াছে উহা আমাকে ব্যবহার করিতে দিউন, আমি উহা ব্যবসায়ে খাটাইয়া লাভ করিতে পারিব, ও আপনি আমাকে ব্যবহার করিতে দিবেন বলিয়া ঐ ব্যবহারের পরিবর্ত্তে আপনাকে আসলের উপর কিঞ্চিৎ অধিক দিয়া এতদিনের মধ্যে অথবা আপনার আবশ্যকমতে ফেরত দিব। এরূপ করিলে আপনার ধন ও বৃথা পড়িয়া থাকিবে না, আপনি উহা হইতে কিছু কিছু

পাইতে পারিবেন, ও আমিও কারবারে খাটাইয়া উহা হইতে কিছু লাভ পাইতে পারিব, অতএব এরূপ করিলে ঐ টাকা হইতে আমাদের উভয়েরই লাভ হইতে পারিবে। যদি প্রথম ব্যক্তি অর্থাৎ ধনীর দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ যে ধার চাহিতেছে তাহার প্রতি বিশ্বাস থাকে, অর্থাৎ প্রার্থী সত্য কথা বলিতেছে ধনীর মনে এরূপ সংস্কার হয়, আর যদি প্রার্থী যেরূপ নিয়মে ধার চাহিতেছে, তাহা ধনীর পক্ষে সুবিধাজনক হয়, তাহা হইলে ধনী অনায়াসেই প্রার্থীকে নিজ অর্থ ধার দিতে পারেন। এইরূপে ধার দেওয়া হইলেই ধনী গ্রহীতার উত্তমর্ণ হয়েন, আর গ্রহীতা ধনীর অধমর্ণ হয়েন। ধনী অপরকে নিজ ধন ব্যবহার করিতে দিয়া ঐ ব্যবহারের পরিবর্ত্তে ফেরত লইবার সময় আসলের উপর কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি লইয়া থাকেন। ঐ বৃদ্ধিকে কুসীদ বা সুদ কহে। এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে অধমর্ণের প্রতি উত্তমর্ণের যে বিশ্বাস তাহারই নাম পসার বা সম্ভ্রম। ঐ পসারের তারতম্য অনুসারে ঋণপ্রাপ্তি ও সুদ উভয়েরই তারতম্য হইয়া থাকে। যাহার অধিক পসার আছে অর্থাৎ যাহার প্রতি লোকের অধিক বিশ্বাস সে অন্য অপেক্ষা অধিক ধার পাইতে পারে, আর যাহার পসার অপেক্ষাকৃত অল্প সে ধারও অপেক্ষাকৃত অল্প পায়। এইরূপ যাহার পসার অধিক সে অন্য অপেক্ষা অল্পসুদে ধার পায়, আর যাহার পসার অল্প, ধার লইতে হইলে তাহাকে অন্য অপেক্ষা অধিক সুদ দিতে হয়। ধার কর্জ্জ দেনা পাওনা সমুদয়ই সচরাচর অর্থদ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। টাকা ধার লইয়াই লোকে আপন ইচ্ছামত দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লয়। আমাদের দেশে চাষাদিগের মধ্যে ধান ধার লইবারও রীতি আছে, ইহাকেই চলিত ভাষায় ধানের বাড়ী কহে।

উপরে যাহা লিখিত হইল তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে অন্যের নিকট অর্থ কর্জ্জ করিবার ক্ষমতাকেই পসার বলিয়া থাকে। দেশকাল পাত্রভেদে এই পসারের বিভিন্নতা হয়। যে দেশে অর্থ ধার দিলে উহা ফেরত পাইবার পক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকেনা, তথাকার পসার অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। অর্থাৎ এরূপ দেশে সহজে ও অপেক্ষাকৃত অল্পসুদে ধার পাওয়া যায়। আর যে দেশে ধার দিলে উহা ফেরত পাইবার পক্ষে কিছু সন্দেহ থাকে, তথাকার পসার অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া থাকে। অর্থাৎ এরূপ দেশে অর্থ ধার পাওয়া অপেক্ষাকৃত দুর্ঘট, ও লইতে হইলেও অধিক সুদ দিতে হয়। ইংলণ্ডের পসার আমাদের দেশের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক, ইহার কারণ এই আমাদের দেশে মুসলমানদিগের রাজত্বকালে কেহই নিরাপদে আপন অর্থ ভোগ করিতে পারিতনা, বরং মুসলমানেরা প্রায়ই প্রজাদিগের ভাণ্ডার মধ্যে মধ্যে লুটিয়া লইত, সুতরাং পাছে লুটিয়া লয় এই ভয়ে সকলেই প্রাণপণে আপন আপন ধনসম্পত্তি গোপন করিয়া রাখিত। অন্যকে ধারকর্জ্জ দিলে অমুকের বিলক্ষণ ধন আছে ইহা প্রকাশ পাইবে বলিয়া কেহই সহজে কাহাকেও ধার দিতে চাহিত না। কাজেকাজেই ধার দিলেও অনেক সুদের কমে কেহই আর ধার দিতনা। এই রূপ অভ্যাস হইয়া যাওয়াতে ইংরাজ-গবর্ণমেন্টকেও ইংলণ্ডের অপেক্ষা অধিক সুদে ভারতবর্ষ হইতে ধার লইতে হয়, এবং এই জন্যই আমাদের দেশে কোম্পানির কাগজের সুদ ইংলণ্ডের অপেক্ষা অধিক। যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পসার দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ পাত্রভেদেও পসারের বিভিন্নতা হয়। যে ব্যক্তি সচ্চরিত্র ও যাহাকে সচ্চরিত্র বলিয়া সকলে জানে, ও যাহার ঋণ-

শোধ করিবার উপযুক্ত সম্পত্তি আছে, সে অসচ্চরিত্র বা অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির অপেক্ষা সহজে ও অল্প সুদে ধার পাইতে পারে, সুতরাং এরূপ ব্যক্তির পসার অপেক্ষাকৃত অধিক বলিতে হইবে।

পসার কাহাকে কহে তাহা নির্ণীত হইল, এক্ষণে পসার দ্বারা সমাজস্থ ব্যক্তিদিগের ও সমুদয় সমাজের কিরূপ উপকার হইতে পারে তাহার নির্ণয় করা যাইতেছে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে পসারই মূলধন। পসার ও মূলধনে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই; কিন্তু এরূপ বলা কেবল ভ্রান্তিমাত্র। মূলধন কাহার নাম? যে সঞ্চিত ধন হইতে শ্রমজীবীদিগের ভরণপোষণ হয়, ও যাহাদ্বারা শ্রমের বেতন প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহাকেই মূলধন কহে। কিন্তু পসার ধার কর্জ্জ লইবার ক্ষমতাভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব মূলধন ও পসার কিরূপে অভিন্ন হইবে? ধার করিবার ক্ষমতাদ্বারা শ্রমজীবীদিগের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ ও বেতনপ্রাপ্তি কখনই সম্ভবে না। যদি বল পসার ও মূলধন অভিন্ন নহে বটে, কিন্তু পসার হইতে মূলধনের উৎপত্তি হয়। যাহার মূলধন নাই সে পসারদ্বারা মূলধন উৎপাদন করিয়া লইতে পারে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে এই কথাটীও যুক্তিসঙ্গত নহে। পসার কাহাকে বলে ইহা বুঝিতে পারিলেই ইহার যাথার্থ্য বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় থাকিবে না। পূর্ব্বে নির্ণীত হইয়াছে যে ধার করিবার ক্ষমতাকেই পসার বলে। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে পসারদ্বারা নূতন মূলধন কখনই উৎপন্ন হইতে পারেনা, কেবল একের মূলধন পসারদ্বারা অপরের হস্তগত হইয়া থাকে এই মাত্র। মনে কর একজন অপরের নিকট অর্থ ধার লইয়া আপনার মূলধন বাড়াইল,

এ স্থলে যদিও গ্রহীতার মূলধন পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া উঠিতেছে বটে, কিন্তু উহার মূলধন যে পরিমাণে বাড়িয়া উঠিতেছে উত্তমর্ণের মূলধন ও সেই পরিমাণে কমিয়া যাইতেছে, কারণ উহা উত্তমর্ণের হস্ত হইতে বাহির হইয়া অধমর্ণের হস্তে পড়িতেছে। অতএব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইল যে, পসার দ্বারা মূলধন উৎপন্ন হইতে পারে না, কেবল হস্তান্তর হয় এই মাত্র। কিন্তু এইরূপে মূলধন হস্তান্তর করাই পসারের উপকার। মনে কর এক ব্যক্তির অনেক অর্থ আছে, উহাদ্বারা তাহার নিজের ব্যয় পর্য্যাপ্তরূপে চলিয়া গিয়াও অনেক উদ্বৃত্ত হয়, কিন্তু সে সেই উদ্বৃত্ত অংশ উৎপাদন কার্য্যে না খাটাইয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে। এস্থলে অন্যের উপর তাহার বিশ্বাস থাকিলে সে অনায়াসেরই তাহাকে নিজ অর্থ ব্যবহার করিতে দিতে পারে এবং গ্রহীতা ধনোৎপাদনকার্য্যে নিয়োজিত করিয়া উহা হইতে অধিক ধন উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। পূর্ব্বে যে ধন অনুৎপাদক ছিল তাহা এইরূপে উৎপাদক হইয়া উঠে! কিন্তু গ্রহীতার পসার না থাকিলে সে কখনই ধার পাইতে পারে না। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, যে দেশের যে ধন অনুৎপাদক অবস্থায় ধনীদিগের নিকট পতিত থাকে, পসারদ্বারা উহা হস্তান্তর হইয়া উৎপাদক হইয়া উঠে। পসার না থাকিলে কেহ কাহাকেও ধার দিতে চাহিত না, অতএব দেশের অনেক ধনভাগ অনুৎপাদক অবস্থাতেই পড়িয়া থাকিত। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, যে যদিও পসার নূতন মূলধনের উৎপাদক নহে, কিন্তু ইহাদ্বারা দেশের যাবতীয় অনুৎপাদক মূলধন উৎপাদক অবস্থায় পরিণত হয়। এইরূপে ধনোৎপাদনকার্য্যের সাহায্য করাই পসারের কার্য্য। আবার যদি পসার না থাকিত, অর্থাৎ কাহারও প্রতি কাহারও বিশ্বাস না থাকিত, তাহা হইলে

কেহই অপরের ধন ব্যবহার করিয়া উহা হইতে ধনোৎপাদন করিতে পারিতনা। সকলকেই অল্পই হউক বা অধিকই হউক কেবল নিজ নিজ মূলধন মাত্র ব্যবহার করিতে হইত। কিন্তু অনেক ব্যবসায়ে অধিক মূলধনের প্রয়োজন, অধিক পরিমাণে ধনোৎপাদন করিতে হইলে অধিক মূলধনের আবশ্যকতা, কিন্তু একজন দ্বারা কখনই তত অধিক মূলধন সংগৃহীত হইতে পারিতনা, কাজেই বড় বড় কারবারে কেহই হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। কিন্তু পসার থাকাতে এক ব্যক্তি আবশ্যকমত পরের মূলধন ব্যবহার করিতে পারে, সুতরাং লোকে অনায়াসেই নিজের মূলধন অল্পমাত্র থাকিলেও ঋণ করিয়া নিজ নিজ কারবার বিস্তৃত করিতে সমর্থ হয়। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে পসার দ্বারা মূলধনের উৎপাদিকা শক্তির ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আবার যদি পসার না থাকিত তাহা হইলে সকলকেই কেবল নিজ নিজ মূলধন স্বয়ংই ব্যবহার করিতে হইত, কেহই অপরকে ধার দিতে চাহিত না। কিন্তু সকলেই কিছু ব্যবসাদার হইতে পারেনা, টাকা ধার দিয়া সুদ খাওয়াই অনেকের কার্য্য, সুতরাং এইরূপ হস্তান্তর হইয়া যত টাকা ধনোৎপাদনকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে পসার না থাকিলে তৎসমুদয় সম্পূর্ণরূপে অনুৎপাদক অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। কিন্তু পসার থাকাতে লোকে অপরকে ধার দিতে পারিতেছে, অপরে উহা লইয়া উৎপাদনকার্য্যে নিয়োজিত করিতেছে, সুতরাং উহা অনুৎপাদক অবস্থায় না থাকিয়া উহা দ্বারা ধনোৎপাদন হইতেছে। আবার ব্যাঙ্কের সংস্থাপন হওয়াতে ঐরূপ ঋণ-প্রদান-কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ইহাদ্বারা কাহাকেও নিজ নিজ দৈনিক ব্যয়ের উপযুক্ত অপেক্ষা অধিক ধন নিজের নিকটে রাখিতে হয়না, সকলেই অতি অল্পমাত্র

অর্থ নিজের নিকট রাখিয়া বাকী কোন ব্যাঙ্কে জমা দেয়, ইহাতে কিছু কিছু সুদও পায়, ও আবশ্যকমত ব্যাঙ্কের নিকট দাওয়া করিবামাত্র পাইয়া থাকে। এই প্রকারে ব্যাঙ্কে যত টাকা জমা হয়, ব্যাঙ্ক তাহার তিন ভাগের এক ভাগ নগদ জমা রাখিয়া বাকী কোন ব্যবসায়ে নিয়োজিত করেন অথবা ব্যবসাদারদিগকে সুদ লইয়া ধার দিয়া থাকেন। সমুদয় সঞ্চিত ধনের তিন ভাগের এক ভাগ উপস্থিত রাখিলেই দিন দিন যত টাকার দাওয়া হয় তাহা মিটিয়া যায়। অতএব বুঝিয়া দেখ ইহাদ্বারা দেশের প্রায় সমুদয় ধনভাগ উৎপাদনকার্য্যে নিয়োজিত হইতেছে কি না? কিন্তু পসার না থাকিলে কেহই ব্যাঙ্ককে ধার দিত না, বা ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখিত না! সুতরাং দেশের ধনভাগের অনেকাংশ অনুৎপাদক অবস্থাতেই পড়িয়া থাকিত। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে পসারদ্বারা ধনোৎপাদন ও ধনবিস্তৃতি উভয়েরই সাহায্য হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত প্রকারে ধনের উৎপত্তি ও বিস্তৃতির সাহায্য ভিন্ন পসারের দ্বারা আর একটী মহৎ উপকার হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইহাদ্বারা বিনিময়ক্রিয়াও বিশেষ সুবিধা হয়। পসার দ্বারা যেরূপ ধার করিতে পারা যায়, সেইরূপ অর্থ না দিয়াও ক্রয় করিতে পারা যায়, সুতরাং পসার যেরূপ ধার করিবার ক্ষমতাস্বরূপ সেইরূপ আবার ইহা ক্রয় করিবার ক্ষমতাস্বরূপ ও বটে। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে পসারদ্বারা অর্থের সকল কার্য্যই চলিয়া যাইতে পারে, ফলতঃ সমুদয় ব্যবসায়েরই উন্নতি সম্পূর্ণরূপে পসারের উপর নির্ভর করে। পসার অর্থের প্রতিনিধিস্বরূপ। অর্থের পরিবর্ত্তে যেরূপ তাবৎ দ্রব্যই পাওয়া যায়, সেইরূপ পসারের পরিবর্ত্তেও তাবৎ সামগ্রীই পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং অল্পমাত্র অর্থ লইয়াও পসারের সাহায্যে বড় বড় কারবার চালান যাইতে পারে।

যখন কোন ব্যক্তি পসার দ্বারা অন্যের নিকট অর্থ ধার লয়, তখন যে ব্যক্তি অন্যের পসারের উপর নির্ভর করিয়া অপরকে অর্থ ধার দেয় সে গ্রহীতার নিকট প্রতিশোধ করিবার অঙ্গীকারপত্র লেখাইয়া লইয়া থাকে। এইরূপ ধার প্রতিশোধ দিবার অঙ্গীকারপত্র নানা প্রকারের হইতে পারে, কিন্তু সকল গুলিই পসারের কার্য্য, সুতরাং ঐ সকল পত্রাদিকে পসারের ভিন্ন ভিন্ন আকার বলিলেও বলা যাইতে পারে। উপরি উল্লিখিত প্রকার পসারের বিনিময়ে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হইলে ক্রয়ের সময় বিক্রেতাকে কিছুই টাকা দিতে হয় না, আর ক্রেতা ও বিক্রেতার পরস্পর দেনা নেনা থাকিলে কাহাকেও অপরকে টাকা দিতে হয়না, উভয়ের দেনা পাওনা কাগজে কাগজেই পরিশোধ হইয়া যায়, কেবল কাটিয়া যাইবার পর যাহা কিছু অধিক দেনা পড়ে, তাহাকে ঐ অধিক দেনাটীমাত্র দিতে হয়। পসার যে যে আকারে প্রচারিত হইয়া থাকে এক্ষণে তাহাদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখপূর্ব্বক কাহার দ্বারা কিরূপ উপকার হইয়া থাকে তাহা বিশেষরূপে বর্ণিত হইতেছে। ১ খাতায় খাতায় দেনা পাওনা। ২ বিল অফ একসচেঞ্জ বা বরাত চিঠি, ৩ ব্যাঙ্কনোট। ৪ চেক্। ৫ হুণ্ডি।

১।—খাতায় খাতায় দেনা পাওনা। মনে কর শশিভূষণ ও পদ্মচন্দ্র উভয়েরই পরস্পর কারবার আছে। পদ্মচন্দ্র কাগজ ও পুস্তকের কারবার করেন ও শশিভূষণের মুদ্রাযন্ত্র আছে, ঐ ছাপাখানায় শশিভূষণের পুস্তক ছাপা হয়। পদ্মচন্দ্র শশিভূষণের নিকট পুস্তক লয়েন ও শশিভূষণ পদ্মচন্দ্রের নিকট কাগজ ও কালি লয়েন, পদ্মচন্দ্র শশিভূষণের নিকট ক্রেডিটে মাল লয়েন, শশিভূষণ ও পদ্মচন্দ্রের নিকট ক্রেডিটেই লয়েন। এস্থলে পদ্মচন্দ্র ও শশিভূষণ ইঁহাদের উভয়ের কেহই কাহাকেও

নগদ টাকা দেন না, কেবল প্রত্যেকে আপন আপন খাতায় অপরের নামে জমাখরচ করিয়া লয়েন। বৎসরের শেষে হিসাব মিটাইবার সময় উভয়েই পরস্পরের হিসাব কুজু দিয়া দেনা পাওনা কাটাইয়া দেন। যদি উভয়েরই দেনা ও পাওনা দুইই ঠিক সমান হয়,তাহা হইলে কাহাকেও এক পয়সাও নগদ দিতে হয় না। কিন্তু যদি কাহারও কিছু ফাজিল দেনা হয়, তাহা হইলে তাহাকে ঐ ফাজিল দেনামাত্র নগদ টাকায় পরিশোধ করিতে হয়। অথবা তাহাও না করিয়া নূতন শনের খাতায় জের টানিয়া রাখিয়া দেওয়াও চলিতে পারে। সুতরাং এরূপ হইলে পরস্পর কিছুই টাকা না দিয়াও কারবার চালান যাইতে পারে। এরূপস্থলে দ্রব্যের বদলে দ্রব্য লওয়া হয় বলিলেও একপ্রকার বলা যায়।

২।—পরস্পরের দেনা পাওনা থাকিলেও কেবল বিল অব্ একস্‌চেঞ্জ দ্বারাই দেনা শোধ করা যাইতে পারে। বিল অব্ একস্‌চেঞ্জ কাহাকে বলে, কি প্রকারে উহাদ্বারা দেনা শোধ করা যাইতে পারে, কিরূপে বিল অর্থের প্রতিনিধিস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এই সমুদয় বিষয় পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে সবিস্তরে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব এস্থলে উহার আর পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই, তবে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, যে যদি কাহারও অন্যের সহিত বিশেষ পরিচয় না থাকা প্রভৃতি কারণে তাহার বিল লইতে কোন রূপ আপত্তি থাকে তাহা হইলে সে ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে এমত কোন ব্যাঙ্কের দ্বারা উহা এনডর্স অর্থাৎ স্বাক্ষর করাইয়া লইতে পারে। এরূপ হইলে ঐ ব্যাঙ্ক ঐ বিলের যামিন স্বরূপ হয়েন, অর্থাৎ যাহার বিল সে নিয়মিত সময়ের মধ্যে টাকা না দিলে ব্যাঙ্ককে ঐ টাকা দিতে হয়। যে ব্যক্তি বিল

লয়েন তিনি আবার টাকা লইয়া অন্যকে ঐ বিল বিক্রয় করিতে পারেন, বিক্রয় করিবার সময় ঐ বিলের পৃষ্ঠে বিক্রেতাকে এনডর্স করিয়া দিতে হয়। এইরূপে এনডর্স হইতে ঐ বিল অনেক হাত ফিরিয়া যাইতে পারে ও উহাদ্বারা অর্থের কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে থাকে।

৩। যদি কোন ব্যাঙ্ক আপন পসার অর্থাৎ সম্ভ্রমের [ক্রেডিটের] উপর অন্যের নিকট টাকা ধার লয়েন, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক টাকা দিবার যে অঙ্গীকার পত্র দেন তাহার নাম নোট। ব্যাঙ্কনোট ও বিল এই উভয়ের পরস্পর প্রভেদ এই যে ব্যাঙ্কনোটের অঙ্গীকৃত টাকা দাওয়া করিবামাত্র দিতে হয়, কিন্তু বিলের টাকা কোন নির্দ্ধারিত সময়ে দিবার অঙ্গীকার করিতে হয়। আবার ব্যাঙ্কনোটের কতকগুলি এরূপ বিশেষ গুণ আছে, যাহা বিল অর এক সচেক্সের থাকিতে পারেনা। সকল দেশেই এক একটী রাজকীয় ব্যাঙ্ক থাকে, অর্থাৎ দেশের গবর্ণমেন্টই সেই সেই ব্যাঙ্কের প্রতিভূ। ঐ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক প্রচারিত নোটের টাকা ব্যাঙ্ক না দিলে উহা গবর্ণমেন্টকে দিতে হয়। ইংলণ্ডের রাজকীয় ব্যাঙ্কের নাম ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক। আমাদের দেশের রাজকীয় ব্যাঙ্কের নাম বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক। গবর্ণমেন্ট প্রতিভূ হওয়াতে এইরূপ ব্যাঙ্কের নোট আইনানুসারে অবিকল টাকা স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেরূপ টাকার পরিবর্ত্তে সকল দ্রব্যই পাওয়া যায়, সেইরূপ বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের নোটের বিনিময়ে তাবৎ দ্রব্যই পাওয়া গিয়া থাকে। আমাদের দেশে এক্ষণে ৫ টাকা পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ক নোট প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু রাজার চিহ্নিত ব্যাঙ্কব্যতিরিক্ত দেশে অন্যান্য যে সকল ব্যাঙ্ক থাকে, তাহাদিগের প্রচারিত নোট টাকার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় না। রাজার চিহ্নিত ব্যাঙ্ক সকল নোট প্রচারণ বিষয়ে একটী

নিয়মের অধীন। অর্থাৎ ইহাদের সোণারূপায় যত টাকার সঙ্গতি থাকে ইহারা তদপেক্ষা অধিক টাকার নোট বাহির করিতে পারে না। কারণ দাওয়া করিবামাত্র ইহাদিগকে সমুদায় নোটেরই টাকা দিতে হয়,সুতরাং সঙ্গতির অপেক্ষা অধিক টাকার নোট বাহির করিলে কি প্রকারে সমুদায় দাওয়ার টাকা দেওয়া সম্ভব হইতে পারে? দাওয়ার টাকা দিতে না পারিলে ব্যাঙ্কের সম্ভ্রম নষ্ট হইয়া যায়। সে যাহা হউক, পরীক্ষাদ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে যে ব্যাঙ্কে যত টাকার নোট বাহির হয়, সেই টাকার তিন ভাগের এক ভাগ সর্ব্বদাই মজুদ রাখিলেই সমুদায় দাওয়াই মিটান যাইতে পারে; সুতরাং ব্যাঙ্ক এইরূপ এক ভাগ দৈনন্দিন দাওয়া মিটাইবার জন্য মজুদ রাখিয়া বাকী নানাপ্রকার ধনোৎপাদন কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া থাকেন।

৪। বিল অব একস্চেঞ্জ ও ব্যাঙ্কনোট এই দুই আকারে দেশের পসার যেরূপ অর্থের প্রতিনিধি স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে,চেকও অবিকল সেই প্রকারে অর্থের কার্য্য করে। লোকে নিজ নিজ অর্থ নিরাপদে রাখিবার নিমিত্ত ও সুদ পাইবার উদ্দেশে কোন না কোন ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া থাকে ও আবশ্যকমত চিঠি কাটিয়া ঐ টাকা হইতে যত প্রয়োজন হয় ফেরত লইয়া থাকে। মনে কর শশিভূষণের বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে ১০০০০ টাকা জমা আছে। ব্যবসায়সূত্রে শশিভূষণের নীলমণিকে ৫০০ টাকা দিবার প্রয়োজন হইল। এস্থলে শশিভূষণ বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে চিঠি লিখিয়া জমা ১০০০০টাকা হইতে ৫০০টাকা ফেরত আনিয়া নীলমণিকে দিতে পারেন। কিন্তু এরূপ করিয়া টাকা ফেরত আনিয়া দেওয়া তাদৃশ সুবিধার নহে। সুতরাং শশিভূষণ ওরূপ না করিয়া নীলমণির মারফত ব্যাঙ্ককে এই বলিয়া পত্র লিখিয়া দেন যে নীলমণি বা তাঁহার প্রেরিত লোককে অথবা

পত্রবাহককে পত্রপাঠ মাত্র ৫০০ টাকা দিবে। নীলমণি ঐ চিঠি ব্যাঙ্কে পাঠাইলেই উক্ত টাকা পাইয়া থাকেন। এইরূপে ব্যাঙ্কের উপর লিখিত পত্রকে চেক কহে। যে ব্যক্তিকে চেক দেওয়া হইল তাহার হয় ত নগদ টাকার প্রয়োজন না হইতেও পারে। হয় ত সে ব্যক্তি ঐ চেক যে ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটা হইয়াছে বা অন্য যে কোন ব্যাঙ্কে তাহার হিসাব আছে তথায় আপন নামে জমা করিয়া দেয়। অথবা নাম এনডর্স করিয়া অন্য কাহা-কেও দেয়, সে আবার আপন নাম এনডর্স করিয়া অপর এক ব্যক্তিকে দেয়। এইরূপে বিল ও নোটের ন্যায় চেকও অনেক হাত ফিরিয়া টাকার কার্য্য করিতে পারে। ফলতঃ ব্যাঙ্কের নিকট যত টাকার চেক আইসে, তাহার তিন ভাগের এক ভাগ নগদ মজুদ রাখিলেই সমুদায় দাওয়া মিটান যাইতে পারে।

পসার বিল, নোট, চেক, হুণ্ডী প্রভৃতি নানাবিধ আকারে যেরূপে অর্থের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা বর্ণিত হইল। এক্ষণে উহা অর্থের প্রতিনিধি স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া দ্রব্যাদির মূল্যের প্রতি কিরূপ কার্য্য করে তাহা বিবেচিত হইতেছে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, যে সকল ব্যবসায়ে অধিক টাকার মাল একত্র বিক্রীত হইয়া থাকে, সেইরূপ তাবৎ হোলসেল কারবারই বিলের দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। অর্থাৎ যদিও এরূপ স্থলে দ্রব্যাদি অর্থের পরিবর্ত্তে বিক্রীত হয় বটে, কিন্তু উহাদের মূল্য দিবার জন্য নগদ টাকা ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। উহা বিল অব এক্সচেঞ্জ দ্বারাই নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। আবার একখানি বিল অনেক হাত ফিরিয়া অনেকবার টাকার প্রতিনিধিস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। মনে কর, এক ব্যক্তি অপর এক জনের নিকট একখানি ১০০০০ টাকার বিল লইল। সে আবার উহার পৃষ্ঠে নাম এনডর্স করিয়া দিয়া উহা

দ্বারাই অন্যের নিকট মাল খরিদ করিল। আবার এই ব্যক্তিও অন্য এক জন মহাজনের নিকট ঐ বিল দিয়াই মাল লইল। এইরূপে ঐ বিল ভাঙ্গাইবার পূর্ব্বে উহাতে বহুসংখ্যক সহি হইতে পারে। অর্থাৎ একখানি বিল বহুবার অর্থের প্রতিনিধি-স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে প্রতিপন্ন হইতেছে, যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত একখানি বিল হস্তান্তর হইতে থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্তই উহা দ্বারা টাকার কার্য্য সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাহিত হয়। কারণ যদি বিলের ব্যবহার না থাকিত তাহা হইলে উহার পরিবর্ত্তে টাকা দিতে হইত সন্দেহ নাই। উপরে যে ১০০০০ টাকার বিলের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে,তাহা দ্বারা অনেক-বার ১০০০০ টাকার কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। কিন্তু যদি উহার ব্যবহার প্রচলিত না থাকিত, তাহা হইলে এক্ষণে যত বার ঐ বিল খানি হস্তান্তর হইতেছে, তত বারই প্রত্যেকবারে ১০০০০ টাকার প্রয়োজন হইত। কিন্তু উহার ব্যবহার প্রচলিত থাকাতে একবারমাত্র ঐ টাকার প্রয়োজন হয়। আবার অনেক-বার উহা দ্বারা ঐ টাকার কার্য্য হইয়া থাকে। পণ নিরূপণ প্রস্তাবে কথিত হইয়াছে, যে যদি কোন দ্রব্যের সর্ব্বরাহ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে উহার সহিত তুলনায় অন্যান্য তাবৎ দ্রব্যের মূল্যই কমিয়া যায়। মনে কর, অর্থ ভিন্ন অন্যান্য তাবৎ দ্রব্যেরই সর্ব্বরাহ অধিক পরিমাণে বাড়িয়া উঠিল। কেবল টাকার সর্ব্বরাহ যেরূপ ছিল তাহাই রহিল। এরূপ হইলে অর্থের সহিত তুলনায় অন্যান্য সমুদায় দ্রব্যেরই মূল্য কমিয়া যাইবে। অর্থাৎ অন্যান্য দ্রব্যের সহিত তুলনায় অর্থের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া উঠিবে। সুতরাং এরূপ হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প অর্থে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দ্রব্য বিক্রয় হইতে থাকিবে, ও ইহাতে ব্যবসায়ের ক্ষতি হইয়া উঠিবে। এই অসু-

বিধা নিবারণ করিতে হইলে টাকার সর্ব্বরাহ পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়াইতে হইবে। অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকা মুদ্রিত করিতে হইবেক। কিন্তু সোণা রূপা অতিশয় দুষ্প্রাপ্য পদার্থ, ইচ্ছা করিলেই উহার সর্ব্বরাহ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে না। সুতরাং এই অসুবিধা নিবারণের নিমিত্ত পসারই বিলের আকারে অর্থের প্রতিনিধিস্বরূপে ব্যবহৃত হয়। বিলের ব্যবহার হওয়াতে এরূপ স্থলে মুদ্রার সর্ব্বরাহও বাড়াইতে হয় না, ও মুদ্রার সমুদায় কার্য্যই অনায়াসে নির্ব্বাহিত হইয়া যায়। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, যে যদি বিলের ব্যবহার প্রচলিত না থাকিত, তাবৎ ক্রয় বিক্রয়ই অর্থের দ্বারা সম্পাদিত হইত, তাহা হইলে, হয় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থ প্রচারিত করিতে হইত, নতুবা সমুদায় দ্রব্যেরই পণ কমিয়া যাইত। কিন্তু বিলের ব্যবহার প্রচলিত থাকাতে এই দুইয়ের একটিও হইতে পারে না। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, অর্থের প্রতিনিধিস্বরূপে পসারের ব্যবহার হওয়াতে বাণিজ্য কার্য্যের কতদূর সুবিধা হয়। কারণ বিল, নোট প্রভৃতি তাবৎ কাগজই পসারকে কার্য্যে পরিণত করিবার উপায়মাত্র। সুতরাং ইহাদের দ্বারা যে যে কার্য্য হয়, তৎসমুদয়ই পসারের কার্য্য।

আবার বিলের অপেক্ষা ব্যাঙ্কনোটের দ্বারা অধিকতর কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। হোলসেল বিক্রয়েই কেবল বিল ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু ব্যাঙ্ক নোট দ্বারা খুজরা ক্রয় বিক্রয় পর্য্যন্ত সাধিত হয়। আবার বিল অব একস্চেঞ্জের ব্যবহার না থাকিলে, ব্যবসায়ীদিগের খাতায় খাতায় দেনা পাওনা নিকাস হইতে পারিত, টাকা না হইলেও খাতার হিসাবেই কথঞ্চিৎ কার্য্য চলিতে পারিত। কিন্তু যে সকল কার্য্যে নোটের ব্যবহার হয়, নোটের ব্যবহার প্রচলিত না থাকিলে

ঐ সকল কার্য্যে অবশ্যই টাকার প্রয়োজন হইত। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, যে ব্যাঙ্ক হইতে যত টাকার নোট বাহির হয়, তাহার তিন ভাগের এক ভাগ নগদ মৌজুদ রাখিলেই তাবৎ দাওয়াই মিটান যাইতে পারে। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, কোন একখানি নোট যত দিন ঘুরিতে থাকে, তত দিন উহা দ্বারা উহার মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশ অন্য কার্য্যে ব্যবহার করিয়া লাভ করা যায়; এবং উহা দ্বারাও উহা যত টাকা মূল্যের তত টাকারই কার্য্য চলিয়া যায়। মনে কর, বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক হইতে প্রতি বৎসর ত্রিশ কোটি টাকার নোট বাহির হয়, অতএব পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অনুসারে প্রতিপন্ন হইতেছে, যে নোট প্রচারিত আছে বলিয়া এস্থলে উহা দ্বারা অতিরিক্ত ২০,০০০০০০০ টাকার কার্য্য চলিতেছে। যদি নোটের প্রচার না থাকিত, তাহা হইলে এক্ষণে যত টাকার মুদ্রা প্রস্তুত আছে, তাহার উপর অধিক ২০ কোটি টাকার মুদ্রা প্রস্তুত করিতে হইত। না করিলে অর্থ দুর্মূল্য হইয়া উঠিত ও উহার সহিত তুলনায় অন্যান্য তাবৎ দ্রব্যেরই মূল্য কমিয়া যাইত। অর্থাৎ সমুদয় দ্রব্যের পণ পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইয়া উঠিত। কিন্তু এক্ষণে প্রতি বৎসর যত টাকার নোট বাহির হইয়া থাকে, যদি হঠাৎ তাহা অপেক্ষা অধিক টাকার নোট বাহির করা যায়, তাহা হইলে দ্রব্যাদির মূল্য কিরূপ থাকে? অধিক অর্থের প্রচার হইলে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত তুলনায়, অর্থের মূল্য কমিয়া যায়, ও অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া উঠে। কিন্তু যদি যত অধিক টাকার নোট বাহির করা হয়, সোণারূপায় তত টাকার মুদ্রার প্রচার বন্ধ করা যায়, তাহা হইলে দ্রব্যের মূল্য যেরূপ ছিল তাহাই থাকে, বাড়িয়া উঠিতে পারে না। কারণ এরূপ স্থলে যেমন এক দিকে অর্থের প্রতিনিধি বাড়িয়া উঠিয়াছে, তেম-

নই অপর দিকে মুদ্রা কমিয়া যাইতেছে, সুতরাং অর্থের প্রচার একরূপ থাকিয়া যায় ও দ্রব্যাদির মূল্য ও পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া উঠিতে পারে না।

উপরে যেরূপ নোটের বিষয় লিখিত হইত, ঐ নোটের পরিবর্ত্তে দাওয়া করিবামাত্র ব্যাঙ্ককে টাকা দিতে হয়। রাজ-চিহ্নিত ব্যাঙ্ক আপন নোটের পরিবর্ত্তে সোণারূপায় টাকা দিতে বাধ্য, আর অন্যান্য ব্যাঙ্ক আপন আপন নোটের পরিবর্ত্তে দাওয়া করিবামাত্র রাজচিহ্নিত ব্যাঙ্কের প্রচারিত নোট বা সোণারূপার মুদ্রা দিতে বাধ্য। কিন্তু এইরূপ নোট ভিন্ন আর এক প্রকার নোট প্রচারিত হইতে পারে, ইহাদের পরিবর্ত্তে ব্যাঙ্ক সোণারূপার টাকা দেন ও না, দিতে বাধ্যও নহেন। বিশেষ দুঃসময় উপস্থিত হইলে গবর্ণমেন্ট এইরূপ নোট বাহির করিতে পারেন। এইরূপ নোট বাহির করাতে দেশের কার্য্য চলিয়া যায় ও সোণারূপার টাকা অন্যান্য কার্য্যে ব্যয়িত হইতে পারে। আমাদের দেশে এরূপ নোটের প্রচার নাই। ইংলণ্ড দেশে ১৭৯৭ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮১৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এইরূপ নোট প্রচারিত হইয়াছিল। আমেরিকার অন্তর্গত ইউনাইটেড্ ষ্টেট প্রদেশে যখন ক্রীতদাস ব্যবহারের প্রথা রহিত করিবার জন্য গৃহযুদ্ধ হইয়াছিল, তখন তথায় এরূপ নোট প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ নোট রাজচিহ্নিত ব্যাঙ্কের নোটের ন্যায় যদি অবিকল টাকার প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহার করিবার আইন হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের লাভ হয় বটে, কিন্তু ঐরূপ নোটের গ্রাহকদিগের বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়া থাকে। অতএব এরূপ করা গবর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য নহে। আর এরূপ নোট অধিক দিন প্রচারিত রাখাও অকর্ত্তব্য, ইহাতে দেশের অমঙ্গল ভিন্ন আর কিছুই হয় না। অতএব বিশেষ দুঃসময় উপস্থিত না

হইলে আর এরূপ নোট বাহির করা কোন মতেই বিধেয় নহে!

ব্যাঙ্কনোটের ন্যায় চেকের দ্বারাও অর্থের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, সুতরাং যদি চেকের ব্যবহার প্রচলিত না থাকিত, তাহা হইলে হয়, মুদ্রা বাড়াইতে হইত, নতুবা সমুদয় দ্রব্যেরই মূল্য কমিয়া যাইত। কিন্তু চেকের ব্যবহারদ্বারা মুদ্রা না বাড়াইয়াও অনায়াসেই উহার কার্য্য চলিয়া যাইতেছে। এক্ষণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে পসারদ্বারা সমাজের কত উপকার হইয়া থাকে। পসারের ব্যবহার না থাকিলে বাণিজ্যাদি কার্য্যের কতই অসুবিধা হইত তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

পসারদ্বারা আর একটী উপকার হয়। অর্থাৎ উহাদ্বারা লোকের ক্রয় করিবার ক্ষমতাবৃদ্ধি হয়, ক্রয় করিবার ক্ষমতাবৃদ্ধি হইলেই আবার দ্রব্যাদির প্রয়োজনবৃদ্ধি হইয়া উঠে, ও ক্রমশঃ বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে।

ক্রয় বিক্রয় ব্যবসায়ে পসার শব্দের অর্থ যেরূপ বিশ্বাস, অন্যান্য তাবৎ ব্যবসায়েই পসারের অর্থ সেইরূপে বিশ্বাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। চিকিৎসক উকীল প্রভৃতির প্রতি লোকের বিশ্বাস বৃদ্ধি হইলেই লোকে তাহাদিগকে কার্য্যের পরিবর্ত্তে টাকা দিতে অধিকতর ইচ্ছুক হইয়া থাকে। সুতরাং পসার বাড়িলেই তাবৎ ব্যবসায়েরই আয় বৃদ্ধি হয় ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিনিময়—সুদ।

অপরের অর্থ ব্যবহার করিতে হইলে উহা পরিশোধ করিবার সময় আসলের উপর কিঞ্চিৎ অধিক দিতে হয়, এই বৃদ্ধিকে কুসীদ বা সুদ কহে। অধমর্ণ উত্তমর্ণের অর্থ ব্যবহারপূর্ব্বক ব্যবসায়াদি করিয়া লাভ করিয়া থাকে, অথবা যে কোন প্রকারে হউক উপকৃত হইয়া থাকে, সুতরাং ঐ ব্যবহারের

মূল্যস্বরূপ অধমর্ণ আপন লাভ হইতে কিছু অংশ উত্তমর্ণকে দেয়। ইহারই নাম সুদ।

লাভের পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে, যে লাভের তিনটী অঙ্গ, সম্ভাবিত ক্ষতির পূরণ, তত্ত্বাবধান শ্রমের বেতন, ও মূলধনের সুদ। মূলধনের সুদ আবার সঞ্চয়ক্লেশের পুরস্কার স্বরূপ। সকলদেশেই এরূপ কতকগুলি ব্যক্তি বা কোম্পানি থাকে যাহাদের নিকট টাকা জমা রাখিলে উহা নিরাপদ থাকে, উহা বিনষ্ট হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং এইরূপে টাকা জমা রাখিলে যে সুদ পাওয়া যায়, তাহাই সঞ্চয়ক্লেশের পুরস্কারস্বরূপ পাওয়া যায় বলিতে হইবে, কারণ ইহাতে তত্ত্বাবধানশ্রম বা ক্ষতিসম্ভাবনা কিছুই নাই। এই সুদকে দেশের সুদের চলিত হার কহে। আমাদের দেশে গবর্ণমেন্টকে টাকা ধার দেওয়া যায়। গবর্ণমেন্টকে টাকা ধার দিলে উহা ক্ষতি হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না। আমাদের দেশে গবর্ণমেন্টকে টাকা ধার দিলে শতকরা ৪ টাকা হইতে ৪॥০ টাকা পর্য্যন্ত সুদ পাওয়া যায়, সুতরাং ইহাই আমাদেশে সুদের চলিত হার। ইংলণ্ডে সুদের চলিত হার শতকরা ৩ টাকা। প্রত্যেক দেশেই সুদের চলিত হার এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট। যেমন আমাদের দেশে ৪ টাকা হইতে ৪॥০ টাকা ও ইংলণ্ডে ৩ টাকা। তবে কখন কখন ইহা অপেক্ষা বাড়িয়া উঠে, আবার কখন বা কমিয়া যাইতেও পারে। কিন্তু কমিয়া যাইলেও কিছুকাল ঐরূপ থাকিয়া আবার বাড়িয়া উঠিয়া ঐ নির্দ্দিষ্ট হারে পরিণত হয়, আবার বাড়িয়া উঠিলেও আবার কিছুদিন পরে কমিয়া কমিয়া ঐ নির্দ্দিষ্ট হারে উপস্থিত হয়। দেশে যত অর্থ নির্দ্দিষ্ট হারে ধার দিবার উপযুক্ত থাকে তদপেক্ষা ধার লইবার আবশ্যকতা অধিক হইলেই সুদের হার

বৃদ্ধি হয়। আবার ধার লইবার প্রয়োজন অপেক্ষা নির্দ্দিষ্ট হারে ধার দিবার উপযুক্ত অর্থ অধিক হইলেই সুদের হার কমিয়া যায়। কিন্তু কমিয়াই যাউক, আর বাড়িয়াই উঠুক সুদের হার সর্ব্বদাই ঐ নির্দ্দিষ্ট হারের দিকে ধাবমান, অর্থাৎ কমিয়া যাইলে আবার বাড়িয়া উঠে, ও বাড়িয়া উঠিলে আবার কমিয়া গিয়া ঐ নির্দ্দিষ্ট হারে পরিণত হইয়া থাকে। মনে কর ধার লইবার প্রয়োজন বাড়িয়া উঠাতে টাকার সুদ নির্দ্দিষ্ট হারের অপেক্ষা বাড়িয়া উঠিল, সুতরাং এরূপ হইলে সকলকেই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুদে ধার লইতে হইবেক। কিন্তু অধিক সুদে ধার লওয়াতে ব্যবসায়ের লাভ পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যাইবে। কাজেই কিছুকাল এইরূপ চলিলে সকলেই ধার লওয়া পূর্ব্বাপেক্ষা কমাইতে থাকিবে, ও গ্রহীতার সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যাইবে। গ্রহীতার সংখ্যা কমিয়া যাইলেই ধার দিবার উপযুক্ত অর্থ ধার লইবার প্রয়োজন অপেক্ষা বাড়িয়া উঠিবে। কাজে কাজেই কিছুদিন পরে টাকার সুদ আবার কমিয়া যাইবে, নতুবা গ্রাহক সংখ্যা কমিয়া যাওয়াতে অনেক টাকা বৃথা পড়িয়া থাকিবে। আবার মনে কর দেশে ধার লইবার যেরূপ প্রয়োজন আছে, তদপেক্ষা ধার দিবার উপযুক্ত অর্থ অধিক হইয়া উঠিল। এরূপ হইলে টাকার সুদ পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যাইবে। কারণ এরূপ অবস্থায় অল্প সুদে না পাইলে কেহই ধার লইতে সম্মত হইবে না, কাজেই ধনীদিগকে টাকা খাটাইবার জন্য উহার সুদ কমাইয়া দিতে হইবেক। কিন্তু কিছুদিন এইরূপ থাকিলে অল্পসুদে ধার পাওয়া যায় বলিয়া অনেকেই ধার লইতে প্রবৃত্ত হইবেক, সুতরাং কিছুদিনের মধ্যেই ধার দিবার উপযুক্ত অর্থ অপেক্ষা ধার লইবার প্রয়োজন বর্দ্ধিত হইবেক। কাজেই আবার ক্রমে টাকার সুদ বাড়িতে

থাকিবেক ও বাড়িতে বাড়িতে ক্রমে আবার নির্দ্দিষ্ট হারে উপস্থিত হইবেক। উপরে যাহা কথিত হইল তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে ধার দিবার উপযুক্ত মূলধন ও ধার লইবার প্রয়োজন এই উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ অনুসারেই সুদের হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রয়োজন অপেক্ষা অর্থ অধিক হইলে সুদ কমিয়া যায়, ও অর্থ অপেক্ষা প্রয়োজন অধিক হইলেই সুদ বাড়িয়া উঠে। কিন্তু সকল দেশেই সুদের চলিত হার প্রায় স্থিরভাবে একরূপই থাকে, অধিক দিনেও উহার অল্পমাত্র পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে দেশে ধার দিবার উপযুক্ত অর্থ যত পরিমাণে থাকে, ধার লইবার প্রয়োজন ও প্রায় সর্ব্বদাই তাহার সমান থাকে। সুতরাং সুদের হার কমিতেও পায়না, বাড়িতেও পায়না। একভাবে প্রায় নিশ্চলই থাকিয়া যায়, তবে কোন কারণে যদি কখন বাড়িয়া উঠে, তাহা হইলে আবার কমিয়া যায়, আবার যদি কমিয়া যায়, তাহা হইলে আবার বাড়িয়া উঠে। ফলতঃ ইহা একটী প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, সকল দেশেই ধার দিবার উপযুক্ত অর্থ এরূপ পরিমাণে থাকে যে উহাদ্বারা তথাকার ধার লইবার প্রয়োজন ঠিক কুলাইয়া যায়। এই জন্য সকল দেশে সুদের এক একটী নির্দ্দিষ্ট হার থাকে, উহাকেই সুদের চলিত হার কহে। এই জন্যই টাকার সুদ সর্ব্বদাই ঐ চলিত হারের অভিমুখে ধাবমান।

উপরি উল্লিখিত নিয়মটী বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে কি কারণে ভিন্ন ভিন্ন দেশে সুদের হার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে। হলণ্ডদেশের অপেক্ষা ইংলণ্ডে সুদের হার অধিক। ইহার কারণ হলণ্ডের অধিবাসীরা ইংলণ্ডীয়দিগের অপেক্ষা অধিক মিতব্যয়ী। ইংলণ্ডের অপেক্ষা অল্প ব্যয় করিলেও হলণ্ডদেশে স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ হইয়া থাকে। সুতরাং ইংলণ্ডীয়েরা

যেরূপ আশ্বাস পাইলে ব্যয় সংযমক্লেশ সহ্য করিয়া অর্থসঞ্চয় করিতে সম্মত হইতে পারে, ওলন্দাজেরা তদপেক্ষা অল্প আশ্বাস পাইলেই সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা শতকরা ২ টাকা সুদ পাইলেই যেরূপ সন্তুষ্ট, ইংরাজেরা শতকরা ৩ টাকা না পাইলে আর সেরূপ সন্তুষ্ট হয় না। এই জন্যই ইংলণ্ডদেশে সুদের চলিত হার হলণ্ড অপেক্ষা অধিক। অতএব বোধ হইতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিবাসীদিগের প্রকৃতিগত বিভিন্নতাই সুদের হার ভিন্নপ্রকার হইবার অন্যতম কারণ। আবার যে দেশে রাজশাসন সুশৃঙ্খল নহে, যেখানে ধনসম্পত্তি সুখে ভোগ করিবার সম্ভাবনা নাই তথায় অন্যান্য সুশাসিত রাজ্য অপেক্ষা সুদের হার অধিক হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের সাম্রাজ্য কালে প্রজারা নিরাপদে আপন আপন সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিত না। পাছে মুসলমানেরা অপহরণ করিয়া লয় এই ভয়ে সকলেই সাধ্যানুসারে আপন সম্পত্তি গোপন করিয়া রাখিত। কাজে কাজেই তৎকালে বিলক্ষণ অধিক সুদ না পাইলে আর কেহই কাহাকেও টাকা ধার দিতে সম্মত হইত না। এই জন্যই তৎকালে ভারতবর্ষে ইংলণ্ড অপেক্ষা সুদের হার অধিক ছিল। এক্ষণে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের অধীনে ধনসম্পত্তি নিরাপদ হওয়াতে সুদের হার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু অভ্যাস হইয়া গিয়াছে বলিয়া অদ্যাপি ইংলণ্ড অপেক্ষা আমাদের দেশে সুদের হার কিঞ্চিৎ অধিক রহিয়াছে। আবার যখন কোন দেশে যুদ্ধবিগ্রহাদি কারণে শান্তিভঙ্গ উপস্থিত হয়, তখন তথাকার সুদের হার বাড়িয়া উঠে। যখন বিলাতের সহিত ফরাসীদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল তখন তথায় শতকরা ৭ টাকা করিয়া সুদের হার হইয়াছিল। আমাদের দেশেও ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, সেই সময়ে কোম্পানীর কাগজের দর কমিয়া যায় ও সুদের হার বাড়িয়া উঠে। টাকার দর কমিয়া যাইলেই সুদ বাড়িয়া উঠে। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে কোন কারণেই, হউক টাকা ধার দিয়া ক্ষতির সম্ভাবনা অধিক হইলেই সুদের হার অধিক হয়, আর ক্ষতির সম্ভাবনা অল্প হইলেই সুদের হার কমিয়া যায়। এই জন্যই গবর্ণমেন্টের সুদ অপেক্ষা অন্যান্য ব্যক্তিকে ধার দিলে অধিক সুদ লওয়া যায়। আবার

এই কারণেই দ্রব্যাদি বন্ধক রাখিয়া ধার লইলে যে সুদ দিতে হয়, শুধু হাতে লইলে তদপেক্ষা অধিক সুদ দিতে হয়।

যখন কোন ব্যবসায়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ হইতে থাকে তখন ঐ ব্যবসায়ের নিমিত্ত টাকা ধার লইলে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুদ দিতে হয়। কারণ এরূপ হইলে ব্যবসায়ীরা আপন কারবার বাড়াইয়া অধিক লাভ করিবার প্রত্যাশায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুদে টাকা লইতে প্রবৃত্ত হয়। অর্থাৎ ধার দিবার প্রয়োজন অপেক্ষা ধার লইবার প্রয়োজন বাড়িয়া উঠে। সুতরাং সুদও বাড়িয়া যায়। এই কারণে অষ্ট্রেলিয়া দেশে ইংলণ্ড বা ভারতবর্ষ অপেক্ষা সুদের হার অনেক অধিক, কারণ তথায় ইংলণ্ড বা ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিক লাভ হইয়া থাকে। এইরূপ যখন লাভের হার কমিয়া যায় তখন সুদের হারও তদনুসারে কমিয়া থাকে। সুদের চলিত হার অধিক হইলেই অন্যান্য প্রকার সুদও বাড়িয়া উঠে, আবার উহা কমিয়া যাইলে অন্যান্য সুদও কমিয়া যায়।

যাহারা ধার শোধ করিবার জন্য বা অন্য কোন প্রকারে ধনোৎপাদন ভিন্ন অন্য কারণে টাকা ধার লইয়া থাকে, তাহাদিগকে ধনীর ইচ্ছানুরূপ সুদ দিতে হয়। ইহার কারণ এই যে, ধনোৎপাদনকার্য্যে নিয়োজিত করিলে টাকা যত দূর নিরাপদ থাকিত, ওরূপে ব্যয় করিলে তাহা থাকে না। সুতরাং অধিক সুদ ভিন্ন কেহই ধার দিতে চাহে না।

যখন কোন দেশে সুদের চলিত হার পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া উঠে, তখন তথাকার জমির দর পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যায়। কারণ এরূপ স্থলে জমি ব্যবহার পূর্ব্বক ধনোৎপাদন করিতে হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুদে টাকা লইয়া উহাতে ব্যয় করিতে হয়। সুতরাং উৎপাদনব্যয় বাড়িয়া উঠে। উৎপা-

দনব্যয় বাড়িয়া উঠিলেই আবার লাভ কমিয়া যায়, সুতরাং জমি হইতে আর তাদৃশ লাভ হইতে পারে না। কাজে কাজেই এইরূপ সম্ভাবিত লোকসান পোষাইবার জন্য ভূমির দর ও খাজনা উভয়ই পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যায়। কিন্তু যখন সুদের হার আবার কমিয়া যায়, তখন ভূমির দর ও খাজনা উভয়ই পুনর্ব্বার বাড়িয়া উঠিতে থাকে। কারণ এরূপ হইলে উৎপাদনব্যয় কমিয়া যায় ও আবার লাভ বাড়িতে থাকে এবং লাভ বাড়িলেই ভূমির দর ও খাজনা উভয়ই বাড়িয়া উঠে।

চতুর্থ অধ্যায়।

রাজস্ব, রাজকর বা টেক্স।*

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—— ঃ০ঃ——

রাজকরসংস্থাপনের সাধারণ নিয়ম।

প্রজাপালন রাজধর্ম্ম। প্রজাদিগের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা, প্রজাদিগের সর্ব্বতোভাবে সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার উপায় বিধান করাই রাজার কার্য্য। এই সুমহৎ কার্য্য সম্পাদন করিবার বেতনস্বরূপ রাজা প্রজার নিকট যাহা লইয়া থাকেন তাহার নাম কর বা টেক্স। যেরূপ ভূম্যধিকারীরা

* রাজকর রাজার পরিশ্রমের বেতন স্বরূপ। সুতরাং বেতনের পরিচ্ছেদে ইহা বিবেচ্য হইলেও বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বতন্ত্র প্রস্তাবে ইহার বিচার করাই উচিত।

আপন ভূসম্পত্তি অপরকে ব্যবহার করিতে দিয়া ঐ ব্যবহারের পরিবর্ত্তে খাজনা লইয়া থাকেন, যেরূপ শ্রমিকেরা পরিশ্রম দ্বারা ধনোৎপাদনের সাহায্য করিয়া ঐ পরিশ্রমের বেতন লইয়া থাকে, সেইরূপ রাজাও প্রজাদিগের জীবন ও সম্পত্তির রক্ষা করিয়া থাকেন বলিয়া ঐ রক্ষাকার্য্যের বেতনস্বরূপ ট্যাক্স লইয়া থাকেন। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে জমিদারের খাজনা ও শ্রমিকের বেতন দেওয়া যেরূপ সকলেরই কর্ত্তব্য, সেইরূপ রাজাকে করপ্রদান করাও প্রজামাত্রেরই অবশ্য বিধেয়। দেশে রাজশাসন না থাকিলে তত্রত্য অধিবাসীদিগের কিরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। দেশে অরাজক উপস্থিত হইলে, প্রজাদিগকে আপন আপন ধন প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিরন্তর ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়। শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দুর্ব্বলদিগকে বারংবার বাসস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে হয়, অথবা শত্রুহস্তে পতিত হইয়া জীবনসম্পত্তি বিসর্জ্জন দিতে হয়। আর বলিষ্ঠদিগকে শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া হয় ত অতিকষ্টে প্রাণরক্ষা পূর্ব্বক দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া যাবজ্জীবন কষ্ট পাইতে হয়, নতুবা পলায়ন বা জীবন বিসর্জ্জন করিতে হয়। ফলতঃ এরূপ অবস্থায় জীবন কেবল ক্লেশময় ভারস্বরূপ হইয়া উঠে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশে রাজশাসন থাকাতে আমরা কত সুখে জীবন যাপন করিতেছি। আমাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য কিছুমাত্র ব্যয় ও শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিতেছি না। রাজা আমাদিগের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করিবার তাবৎ উপায় স্বয়ং বিধান করিতেছেন। অতএব, জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার পণস্বরূপ রাজাকে কর দান করা প্রত্যেক প্রজারই অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাতে

আর সন্দেহ কি? প্রজাপালন করিতে হইলে নানাপ্রকারে অনেক অর্থব্যয়ের আবশ্যকতা। বিদেশীয় শত্রুর সহিত যুদ্ধবিগ্রহ করিবার জন্য রণতরি ও সৈন্যাদি রাখিতে হয় প্রজাদিগের মধ্যে শান্তিরক্ষার জন্য পুলিস রাখিতে হয়। বিচার করিবার জন্য জজ মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিচারপতি নিযুক্ত করিতে হয়। রাজা যে সকল আইন বিধিবদ্ধ করেন তৎসমুদয় কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অশেষবিধ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হয়। ফলতঃ প্রজাপালনকার্য্যের সর্ব্বপ্রকার উপায়বিধান করিতে হইলে নানাপ্রকার অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন। নতুবা কেবল রাজার ইচ্ছামাত্র দ্বারা কোন কার্য্যই সাধিত হইতে পারে না। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে যাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য রাজার উপরি উল্লিখিত প্রকার বহুবিধ ব্যয়ের ভার নিহিত রহিয়াছে তাহাদিগেরই স্ব স্ব অর্থের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ প্রদান করিয়া উক্ত ব্যয়ের সর্ব্বরাহ করা উচিত। প্রজারা ঐ সমস্ত ব্যয় সর্ব্বরাহ না করিলে রাজা কোথায় অর্থ পাইবেন ও কিরূপেই বা তিনি প্রজাপালন করিতে সমর্থ হইবেন? অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে যে যেরূপ সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে আমাদিগকে অর্থব্যয় পূর্ব্বক আহারসামগ্রী আহরণ করিতে হয়, পরিধেয় বস্ত্র ও অন্যান্য জীবন যাপনোপযোগী দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতেও ব্যয় করিতে হয়, সেইরূপ জীবন ও ধন রক্ষার পণস্বরূপ রাজাকে কর প্রদান করিতে হয়। অতএব গবর্ণমেণ্ট যে আমাদিগের নিকট করস্বরূপে অর্থগ্রহণ করেন, উহা অন্যায় কর্ম্ম বলিয়া মনে করা যৎপরোনাস্তি গর্হিত কার্য্য। কারণ গবর্ণমেণ্ট কেবল স্বার্থসাধনার্থ একরূপে অর্থ সংগ্রহ করেন না, কিন্তু যাহাদিগের অর্থ উহাদিগেরই কার্য্যসাধনার্থ ব্যয় করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে রাজা অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন, আমরা ঐ রক্ষাকার্য্যের বেতনস্বরূপ রাজাকে কর প্রদান করি। কিন্তু অন্যান্য কার্য্যের বেতনের ন্যায় রাজকর প্রদান করা প্রজাদিগের ইচ্ছাধীন নহে। আমরা বেতন বা পণ একেবারে না দিয়া বা অল্পপরিমাণে দিয়া কথঞ্চিৎ কার্য্য চালাইতে সমর্থ হই, কিন্তু সকলকেই রাজকর প্রদান করিতে বাধ্য হইতে হয়। আবার রাজকর কিরূপ পরিমাণে দিতে হইবে ইহা নির্দ্ধারণ করাও প্রজাদিগের কার্য্য নহে। এবিষয়েও রাজারই সম্পূর্ণ প্রভুতা। যতদিন আমরা রাজশাসিত দেশে বাস করি ততদিন আমাদের ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক, আমরা গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক রক্ষিত হই, সুতরাং রাজশাসিত প্রজামাত্রেরই রাজসংস্থাপিত নিয়ম অনুসারে ট্যাক্স দিতে বাধ্য হইতে হয়। যদি এক একটী করিয়া তাবৎ প্রজাই এরূপ মনে করে যে আমি রাজশাসনের সুবিধা গ্রহণ করিতে চাহিনা, আমি ট্যাক্স ও দিবনা, তাহা হইলে দেশে রাজবিদ্রোহ বা অরাজকতা উপস্থিত হইয়া থাকে।

প্রজাদিগের নিকট করগ্রহণ করিতে রাজার সম্পূর্ণ অধিকার আছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কর-সংস্থাপন বা উহার সংগ্রহ বিষয়ে রাজার যথেচ্ছাচার করা কোন মতেই উচিত নহে, কারণ তাহা হইলে প্রজাপালন করা না হইয়া রাজার প্রজাপীড়ন করাই হইয়া থাকে। কিন্তু প্রজাপীড়ন রাজার কার্য্য নহে। অতএব যেরূপ নিয়ম অনুসারে কর ধার্য্য ও সংগ্রহ করিলে প্রজাদিগের সুবিধা হইতে পারে এরূপ নিয়ম অনুসারে কর সংস্থাপন করা রাজার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সকল সভ্য রাজ্যেই যথাসম্ভব এইরূপ নিয়ম অনুসারে কর ধার্য্য ও আদায় করা হয়। করসংস্থাপন বিষয়ে কিরূপ সাধারণ

নিয়মের অনুসরণ করা রাজার কর্ত্তব্য নিম্নে তাহার বিচার করা যাইতেছে। অর্থশাস্ত্রপণ্ডিত ডাক্তার এডাম স্মিথ এই বিষয়ে চারিটী নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই চারিটী নিয়ম অনুসারে করনির্দ্ধারণ করিতে পারিলে রাজা ও প্রজা উভয়েরই সুবিধা হয়, কিন্তু এডাম স্মিথ প্রদর্শিত নিয়মগুলি সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। তথাপি যতদূর সম্ভব হয় উহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করা গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এক্ষণে ঐ চারিটী নিয়মের উল্লেখ করিয়া উহাদের ব্যাখা করা যাইতেছে।

১। প্রত্যেক প্রজারই যত দূর সাধ্য আপন আপন ক্ষমতানুসারে রাজ্যের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ টেক্স দিয়া সাহায্য করা উচিত। অর্থাৎ রাজার রক্ষার অধীনে থাকিয়া যে ব্যক্তি যেরূপ উপার্জ্জন করিয়া থাকে তাহার তদনুসারে টেক্স দেওয়া কর্ত্তব্য। এই নিয়মের তাৎপর্য্য এই যে করসংস্থাপন বিষয়ে সমতা থাকা উচিত। এই নিয়ম অনুসারে করসংস্থাপন করিতে প্যারিলে ঐ সমতা রক্ষিত থাকে, নতুবা উহার বিপর্য্যয় হয়।

২। প্রত্যেক প্রজাকে কোন্ বিষয়ে কি পরিমাণে কর দিতে হইবে তদ্বিষয় সুক্ষ্মানুসুক্ষ্মরূপে নির্দ্ধারিত থাকা আবশ্যক। কোন্ সময়ে দিতে হইবেক, কি প্রকারে দিতে হইবেক, ও কি পরিমাণে দিতে হইবেক, এই সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে নির্দ্ধারিত থাকা আবশ্যক। কারণ ইহার বৈপরীত্য হইলে করসংগ্রাহক কর্ম্মচারীরা করদাতাদিগের প্রতি যথেচ্ছাচার করিতে পারে ও প্রজাদিগকে উক্ত কর্ম্মচারীদিগের ক্ষমতাধীন হইতে হয়। এরূপ হইলে উহারা প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া অতিরিক্ত কর ধার্য্য করিতে পারে ও তাহাদিগের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। ফলতঃ করসংস্থাপন

বিষয়ে সমতা না থাকিলে লোকের যত দূর কষ্ট হয়, এবিষয়ে স্থিরতা না থাকিলে তদপেক্ষা অনেক অধিক ক্লেশ পাইবার সম্ভাবনা।

৩। যে সময়ে ও যে প্রকারে করদান করা প্রজাদিগের পক্ষে সুবিধা হয়, সেই সময়ে ও সেই প্রকারেই তাবৎ কর সংগ্রহ করাই বিধেয়। যদি ভূমির খাজনার উপর কর ধার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে যে সময়ে ভূম্যধিকারীরা প্রজাদিগের নিকট খাজনা পাইয়া থাকেন, সেই সময়েই উহা আদায় করা কর্ত্তব্য। যদি ভূম্যধিকারীরা এক কীস্তিতে না পাইয়া দুই বা ততোধিক কীস্তিতে খাজনা পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে খাজনার উপর কর ও সেইরূপ কীস্তি অনুসারে সংগ্রহ করা উচিত। কোন বিলাসসাধন জন্য দ্রব্যের উপর কর নির্দ্ধারণ করিতে হইলে ঐ কর ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতেই গৃহীত হয় বটে, কিন্তু বুঝিয়া দেখিতে হইলে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইবে, যে ঐ কর বাস্তবিক ব্যবসায়ীদিগকে দিতে হয় না, সেই সকল দ্রব্য যাহারা ব্যবহার করিয়া থাকে তাহাদিগকেই দিতে হয়। কারণ কোন পণ্যদ্রব্যের উপরি কর ধার্য্য হইলে ব্যবসায়ীরা ঐ দ্রব্যের পণ বৃদ্ধি করিয়া উহা ক্রেতাদিগের নিকট হইতেই আদায় করিয়া থাকে। কিন্তু ঐরূপ কর দিতে ক্রেতাদিগের কিছুমাত্র অসুবিধা হয়না, কারণ নির্দ্ধারিত কর দেওয়া অপেক্ষা আবশ্যকমত দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার সময় কিঞ্চিৎ অধিক পণ দিতে কাহারও অধিক ক্লেশ হয় না। আবার ইচ্ছা হইলেই ঐরূপ দ্রব্যের ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেই ক্রেতারা উক্ত করদান হইতে মুক্ত হইতে পারে।

৪র্থ। প্রত্যেক কর এরূপে নির্দ্ধারণ ও আদায় করা কর্ত্তব্য, যে রাজকোষে করস্বরূপে বাস্তবিক যত টাকা আইসে প্রজা-

দিগের নিকট হইতে যেন তদপেক্ষা বড় অধিক আদায় করা না হয়, অথবা প্রজাদিগকে অন্য কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়। চারিপ্রকারে এই নিয়মের বিপর্য্যয় হইতে পারে। ১ম। যে কর আদায় করিতে বহুসংখ্যক লোক নিযুক্ত করিতে হয়, তাহার অধিকাংশ সংগ্রাহকদিগের বেতন দান করিতেই ব্যয়িত হইয়া যায়, সুতরাং প্রজাদিগের নিকট যাহা আদায় হয় তাহার অল্পমাত্র অংশ রাজকোষে যাইয়া থাকে। এরূপ হইলে হয় ত ঐ সকল ব্যয় নির্ব্বাহার্থ আবার একটী নূতন টেক্স সংস্থাপন করিবার প্রয়োজন হয়। ২য়। কোন পণ্যদ্রব্যের উপর যদি এত গুরুতর কর সংস্থাপন করা হয় যে ব্যবসায়ীরা ঐ করসংগ্রহ করিবার নিমিত্ত উক্তদ্রব্যের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়াইয়া দিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে লোকে উক্ত-দ্রব্যের ব্যবহার একবারে পরিত্যাগ করে, বা অনেক কমাইয়া দেয়, সুতরাং ব্যবসায়ীদিগের লোকসান হইতে আরম্ভ হয়। এরূপ হইলে ব্যবসায়ীরা উক্ত ব্যবসায় পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যান্য ব্যবসায়ে আপনাদিগের মূলধন খাটাইতে বাধ্য হয়, কাজেই এরূপ দ্রব্যের উপর করসংস্থাপন করিবার উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়। ৩য়। যে কর এত গুরুভার হয় যে লোকে উহার দায় হইতে এড়াইবার অভিপ্রায়ে প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা করিতে আরম্ভ করে, এবং পরিশেষে ঐ প্রতারণার ফলস্বরূপ অর্থদণ্ড ও অন্যপ্রকার দণ্ডগ্রস্ত হইতে থাকে, তাহাতে তাহা-দিগকে করদান অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতি সহ্য করিতে হয়, এবং তাহাদিগের মূলধন প্রয়োগদ্বারা সাধারণের যে উপকার হইত তাহাও রহিত হইয়া যায়। ৪র্থ। কর আদায় করিতে অনেক সময় সংগ্রাহকেরা প্রজাদিগের সামর্থ্য নির্ণয় করি-বার জন্য নানাবিধ ঘৃণাজনক ও লজ্জাকর পরীক্ষা করিয়া

প্রজাদিগকে বিরক্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিতে পারে। সুতরাং এরূপ কর নির্দ্ধারণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় যদ্দ্বারা এই চারি প্রকারে প্রজাদিগকে কষ্ট দেওয়া না হয়।

করসংস্থাপন বিষয়ে ডাক্তার এডাম স্মিথ সাহেব যে চারিটী নিয়ম উদ্ভাবন করিয়াছেন তন্মধ্যে প্রথমটী অর্থাৎ করসংস্থাপন বিষয়ে সমতা বজায় রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই নিয়মটী সুচারুরূপে কার্য্যে পরিণত হইতে পারেনা, কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ইহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। অবশিষ্ট তিনটী সামান্যতঃ সকলপ্রকার টেক্সের স্থলেই প্রায় খাটিয়া থাকে, কেবল কোনটীর কোন প্রকার টেক্সের স্থলে আংশিক ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। এ সকল বিষয় বিশেষ বিশেষপ্রকার করের বর্ণন-স্থলে প্রকটিত হইবেক। এক্ষণে প্রথমটী কতদূর কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে তাহা বিবেচিত হইতেছে। করনির্দ্ধারণ বিষয়ে সমতারক্ষা করা উচিত, এইটী এডাম স্মিথ প্রদর্শিত প্রথম নিয়ম। এই নিয়মের অনুসারে করনির্দ্ধারণ করিতে পারিলে রাজা প্রজা উভয়েরই মঙ্গল হইতে পারে বটে, কিন্তু উহা কখনই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। করসংস্থাপন কার্য্যে সমতা রক্ষা করা উচিত বটে, কিন্তু এইস্থলে সমতাশব্দের তাৎপর্য্য কি? কেহ কেহ বলেন সকলের নিকট তাহাদের ক্ষমতানুসারে টেক্স লওয়া উচিত। কিন্তু কাহার কিরূপ টেক্স দিবার ক্ষমতা তাহা নির্ণয় করা কঠিন। সমান হইলেও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির টেক্স দিবার ক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন। মনে কর দুই সহোদরের প্রত্যেকের ১০০০০ টাকা করিয়া বাৎসরিক আয় আছে, কিন্তু উহাদের মধ্যে এক জনের বহু পরিবার আর এক জনের কেহই নাই। সুতরাং এক জনের অনেক ব্যয়, আর এক জনের ব্যয় যৎসামান্য। এস্থলে যাহার অধিক ব্যয় তাহার টেক্স দিবার ক্ষমতা অপর সহোদর অপেক্ষা অল্প তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সমান আয় বিশিষ্ট দুই জনের মধ্যে এক জনের বহুপরিবার বলিয়া অল্পপরিবার ব্যক্তি অপেক্ষা অল্প টেক্স ধার্য্য করা কোন মতেই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে। আর ওরূপ হওয়াও অসম্ভব, কারণ যাহার

অধিক পরিবার তাহাকে অধিক ব্যয় করিতে হয়, নানাপ্রকার আবশ্যক সামগ্রী অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতে হয়, সুতরাং যে সকল দ্রব্যের উপর কর নির্দ্ধারিত আছে তাহার অধিক লইতে হয়। এইরূপ দ্রব্যের উপর যাহা কর নির্দ্ধারিত আছে তাহা যদিও ব্যবসায়ীদিগের নিকট আদায় করিতে হয়, কিন্তু বস্তুতঃ যাহারা ঐরূপ দ্রব্য ব্যবহার করে তাহারাই ঐ কর দিয়া থাকে, সুতরাং এরূপ স্থলে ঐ বহুপরিবার ব্যক্তিকে তাহার অল্পপরিবার সহোদরের অপেক্ষা অবশ্যই অধিক টেক্স দিতে হইবে, ইহার কোনপ্রকারে অন্যথা হইতে পারে না। অতএব প্রতিপন্ন হইল এরূপ স্থলে টেক্সের সমতা রক্ষা করা কোনমতেই সম্ভবে না। আবার অনেকে বলিয়া থাকেন যে উক্ত প্রকারে সমতা বজায় রাখা যাইতে পারেনা ইহা যথার্থ বটে, কিন্তু যেমন এক দিকে সমতা রক্ষা করা অসম্ভব, সেইরূপ অপরদিকে সমতারক্ষা করিয়া ক্ষতিপূরণ করা যাইতে পারে, অর্থাৎ ইন্‌কম টেক্স বা আয়কর বিষয়ে সমতারক্ষা করিতে চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু ইন্‌কমটেক্স বিষয়ে সমতারক্ষা করা যে অন্যান্য টেক্সের ন্যায় অসম্ভব তাহা ইন্‌কম টেক্স প্রস্তাবে বিবেচিত হইবেক।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে প্রজাদিগের নিকট করস্বরূপে যে টাকা আদায় হইয়া থাকে তৎসমুদয় প্রজাদিগের ধন ও প্রাণ রক্ষার্থ ব্যয়িত হয়, অতএব রাজদত্ত রক্ষাগ্রহণের পরিমাণ অনুসারে প্রজাদিগের টেক্স দেওয়া উচিত। অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে পরিমাণে রাজদত্ত রক্ষাগ্রহণ করে তাহার সেই পরিমাণে টেক্স দেওয়া কর্ত্তব্য। ইঁহাদের মতে যাহাদের সম্পত্তি অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে রাজদত্ত রক্ষাগ্রহণ করিয়া থাকে, আর যাহাদের সম্পত্তি অন্য অপেক্ষা অল্প তাহারা অল্প পরিমাণে রাজদত্ত রক্ষা গ্রহণ করে। সুতরাং দরিদ্রদিগের অপেক্ষা ধনীদিগের অধিক টেক্স দেওয়া উচিত। কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবেক যে এরূপ বলা কেবল ভ্রমমাত্র। কারণ ধনীদিগের যে পরিমাণে রাজদত্ত রক্ষা গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা, দরিদ্রদিগকে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে রাজদত্ত রক্ষাগ্রহণ করিতে হয়। যদি কোন দেশে রাজবিপ্লব বা অরাজক উপস্থিত হয় তাহা হইলে ধনীদিগের অপেক্ষা দরিদ্রদিগকেই অধিক বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়

সুতরাং রাজদত্ত রক্ষাপ্রাপ্ত ধনের পরিমাণ অনুসারে কর ধার্য্য করা কখনই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারেনা।

একণে প্রতিপন্ন হইল যে করসংস্থাপনবিষয়ে সমতারক্ষা করা নিতান্ত অসম্ভব, তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে প্রতি ব্যক্তিকে নানাপ্রকারে করস্বরূপ যত টাকা রাজকোষে দিতে হয় তৎসমুদায়ের সমষ্টি এরূপ হওয়া উচিত, যে করদাতার যেরূপ উপায় আছে তদ্দ্বারা বিনাক্লেশে ঐরূপ টেক্স দেওয়া যাইতে পারে। মোটে ধরিতে হইলে এইরূপ উপায়দ্বারা একরূপ সমতা রক্ষা করিতে পারা যায় বলিলেও চলে। কারণ যেমন এক বিষয়ে কাহাকেও আপন ক্ষমতার অতিরিক্ত টেক্স দিতে হইতেও পারে সেইরূপ অন্য বিষয়ে কিছু কম দিতে হয়, অতএব গড়ে সকলেরই পোষাইয়া যাইতে পারে, কাহারও বিশেষ লোকসান হয় না।

আমরা যে করপ্রদান করিয়া থাকি তাহার কিয়দংশ উপস্থিত বৎসরের, আর কিয়দংশ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আবার যদি যুদ্ধবিগ্রহাদি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে নিয়মিত কর দ্বারা উহার ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন হইয়া উঠে, সুতরাং গবর্ণমেণ্টকে কর্জ্জ করিতে হয়। ঐ কর্জ্জের সুদ ও আসল পরিশোধ করিবার জন্য হয় ত গবর্ণমেণ্টকে মধ্যে মধ্যে কোন না কোন প্রকার সাময়িক ট্যাক্স সংস্থাপন করিতে হয়, এবং উহাদ্বারা ঐ ঋণ পরিশোধ হইয়া যাইলেই আবার গবর্ণমেণ্ট ঐ টেক্স রহিত করিয়া দেন। আমাদের দেশে ইংরাজী ১৮৫৭ সালে যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল তাহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্টকে ঋণ করিতে হয়, সুতরাং উক্ত ঋণ পরিশোধ করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ইনকমটেক্স অর্থাৎ আয় কর সংস্থাপন করেন। একণে প্রয়োজন না থাকাতে ইনকমটেক্স উঠিয়া গিয়াছে।

টেক্স সামান্যতঃ দুই প্রকার। সাক্ষাৎ ও পারম্পরিক। যে টেক্স যাহাদিগের উপর নির্দ্ধারণ করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় বস্তুতঃ তাহারাই যদি উহার সম্বরাহ করিয়া থাকে, তাহাকে সাক্ষাৎ টেক্স কহে। যেমন ইন-

কমটেক্স অর্থাৎ আয়-কর; আয়-কর যাহার উপর নির্দ্ধারিত হয়, তাহাকেই দিতে হয়, এক জনের দেয় আয়-কর অন্য কাহাকেও দিতে হয় না। কিন্তু যে সকল টেক্স যাহাদের নিকট আদায় হয়, বস্তুতঃ তাহারা দেয় না, কিন্তু অন্যের নিকট হইতে আদায় করিয়া দেয় তাহাকে পারম্পরিক টেক্স কহে। যেমন পণ্য দ্রব্যের উপর টেক্স। পণ্যদ্রব্যের উপর কর নির্দ্ধারিত হইলে ব্যবসায়ীরা দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া খরিদদারদিগের নিকট হইতে ঐ কর আদায় করিয়া লয়। সুতরাং যদিও ঐরূপ কর ব্যবসায়ীদিগের নিকট গৃহীত হইয়া থাকে কিন্তু বস্তুতঃ উহা খরিদারদিগকেই দিতে হয়। আমাদের দেশে যাবতীয় টেক্স প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে ইনকমটেক্স ও ভূমির কর এই দুইটীই সাক্ষাৎসম্বন্ধে গৃহীত হয়। এতদ্ভিন্ন ষ্ট্যাম্প, রেজিষ্টরী, লাইসেন্স, ডাক, আদালতের খরচা প্রভৃতি নানাবিধ টেক্স আছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সাক্ষাৎ ও কতকগুলি পরম্পরা সম্বন্ধে গৃহীত হয়। পরম্পরাসম্বন্ধে যাবতীয় টেক্স গৃহীত হয়, তন্মধ্যে পণ্যদ্রব্যের উপর নির্দ্ধারিত টেক্সই সর্ব্বপ্রধান। অবশিষ্ট দুইটী পরিচ্ছেদে পর্য্যায়ক্রমে এই সমস্ত টেক্সের দোষ গুন বিচার করা যাইবেক।

আয়ও ব্যয় এই উভয়ের উপরি টেক্স নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, আয়ের উপর যে টেক্স নির্দ্ধারিত হয় তাহাই সাক্ষাৎ টেক্স। আর ব্যয়ের উপর যাহা ধার্য্য হয়, তাহা প্রায় পারম্পরিক। কিন্তু কয়েক প্রকার ব্যয়-কর সাক্ষাৎকরও হইতে পারে। বাটীর উপর যে টেক্স ধার্য্য হয়; তাহা যদি ভাড়াটিয়াদিগের নিকট গৃহীত হয়, তাহা হইলে উহাকে সাক্ষাৎ টেক্স বলা যাইতে পারে, আর যদি তাহা না হইয়া বাড়ীওয়ালাদিগের নিকট গৃহীত হয় তাহা হইলে উহা পারম্পরিক টেক্স হয়, কারণ বাড়ীওয়ালারা ভাড়া বাড়াইয়াই উহা ভাড়াটিয়াদিগের নিকট আদায় করিয়া লয়েন। কলিকাতায় যে আলোকও পুলিস টেক্স নির্দ্ধারিত আছে উহা ভাড়াটিয়াদিগকে দিতে হয়, সুতরাং উহা সাক্ষাৎ টেক্স, আর বাড়ীর টেক্স ও জলের টেক্স আংশিক সাক্ষাৎ ও আংশিক পারম্পরিক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে গৃহীত টেক্স।

ইনকম টেক্স ও ভূমির টেক্স।

বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত না হইলে কোন গবর্ণমেণ্টই ইনকম টেক্স সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন না। ইনকম টেক্স দ্বারা গবর্ণমেণ্টের লাভ হয় বটে, কিন্তু ইহাতে প্রজাদিগের সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি কিছু পরিমাণে কমিয়া যাইতেও পারে। আমাদের দেশে ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ভয়ানক বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। উহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্টকে ঋণ করিতে হয়। উক্ত ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত আমাদের দেশে ইনকম টেক্স সর্ব্বপ্রথম সংস্থাপিত হয়। ইনকম টেক্স প্রথমে এই হারে আদায় হইত, যাহারা বৎসরে দুই শত অবধি ৪৯৯ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিত তাহাদিগকে শতকরা ২ টাকা হিসাবে টেক্স দিতে হইত, আর যাহারা বার্ষিক ৫০০ বা তদপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করিত তাহাদিগকে শতকরা ৪ টাকা হিসাবে দিতে হইত। কিন্তু বার্ষিক ৫০০ টাকার ন্যূন আয়ে সংসারনির্ব্বাহ করা দুরূহ বলিয়া কিছুদিন পরে প্রথমোক্ত টেক্সটী উঠিয়া যায়, ইহার পরে যাহাদের বার্ষিক ৫০০ টাকা বা ততোধিক আয় হইত কেবল তাহাদিগকেই বার্ষিক শতকরা ৪ টাকার হিসাবে টেক্স দিতে হইত। কিন্তু বার্ষিক ৫০০ টাকা আয়দ্বারাও আমাদের দেশে সংসার খরচ নির্ব্বাহ হইতে পারেনা। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে স্বামী স্ত্রী ও ও সন্তানগণ ইহাদিগকে লইয়াই একটী পরিবার সংঘটিত হয়, সুতরাং এরূপ সংসার বার্ষিক ৫০০ টাকা আয়ে কথঞ্চিৎ

চলিতেও পারে, কিন্তু আমাদের দেশে মাতা পিতা, ভাই ভগিনী ও নানাবিধ জ্ঞাতি কুটুম্ব লইয়া একটী পরিবার হইয়া, থাকে, ইহারা প্রায়ই এক জনের উপার্জ্জনের উপরি নির্ভর করিয়া থাকে, সুতরাং আমাদের দেশে বাৎসরিক ৫০০ টাকা আয়ে এক পরিবারের স্বচ্ছন্দভোগ দূরে থাকুক অতি কষ্টে সংসারযাত্রানির্ব্বাহ করাও কঠিন হইয়া উঠে। এই কারণে কিছুদিন পরে ইন্‌কম টেক্স কয়েক বৎসরের নিমিত্ত রহিত হইয়া যায়। কিন্তু এরূপে রাজস্বের অকুলান পড়াতে ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে আবার আয়কর নূতন নিয়মে সংস্থাপিত হয়। এবারে বাৎসরিক ৫০০ টাকার অধিক আয় হইতে ট্যাক্স আরম্ভ হয় ও শতকরা ২৵০ হিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে, পরে ইহাতেও লোকের অসুবিধা হওয়াতে ৯৯৯ টাকা আয় পর্য্যন্ত ট্যাক্স হইতে মুক্ত হইয়া যায়। বার্ষিক হাজার বা ততোধিক আয়ের উপরেই কর ধার্য্য হয়। এক বৎসর কাল এইরূপ রাখিয়া এক্ষণে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অনাবশ্যকবোধে আয়-কর একবারে উঠাইয়া দিয়াছেন। তবে যখন আবার প্রয়োজন উপস্থিত হইবে, তখন ইহা পুনঃসংস্থাপিত হইতে পারিবেক। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে যেরূপ আয় দ্বারা গড়ে সকল সংসারের তাবৎ আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহা বাদ দিয়া অবশিষ্ট আয়ের উপরই ট্যাক্স ধার্য্য করাই যুক্তি-সিদ্ধ। এরূপ করিলে প্রজারা বিনা ক্লেশেই ট্যাক্স দিতে সমর্থ হয়।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে খাজনা, লাভ, ও বেতন সর্ব্ব-শুদ্ধ এই তিন প্রকারে লোকের আয় হইয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন দান ও চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারাও আয় হয়। কিন্তু এই দুইটির বিষয় বিচার করা এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং খাজনা, লাভ

ও বেতন এই তিনটীর উপর যে ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হয় তাহাকেই ইনকম ট্যাক্স বা আয়-কর কহে। সুতরাং আয়করও কিয়ৎ পরিমাণে সাক্ষাৎ ও কিয়ৎ পরিমাণে পরম্পরাসম্বন্ধে গৃহীত হইয়া থাকে। কারণ বেতন ও লাভের উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি করিলে শ্রমজীবী ও ব্যবসায়ীরা আপনাদিগের পরিশ্রম ও দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিপূর্ব্বক উহা যথাক্রমে বেতনদাতা ও খরিদদারদিগের নিকট হইতে আদায় করিয়া লয়।

ইনকম ট্যাক্স সকলেরই প্রতি সমানরূপে ধার্য্য হওয়া উচিত। যাহার অধিক আয়, আর যাহার অপেক্ষাকৃত অল্প আয়, যাহার আয় চিরস্থায়ী আর যাহার আয় নির্দ্ধারিত সময়ের নিমিত্ত, সকলেরই নিকট সমান হারে এই ট্যাক্স আদায় করা কর্ত্তব্য। কারণ এরূপ না করিলে করসংস্থাপন বিষয়ে সমতা রক্ষা করা সম্ভবে না। যত প্রকার ট্যাক্স সংস্থাপিত করা যাইতে পারে, তৎসমুদয়ের প্রত্যেকের সংস্থাপন বিষয়ে সমতা রক্ষা করা যায় না, ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্যয়ের উপর ট্যাক্স কখনই সকলের প্রতি সমান হইতে পারে না। যাহার যেরূপ ব্যয় তাহাকে সেইরূপ ট্যাক্স দিতে হয়। অতএব ইনকম ট্যাক্সের বিষয়ে একটী নির্দ্ধারিত হার সংস্থাপন করিলে পক্ষে উক্ত সমতা রক্ষিত হইতে পারে। অনেকে এরূপ বলিয়া থাকেন যে ইনকম ট্যাক্স সকলের প্রতি সমান হারে নির্দ্ধারিত করিতে হইলে এডাম স্মিথের প্রথম নিয়মের অন্যথাচরণ করা হয়। যাহার যেরূপ ক্ষমতা তাহার নিকট সেইরূপ ট্যাক্স লওয়া কর্ত্তব্য এইটীই উক্ত নিয়মের স্থূল তাৎপর্য্য। সকলের নিকট সমান হারে ট্যাক্স আদায় করিতে হইলে কাজে কাজেই এই নিয়মের লঙ্ঘন হয়। ইহার উত্তরস্থলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে প্রজাদিগের প্রত্যেকের কাহার কি আয় ইহা নির্ণয় করা অসাধ্য। করিবার চেষ্টা করিলেও ঐ চেষ্টা বিফল হইয়া যায়, আর পরিশেষে গবর্ণমেণ্টকে প্রতারিত হইতে হয়। অতএব সকলের নিকট সমান হারে এই ট্যাক্স আদায় করাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া আমাদের সিদ্ধান্ত। এরূপ করিলে গবর্ণমেণ্টকেও ঠকিতে হয় না, আর প্রজাদিগেরও বিশেষ

লোকসান হয় না। কারণ এইরূপে যেমন উহাদিগের কিছু ক্ষতি বোধ হয়, তেমনি যে সকল ট্যাক্স পরম্পরায় গৃহীত হইয়া থাকে তদ্বিষয়ের বিষমতা দ্বারা গড়ে উহা পোষাইয়া উঠে।

যাহাদের আয় চিরস্থায়ী ও যাহাদের আয় নিয়মিত কাল চলিয়া থাকে, তাহাদিগের সকলেরই সমান হারে ইনকম ট্যাক্স দেওয়া কর্ত্তব্য। মনে কর এক জনের জমিদারী হইতে বাৎসরিক ১০ হাজার টাকা আয় হয়, আর একজন চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া বৎসরে ১০ হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে যদিও এক জনের আয় চিরস্থায়ী, আর অপরের কেবল জীবনকাল পর্য্যন্ত, কিন্তু উভয়েরই আয় সমান। অতএব উভয়েরই সমান টেক্স দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ ইনকম টেক্স যদিও দুই চারি বৎসর বা কোন নিয়মিত সময়ের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হয়, তথাপি আবশ্যক হইলেই গবর্ণমেন্ট উহা পুনঃসংস্থাপিত করিয়া থাকেন। সুতরাং উহাকে এক প্রকার চিরস্থায়ী কর বলিয়া ধরিতে হয়। যদি ইনকম টেক্স চিরস্থায়ী কর হইল, তাহা হইলে সমান আয়বিশিষ্ট সকলেরই সমান টেক্স দেওয়া উচিত। কারণ যাহাদের আয় চিরস্থায়ী তাহাদিগকে চিরকাল উহার টেক্স দিতে হয়, আর যাহাদের আয় নিয়মিত তাহাদিগের উপার্জ্জন শেষ হইলেই টেক্স দেওয়া শেষ হইয়া যায়। এরূপ স্থলে সমান আয়বান দুই ব্যক্তির মধ্যে যাহার আয় চিরস্থায়ী, অপেক্ষাকৃত অধিক টেক্স দিতে হইলে তাহার প্রতি অন্যায়াচরণ করা হয়।

প্রত্যেকের কি আয় তাহা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে নির্ণয় করা অসাধ্য ব্যাপার, এই জন্যই গবর্ণমেন্ট সকলেরই নিকট সমান হারে উক্ত টেক্স আদায় করিয়া থাকেন, কিন্তু এইরূপ ইনকম টেক্সদ্বারা বাস্তবিক অনেককে সাধ্যাতীত কর দিতে হয়, অনেকে আবার প্রতারণাপূর্ব্বক অল্প দিয়া থাকে। অতএব ইনকম টেক্স বিষয়ে সকলের প্রতি সমান ব্যবহার হওয়া অসম্ভব। এই জন্য বিশেষ দুঃসময় উপস্থিত না হইলে কোন গবর্ণমেন্টেরই ইনকম সংস্থাপন করা উচিত নহে।

যেদেশে মূলধনের বৃদ্ধি অতি অল্প, তথায় ইনকম টেক্স সংস্থাপিত করিতে হইলে উহা প্রজাদিগকে স্ব স্ব মূলধন হইতেই দিতে হয়।

আয়ের অল্পতাপ্রযুক্ত ব্যয়লাঘবদ্বারা সঞ্চয় করিয়া ঐ টেক্স যোগাইতে কেহই সমর্থ হয় না। সুতরাং এরূপ দেশে ইনকমটেক্স সংস্থাপন করিতে হইলে তত্রত্য মূলধন কমিয়া যায়। মূলধন কমিয়া যাইলেই শ্রমজীবী-দিগের অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইয়া উঠে, কারণ দেশের মূলধন হইতেই তত্রত্য শ্রমিকদিগের উপার্জ্জন হয়। সুতরাং কিছুকাল এরূপ চলিলে দেশেরও অমঙ্গল হইতে পারে। অতএব এরূপ স্থলে ইনকমটেক্স সংস্থাপিত করা কোন গবর্ণমেণ্টেরই কর্ত্তব্য নহে। আমাদের দেশের মূলধন ইংলণ্ড অপেক্ষা অনেক অল্প, ও ইহার বৃদ্ধিও অতি অল্প পরিমাণেই হইয়া থাকে, সুতরাং এ সময় আমাদের দেশে অধিক দিন এই টেক্স প্রচলিত থাকিলে পরিশেষে দেশের অমঙ্গল ঘটিতে থাকিবেক। যত দিন আমাদের দেশে ইংলণ্ডের ন্যায় শীঘ্র শীঘ্র মূলধন না বাড়িতে থাকিবে ততদিন এখানে ইনকম টেক্স সংস্থাপিত করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বোধ হয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই সকল অসুবিধার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়াই আপাততঃ এখানে উক্ত টেক্স স্থগিত রাখিয়াছেন।

ভূমির টেক্স। প্রায় সকল দেশের গবর্ণমেণ্টই স্ব স্ব অধিকার মধ্যে ভূমির উপর টেক্স ধার্য্য করিয়া থাকেন। ভূমির উপর যদি সঙ্গতরূপ কর ধার্য্য করা যায় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টেরও লাভ হয়, আর প্রজাদিগেরও বিশেষ হানি হয় না। ভূমির টেক্স যদি অসঙ্গত প্রকারে বাড়ান না হয়, তাহা হইলে উহা দিতে হয় বলিয়া কৃষকেরা কখনই কৃষিদ্রব্যের মূল্য বাড়াইতে পারে না। সুতরাং ইহা ভূম্যধিকারীদিগকেই দিতে হয়, যাহারা কৃষিজ দ্রব্যের ব্যবহার করেন তাহাদিগকে দিতে হয় না। ভূমির টেক্স ও ভূমির খাজনা এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ কিছু প্রভেদ নাই। ভূমি ব্যবহারের মূল্য রাজকোষে দেওয়া হইলেই উহাকে টেক্স কহে। আর রাজকোষে না দিয়া অন্য ভূম্যধি-কারীকে দেওয়া হইলেই উহাকে খাজনা কহে। আমাদের দেশে গবর্ণমেণ্ট অনেক ভূমির স্বত্বাধিকারী। সুতরাং ভূমির

কর হইতে প্রতি বৎসর বিস্তর টাকা রাজকোষে উপস্থিত হয়। ভারতবর্ষে বার্ষিক ১৯০০০০০০০ টাকা ভূমির খাজনাস্বরূপ আদায় হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে ভূমির কর ইহা অপেক্ষা অনেক অল্প। ইহার কারণ ইংলণ্ডে জমিদারেরাই প্রায় সকল ভূমির প্রকৃত অধিকারী। তবে গবর্ণমেণ্ট কেবল রাজভাগ মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশে গবর্ণমেণ্টই অধিকাংশ ভূমির স্বত্বাধিকারী। জমিদারেরা গবর্ণমেণ্টের নিকট নিয়মিত হারে খাজনা দিয়াই ভূমিব্যবহার করিয়া থাকেন। ভূমির কর বৃদ্ধি করিলে কৃষকেরা কৃষিজ দ্রব্যের পণ বৃদ্ধি করিয়া লোকসান পোসাইয়া লয়। সুতরাং এরূপ হইলে খরিদদারদিগের ক্লেশ হইতে থাকে ও কষ্ট পাইলেই প্রজারা বিদেশ হইতে অল্প দরে কৃষিজ দ্রব্য আমদানী করিবার চেষ্টা করে। আমদানী হইলেই আবার স্বদেশে চাষের লাভ কমিয়া যায়, ও অনেকে চাষ ত্যাগ করিতে থাকে। চাষ পরিত্যাগ করিলেই ভূমি পতিত থাকে ও উহার খাজনা কমিয়া যায়। সুতরাং ভূম্যধিকারীদিগের লাভ না হইয়া বরং লোকসান হইতে থাকে। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে ভূমির কর কখনই অতিরিক্ত প্রকারে বাড়ান উচিত নহে। এই জন্যই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ১৭৯২ খৃঃ অব্দে দশ বৎসরের নিমিত্ত ভূমির খাজনা ধার্য্য করিয়া কিছু দিন পরে ঐ বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করিয়া দিয়াছেন। অতএব গবর্ণমেণ্ট এদেশে ভূমির কর বাড়াইতে পারেন না, উহা চিরকালের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই আইন যাহাতে অব্যাহত থাকে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী থাকা উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এক্ষণে রথ্যাকর সংস্থাপিত হওয়াতে উহার কিঞ্চিৎ পরিমাণে ব্যাঘাত হইয়াছে বলিতে হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পারম্পারিক টেক্স।

পণ্যদ্রব্যের উপর টেক্স।

পণ্যদ্রব্যের উপর টেক্স সম্পূর্ণরূপে পারম্পরিক। অর্থাৎ এই টেক্স যাহাদের নিকট আদায় হইয়া থাকে, বাস্তবিক তাহাদিগকেই উহা স্বয়ং দিতে হয় না। এই টেক্স ব্যবসায়ীদিগের নিকট আদায় হয়। কিন্তু ব্যবসায়ীরা স্ব স্ব পণ্যদ্রব্যের পণ বৃদ্ধি করিয়া খরিদদারদিগের নিকট হইতেই উহা আদায় করিয়া লয়। অতএব পণ্যদ্রব্যের টেক্স বাস্তবিক খরিদদারেরাই দিয়া থাকে, কেবল ব্যবসায়ীরা মধ্যবর্ত্তী থাকে এইমাত্র। এই টেক্স সমুদায়ে পাঁচ প্রকারে গৃহীত হইতে পারে। ১ম· দ্রব্য প্রস্তুত করিবার উপর। ২য়- দ্রব্য বিক্রয় করিবার উপর। ৩য়- দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করিলে ঐ আমদানীর উপর। ৪র্থ- দ্রব্য এক দেশের মধ্যেই এক স্থান হইতে স্থানান্তর করিতে হইলে এই স্থানান্তরকরণের উপর। ৫ম। দ্রব্য স্বদেশ হইতে বিদেশে রপ্তানি করিলে ঐ রপ্তানির উপর. ইহাদিগকে যথাক্রমে এক্সাইজ, কষ্টম, বা টোল ও আমদানী এবং রপ্তানীর মাসুল কহে।

কোন পণ্যদ্রব্যের উপর কর ধার্য্য করিলে উহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়া উঠে, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে এই নিয়মটী এডাম স্মিথ প্রদর্শিত প্রথম নিয়ম অর্থাৎ প্রজাদিগের নিকট উহাদিগের স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে টেক্স লওয়া কর্ত্তব্য। ইহা পণ্যদ্রব্যের উপর করধার্য্য করিতে হইলে কখনই কার্য্যকর হইতে পারে না। কারণ পণ্যদ্রব্যের

টেক্স যদিও ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে আদায় হয়, কিন্তু পরিশেষে উহা খরিদদারদিগকেই দিতে হয়। অতএব জীবিকা-নির্ব্বাহের পক্ষে অত্যাবশ্যক সামগ্রীর উপর কর ধার্য্য হইলেও কি ধনী, কি মধ্যবিত্ত, কি দরিদ্র সকলকেই উহা ক্রয় করিতে হয়। কাজেই অনেককে আপন ক্ষমতার বহির্ভূত টেক্স দিতে বাধ্য হইতে হয়। এডাম স্মিথের দ্বিতীয় নিয়ম পণ্যদ্রব্যের টেক্সের উপর কার্য্যকর হইতে পারে। কারণ পণ্যদ্রব্যের উপর কর নির্দ্ধারিত করিয়া দিলে কাহাকে কত পরিমাণে টেক্স দিতে হইবে, তাহা সকলেই বিশেষরূপে অবগত হইতে পারে। কেবল যে সকল দ্রব্যের উপর উহাদের মূল্য অনুসারে টেক্স ধার্য্য হয়, তৎসমুদয়ের টেক্সের বিষয়েই কিঞ্চিৎ অনিশ্চততা থাকে। এই জন্যই দ্রব্যের মূল্য অনুসারে পণ্যদ্রব্যের উপর কর ধার্য্য করা সুবিধা ও লাভের নহে। এডাম স্মিথের তৃতীয় নিয়মও পণ্যদ্রব্যের টেক্সের উপর খাটিয়া থাকে। কারণ পণ্য-দ্রব্যের টেক্স বাস্তবিক যাহারা দ্রব্য ব্যবহার করে তাহারাই দিয়া থাকে, অর্থাৎ দ্রব্যাদির মূল্য দিবার সময় ঐ মূল্যেরই সহিত ক্রেতাদিগকে টেক্স দিতে হয়, কারণ ব্যবসায়ীরা কোন দ্রব্যের উপর টেক্স ধার্য্য হইলেই ঐ দ্রব্যের মূল্য বাড়াইয়া উহা ক্রেতাদিগের নিকট আদায় করিয়া লয়। সুতরাং দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার সময়, উহার মূল্যের সহিত অল্প অল্প করিয়া কিছু টেক্স দিতে হইলে আপন সুবিধামতই দিতে পারে। কারণ একবারে টেক্স বলিয়া দিতে হইলেই লোকের কষ্ট-বোধ হয়। কিন্তু কখন কখন এইরূপ টেক্স দিতে ব্যবসায়ী-দিগের বিলক্ষণ অসুবিধা হইয়া থাকে। ব্যবসায়ীরা আপন আপন মাল বিক্রয় করিয়া ক্রেতাদিগের নিকট হইতেই মূল্যের সহিত আপনাদের দেয় টেক্স আদায় করিয়া লয়। সুতরাং

দ্রব্যাদি বিক্রয় হইবার পূর্ব্বে ব্যবসায়ীদিগকে টেক্স দিতে হইলে তাহাদিগকে হয় ত নিজ নিজ মূলধন বাড়াইয়া উহা হইতেই দিতে হয়। অতএব তাহাদিগের অসুবিধা হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট ব্যবসায়ীদিগের নিকট টেকস আদায় করিবার নিমিত্ত যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করেন, তাহা এরূপে করা উচিত যে ব্যবসায়ীদিগকে ওরূপ কষ্ট সহ্য করিতে না হয়। যাহারা বিদেশ হইতে মাল আমদানী করে, তাহাদের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্ট বণ্ডহাউস অর্থাৎ সন্ধক রাখিবার আফিস সংস্থাপন করিয়া থাকেন। ব্যবসায়ীরা যত দিন মাল বিক্রয় করিবার সুবিধা করিতে না পারে, তত দিন নিজ নিজ মাল ঐ বণ্ডহাউসে রাখিয়া দেয়। যত দিন মাল বণ্ডহাউসে থাকে, তত দিন গবর্ণমেণ্ট ব্যবসায়ীদিগের নিকট টেক্স লইবার দাবী করেন না। ব্যবসায়ীরা মাল বিক্রয়ের সুবিধা হইলেই মাশুল দিয়া তথা হইতে মাল উঠাইয়া লয়। এই উপায়ে আমদানীর টেক্স দিবার অসুবিধা অনেকাংশে নিবারিত হইয়া যায়। এডাম স্মিথের প্রদর্শিত শেষ নিয়মটী এই যে প্রত্যেক কর এরূপে নির্দ্ধারণ ও আদায় করা কর্ত্তব্য, যে রাজকোষে করস্বরূপে বাস্তবিক যত টাকা আইসে, প্রজাদিগের নিকটে যেন তদপেক্ষা বড় অধিক টাকা আদায় করা না হয়। এই নিয়মটী অন্যান্য টেক্সের ন্যায় পণ্যদ্রব্যের টেক্স বলেও সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকর হইতে পারে না। পণ্যদ্রব্য গৃহজাতই হউক, বা বিদেশ হইতে আমদানী করাই হউক উহার উপর কর ধার্য্য করিতে হইলে উহা আদায় করিবার জন্য বিস্তর ব্যয় পড়িয়া যায়। সুতরাং প্রজাদিগের নিকট করস্বরূপে যত টাকা আদায় হয়, তাহার অধিকাংশই আদায় করিবার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ব্যয়িত হইয়া যায়, ও অপেক্ষাকৃত অল্পমাত্র অংশ রাজ-

কোষে দাখিল হইয়া থাকে। আবার ব্যবসায়ীরাও তাহাদিগকে যত টাকা টেক্স দিতে হইবে দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি করিয়া ক্রেতাদিগের নিকট তদপেক্ষা অনেক অধিক টাকা আদায় করিতে পারে। এরূপ হইলে ক্রেতাদিগের বড়ই অনিষ্ট হয়। যদি টেক্স দিবার পর বিক্রেয় মাল অধিক দিন পড়িয়া থাকিয়া পরে বিক্রয় হয়, তাহা হইলে ব্যবসায়ীদিগকে লোকসান পোষাইবার নিমিত্ত অগত্যা নিজ নিজ দ্রব্যের মূল্য অতিশয় বাড়াইতে হয়, ইহাতে ব্যবসায়ী ও খরিদদার উভয়েরই বিলক্ষণ অসুবিধা হইয়া থাকে। অতএব পণ্যদ্রব্যের উপর নির্দ্ধারিত টেক্স আদায় করিবার নিমিত্ত এরূপ নিয়ম করা উচিত, যাহাতে টেক্স দেওয়া ও বিক্রয়করা এই উভয়ের মধ্যে অধিক দিন অতিবাহিত না হয়। তাহা হইলে ব্যবসায়ীরা আপন আপন সুবিধামত টেক্স দাখিল করিতে পারে, ক্রেতাদিগেরও কিছুই অসুবিধা হয় না।

গৃহজাত দ্রব্য ও বিদেশ হইতে আমদানী করাএই উভয়বিধ দ্রব্যের উপর করধার্য্য করিলে যেরূপ ফল উৎপন্ন হয়, তাহা উপরে বর্ণিত হইল। এক্ষণে রপ্তানীর উপর করধার্য্য করিলে উহা হইতে কি কি উপকার হইতে পারে তাহা সংক্ষেপে বিবেচিত হইতেছে। পণ্যদ্রব্যের উপর যে কর নির্দ্ধারিত হয় তাহা ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদিগের নিকট আদায় করিয়াই দেয় ইহা পূর্ব্বেই নির্ণীত হইয়াছে। যে দ্রব্য স্বদেশে জন্মে, ব যাহা বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া স্বদেশে বিক্রীত হয় তাহার উপর টেক্স নির্দ্ধারিত করিলে উহা স্বদেশীয়দিগকে দিতে হয়, কিন্তু যে সকল দ্রব্য স্বদেশ হইতে বিদেশে রপ্তানি করা হয়, তাহার উপর নির্দ্ধারিত টেক্স বিদেশীয়দিগকেই দি

হয়। কারণ বিদেশীয়েরাই ঐরূপ দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যে এই প্রকারে টেক্সস্বরূপ যে টাকা রাজকোষে দাখিল হইয়া থাকে, তাহা বিদেশ হইতেই আইসে। এইরূপ টেক্স দ্বারা স্বদেশ বিদেশ উভয়েরই উপকার হইয়া থাকে। বিদেশের লোকেরা উক্ত দ্রব্যসকল ব্যবহার করিতে পায়, আর স্বদেশীয়দিগকে সমুদয়ে যত টাকা টেক্স দিতে হইত বিদেশীয়েরা তাহার কিয়দংশ দেওয়াতে উহা-দেরও ভারলাঘব হইয়া যায়। আবার বিদেশে যে সকল মাল রপ্তানী হয়, তাহার উপর করধার্য্য হওয়াতে বিদেশীয়েরা ঐ সকল দ্রব্যের ব্যবহার যথাসাধ্য কমাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। এইরূপে বিদেশে উক্ত দ্রব্যাদির ব্যবহার কমিয়া যাইলেই আবার স্বদেশে উহার মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যায়। সুতরাং বিনা করে বিদেশে মাল চালান করিবার নিয়ম থাকিলে স্বদেশে উক্ত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হইয়া স্বদেশীয়দিগের যে অসুবিধা হইত, রপ্তানীর উপর করধার্য্য হওয়াতে ঐ অসু-বিধা হইতে পারেনা।

রাজ্যের ব্যয়নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের নিকট টেক্স গ্রহণ করিয়া থাকেন ইহা এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে কথিত হইয়াছে। কিন্তু কখন কখন দেশ হইতে যতই টেক্স আদায় হউক না কেন, উহা-দ্বারা রাজ্যের সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এরূপ হইলে ব্যয় নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্টকে স্বীয় প্রজাদিগের নিকট অথবা কোন বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিতে হয়। গবর্ণ-মেণ্ট দেশরক্ষার্থ দেনা করেন বলিয়া এইরূপ দেনাকে দেশসাধারণ দেনা কহা যাইতে পারে। এইরূপ দেনা পরিশোধ করিবার জন্য বা উহার সুদ দিবার নিমিত্ত দেশসাধারণ সমুদায় লোকেই বাধ্য। এই নিমিত্ত

গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের নিকট নূতন নূতন প্রকার টেক্স আদায় করিয়া উহা পরিশোধ করেন অথবা উহার সুদ দিয়া থাকেন।